হালখাতা

(ছোটদের বার্ষিকী)

যুগ্ম-সম্পাদক—

শ্রী অসীম দত্ত

শ্রী রমাপ্রসাদ মিত্র

প্রকাশক—
শ্রীরমাপ্রসাদ মিত্র,
শ্রীঅসীম দত্ত।
"আলো সাহিত্য সংঘ"
৪১-ডি, একডালিয়া রোড,
বালিগঞ্জ, কলিকাতা।

প্রথম বর্ষ, ১৩৪৮

দাম—৩ টাকা

প্রিণ্টার—শ্রীরমেশচন্দ্র বসু
মেট্‌কাফ প্রেস
৬নং রাজকৃষ্ণ লেন, কলিকাতা

চিঠি-

সবিনয় নিবেদন,

নববর্ষে আমাদের শুভেচ্ছা ও নমস্কার জানিবেন।

পাশ্চাত্য দেশের বর্ত্তমান যুদ্ধের ফল এদেশে এক্ষণে যে কি ভাবে প্রতিফলিত হইতেছে তাহা আশা করি সকলেই জ্ঞাত আছেন। এই যুদ্ধের দরুণ প্রায় প্রত্যেক জিনিষেরই মূল্য বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে,—বিশেষতঃ কাগজের মূল্য শতকরা প্রায় ৬৫।৭০ টাকা বৃদ্ধি লাভ করিয়াছে; এতদ্ভিন্ন উৎকৃষ্ট কাগজ অধুনা দুর্লভ। ইহা সত্ত্বেও আমরা "হালখাতা" প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়াছি, এবং বর্ত্তমান-বাজারের সেরা পুরু এ্যান্টিক্ কাগজ দিতে আমরা কার্পণ্য প্রকাশ করি নাই।

বাঙলার খ্যাতনামা কবি ও সাহিত্যিকগণের প্রায় সকলকেই আমরা আমাদের এই "হালখাতা"তে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম। আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই, নানা কাজে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও, দয়া-পরবশ হইয়া আমাদের এই পর্ণ কুটীরের "হালখাতা" উৎসবে পদধূলি দিয়া আমাদিগকে বাধিত ও উপকৃত করিয়াছেন।

"হালখাতা"র এই ক্ষুদ্র কুটীরে বাঙলার খ্যাতনামা কবি ও সাহিত্যিকগণকে যতদূর সম্ভব বসিবার স্থান দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। তাহা সত্ত্বেও, আমরা অতি দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, স্থানাভাববশতঃ বসিবার আসন অনেকেই হয় ত পা'ন নাই। আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত অপরাধের জন্য আমরা অত্যন্ত লজ্জিত এবং তাঁহাদের নিকট আমরা ক্ষমা ভিক্ষা চাহিতেছি।

বাজারে "ছবির অ্যালবাম" বহু কিনিতে পাওয়া যায়; সুতরাং "হালখাতা"কে আমরা 'সাহিত্য' ও 'ছবি'—এই দুইয়ের খিচুড়ী প্রস্তুত করি নাই। কেবলমাত্র বিশ্ব-কবি রবীন্দ্রনাথ ও অপরাজেয় কথাশিল্পী ৺শরৎচন্দ্রের ছবি ভিন্ন অপর কোনও ছবি ছাপিয়া স্থান পূরণ করিয়া ফাঁকি দিবার চেষ্টা আমরা করি নাই।

"হালখাতার" এই প্রথম বর্ষ। হয় ত ইহাতে দোষ ত্রুটী আছে অনেক। তথাপি আমাদের এই "হালখাতা" যদি বাঙলার ছেলেমেয়েদের আনন্দ দান করিতে পারে তাহা হইলেই আমরা সার্থকতা লাভ করিব।

কয়েকজন নবীন লেখক লেখিকাও আমাদের এই "হালখাতা" উৎসবে যোগদান করিয়াছেন। নমস্কার। ইতি—

বিনীত—

শ্রীরমাপ্রসাদ মিত্র

শ্রীঅসীম দত্ত

বক্তব্য—

আজ সকলের আশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছা মাথায় ক'রে নিয়েই "হালখাতা" উৎসব সম্পাদিত হয়েছে। অনেকে সাহায্যও করেছেন নানা ভাবে।

আমাদের বন্ধুবর, প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী, শ্রীআশু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রচ্ছদ-পটের রঙীন ছবিখানি এঁকে দিয়ে আমাদের উপকৃত করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ও ৺শরৎচন্দ্রের ছবি দুখানি 'বাতায়ন' পত্রিকার সৌজন্যে প্রাপ্ত।

ডক্টর অমিয় চক্রবর্ত্তীর এবং শ্রীসুধাকান্ত রায় চৌধুরীর অনুরোধেই বিশ্ব-কবি রবীন্দ্রনাথ স্বহস্তে আমাদের আশীর্ব্বাদ করেছেন।

...এঁদের সকলের নিকটই আমরা কৃতজ্ঞ রহিলাম।

ইতি—

শ্রীঅসীম দত্ত

শ্রীরমাপ্রসাদ মিত্র

পরিচয়-পাতা

আমাদের এই 'হালখাতা' উৎসবে যাঁরা যোগদান করেছেন—

অর্ঘ্য

পরম শ্রদ্ধাস্পদ

বিশ্ব-বরেণ্য **শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর** মহাশয়

সমীপেষু—

দাদু,

বঙ্গের আলো, ভারতের আলো, জগতের আলো তুমি,
তোমার আলোয় আলোকিত হ'য়ে ধন্য ভারত-ভূমি।
"পুরাতন" জানি তুমি, তবুও তোমার আছে রঙীন্ আলো,
রঙীন্ আলোর 'রংমশাল'কে তাই ত' সবে বাসে ভালো।

বছরের প্রথম মাসে আমাদের এই 'হালখাতা'তে
তোমার হাতের আলোক-কণা ঠিক্‌রে এলো প্রথম পাতে ;
তোমার হাতের আশীর্ব্বাদ—বোল্‌ছি মোরা গৌরবে,—
'হালখাতা'কে সাজিয়ে দিল, ভরিয়ে দিল সৌরভে।

নূতন বছরে **'হালখাতা'**কে,—(বলিতে সাহস না পাই,—
ভয় কিবা আছে ? 'দাদু' হও তুমি, মুখ ফুটে বলি তাই—)
পরম শ্রদ্ধায় অর্ঘ রূপে অর্পিণু মোরা তব পদমূলে,
সার্থকতায় ধন্য হ'ব **'হালখাতা'**কে বারেক ছুঁলে।

ইতি—

'আলো সাহিত্য সংঘ'
৪১-ডি, একডালিয়া রোড,
বালিগঞ্জ, কলিকাতা।

তোমার স্নেহের,

অসীম ও রমাপ্রসাদ
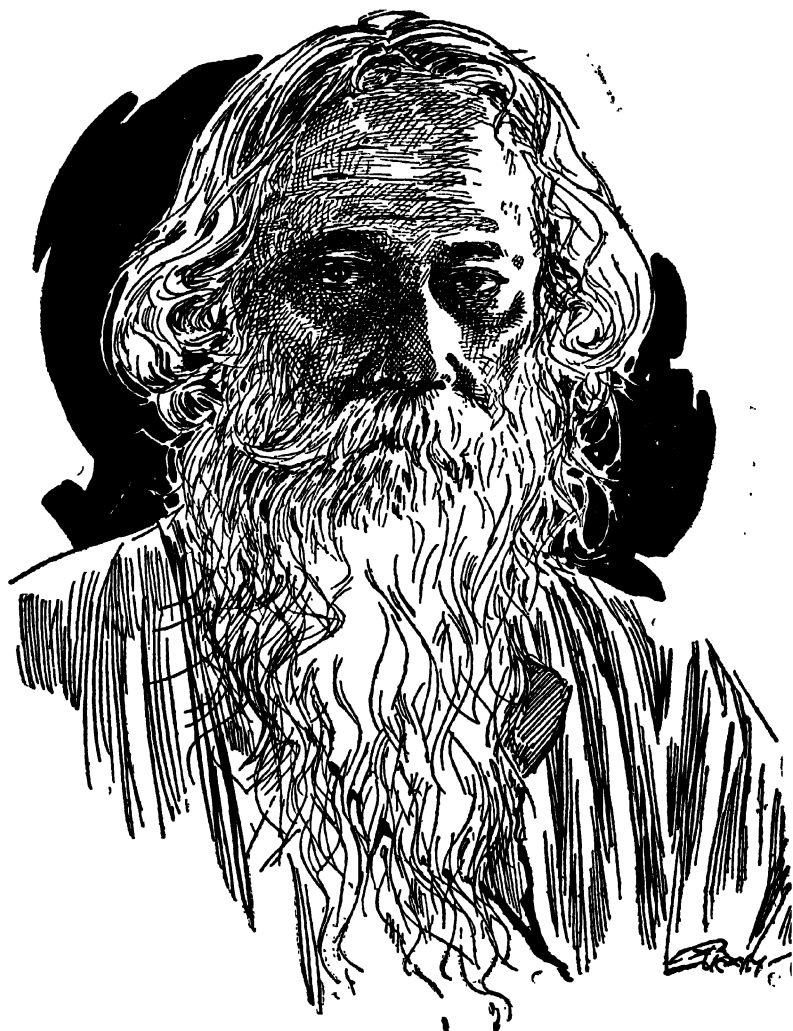
আমাদের রবীন্দ্রনাথ

হালখাতা

(ছোটদের বার্ষিকী)

প্রথম বর্ষ, ১৩৭৮

বিশ্ব-কবির আশীর্ব্বাণী

আমি অতি পুরাতন, এ খাতা হালের
হিসাব রাখিতে চাহে নূতন কালের।
তবুও ভরসা পাই আছে কোনো গুণ-
ভিতরে নবীন থাকে অমর ফাগুন।
পুরাতন চাঁপা গাছে নূতনের আশা
নবীন কুসুমে আনে অমৃতের ভাষা॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আশীর্ব্বাণী

শ্রীযুক্ত অসীম দত্ত ও শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মিত্র "হালখাতা" নাম দিয়া যে গদ্য ও পদ্য রচনাবলীর সংগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, তাহার সাফল্য কামনা করি। ইতি—

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

১লা ফাল্গুন, ১৩৪৭

——:০:——

আশীর্ব্বাণী

আমি আশা করি নূতন "হালখাতা" বার্ষিকী পাঠক সমাজের প্রিয় হ'বে।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

২১ ২. '৪১

আশীর্ব্বাণী

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

শুক্‌ন পাতার ঝরে' পড়া
অবশ ঝড়ে,
পুরাতনীর খস্‌খসে সুর
সরে পড়ে !
জাগালো শির সবুজ দেশে
তক্‌তকে মুখ তরুণ হেসে—
মুকুলগুলো !
যেথায় ছিল বছর শেষের
বেজায় ধূলো !
আজ বোশেখীর বনে বনে
বাজল বাঁশী,
কোন্ নতুনের ডাক এল—লাল
আলোয় ভাসি' !

বুক পেতেছে পথের রেখা,
ঝক্‌ঝকে' জোর স্পষ্ট লেখা
লেখো সবে,
জ্বল্‌জলে' যে মণি-পথে
চল্‌তে হ'বে !
চলুক
লেখা তোমার মনের
নতুন জাগা
তালপাতাতে,
ধরণীর এই অরুণ রাঙা
সদ্য খোলা
'হালখাতা'তে ।

ছেলেদের বর্ষা

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

ঝুপ ঝুপ্ ঝম্‌ঝম্ ঝরে শুধু বৃষ্টি,—
এ আবার কে রে ভাই—ডুবায় যে সৃষ্টি !
সুখের শরৎশেষে হিমল হেমন্ত,
কন্‌কনে পোষ-মাঘ, ফুলল বসন্ত ;
তারপরে এল যেই বিদ্‌কুটে গ্রীষ্ম—
কাঠফাটা রোদ্দুরে পুড়ে' যায় বিশ্ব ;
ভাগ্যে ছুটিটা ছিল—"ইস্কুল" বন্ধ,
খেয়ে ও ঘুমিয়ে তাই কাটেনিক মন্দ !

নিবাইতে সে আগুন এল বুঝি বর্ষা—
ধনীদের ফুর্ত্তি ও চাষীদের ভরসা !
ধান, পাট জন্মায়, ভরপুর খাল-বিল ;
মাঠ-ঘাট ভেসে যায়—মাছ করে কিল্‌বিল্‌ ;
ব্যাঙের গ্যাঙোর-গ্যাঙ, ঝিঁঝিদের ঝঙ্কার,
ঝোপেঝাড়ে উঠে বেড়ে জোনাকি-অলঙ্কার !
খড়ো' ঘরে জল পড়ে—দেখা যায় পষ্ট,
রাত-দিন ভিজে মরে—গরীবের কষ্ট ।

ছুটি নেয় দুই ভাই—সূর্য্য ও চন্দ্র ;
কা'রো বড় দেখা নাই—আছে কিনা সন্দ' !
আঁধারেতে দিনরাত হয় প্রায় তুল্য—
হেন দিনে মনে হয়—আলোর কি মূল্য !
রিম্‌ঝিম্‌ রিম্‌ঝিম্‌ চব্বিশ ঘণ্টা,
বেরোলেই ভিজে' যাই—কি যে ছাই মন্‌টা
খেলাধূলো গেল সব, ডুবে' গেছে মাঠটা,
চারটায় মনে হয়—যেন রাত আট্‌টা !

ভ্যাৎভেতে চারধার, স্যাঁতসেতে ঘরদোর,
প্যাচ্‌পেচে জামাজুতো, শুকায়না খদ্দর !
বিছানায় শু'তে যাই, গন্ধ যে ভাপ্‌সা,
মিট্‌মিটে আলোগুলো—মনে হয় ঝাপ্‌সা !
বেড়ে উঠে টিক্‌টিকি, কোণে-কোণে কোলা ব্যাং,
গায়ে তোলে আরশোলা সুড়্‌সুড়ে' সরু ঠ্যাং ;
ভ্যান্‌ভেনে মশা মাছি—বাহিরায় প্রাণটা !
বিচ্ছিরি বর্ষায় ভালো কোন্‌খান্‌টা ?

ভোজনের সুখ বটে আছে এই কালটায়,—
খিলকুল ফলমূল জোটে বৈকালটায়

ছেলেদের বর্ষা

রসালো কাঁঠাল কলা, আনারস, কালো-জাম,
পেয়ারা আপেল আর নাসপাতি ভাল আম ;
তপসে, ইলিশ-ভাজা—সাথে তুনি-খিচুড়ি,
ঝম্‌ঝমে' বর্ষায় বাদ নাই কিছুরই !
বেগুনী কড়াই-ভাজা এরও পরে আছে ফাউ,
মুড়ী ও পেঁয়াজী সাথে, আরো যদি খেতে চাও !

ইস্কুলে কে বা যায়—আদ্ধেক "রেণী ডে" !
জলে ভিজে' জরে পড়ে'—মাষ্টার বেণী দে ;
পড়াশুনো তাই এই বাড়ীতেই যা' করি,
সন্ধ্যা না হ'তে হ'তে সেরে নিই ধাঁ করি' ;
তারপরে, বড়-ঘরে পাকাইয়া জটলা,
খেয়ে দেয়ে শুয়ে, সাথে হারু আর পটলা,
দিদিমার কাছে শুনি,—চোখ চেয়ে অল্প,
রাক্ষস, পরী আর ডাকাতের গল্প !

ঝম্‌ঝম্ ঝরে জল—ছাট আসে বাতাসে,
গুড়্ গুড়্ গুম্‌গুম্ মেঘ ডাকে আকাশে ;
চম্‌কায় বিদ্যুৎ—ফাঁকে ফাঁকে জানালায়,—
আলো তার এসে লাগে আলমারি আলনায় !
ব্যাঙের গ্যাঙোর-গ্যাং বেড়ে উঠে বাগানে—
বুঝিতে পারিনা—ঘুম লাগানে'—কি জাগানে' !
থেকে থেকে নাকে আসে কদমের গন্ধ,—
মনে ভাবি—বরষাটা এমনই কি মন্দ !

—:০:—

শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়

করকমলে—

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

হে নবীন সুরের সাধক জাগালে এ কি পুলক প্রিয়!
রচিলে সুরের মায়া রাগিণীর মূর্ত্তি কমনীয়।
আকাশের নিথর নীলে জাগে কি পিক পাপিয়ার গান?
বরষার নিঝুম রাতে আঁখির পাতে জড়িয়ে আসে তান।
স্বপনের কোন্ যাদুকর দিল তোমার
কণ্ঠে সুরের খনি।
সোহাগের আল্‌পনাতে আঁকিয়া দিল
বাণীর চরণখানি॥
স্বরগের মন্দাকিনীর ঝর্ণা-ঝরা পাগল-করা গান।
সব ভুলিয়ে দিল, দুলিয়ে দিল, জুড়ায়ে দিল প্রাণ॥

হালখাতা

শ্রীগিরিজাকুমার বসু

না ফুরোতে পাতা পুরাতন খাতা তুলিয়া রাখিনু বেঁধে
সকল হিসাব না হ'তেই সাফ, নূতন বসিনু ফেঁদে।
অতীতের পানে কাতর নয়ানে কি ফল চাহিয়া ফিরে?
পাওনা দেনার বেচা ও কেনার হাল্‌খাতা খুলেছিরে।

আগেকার মত যেন ক্রমাগত না হয় এবার ভুল
যে কোনো উপায়ে নগদ চুকায়ে নিও দাম বিল্‌কুল।
উপরোধে বাকি রাখো যদি, ফাঁকি পড়িবে জানিও শেষে।
ধারে কারবার করিলে এবার যাবে যে ব্যবসা ফেঁসে।

কেবলি খাতায় নহেক, খরায় বুঝিয়া সকল দিক্
রেখো বারোমাস হিসাব নিকাশ কথারো তোমার ঠিক্।

দুয়েরি বেলায়, ব্যয় যদি যায় জমার উপরে চলি'
বেশ জেনো তবে তার নাম সবে রাখিবে 'ফাজিল' বলি'।

আজি হাল্‌খাতা উৎসবে পাতা প্রীতির অসন 'পরে
বহু সমাদরে বসালে যে মোরে ধূপ-সুরভিত ঘরে,
বিনিময়ে তা'র লহ এ হিয়ার অম্লান্ ভালবাসা
তোমাদের হোক্ জীবন অ-শোক, সফল সকল আশা।

—:০:—

নিমন্ত্রণ্ আজ হাল্‌খাতার

শ্রীসুনির্ম্মল বসু

নিমন্ত্রণ্ আজ হাল্‌খাতার,
বানিয়ে ঠোঙা শাল্‌পাতার
বিলায় কে আজ মিষ্টি-মিঠাই,
হরেক রকম টাট্‌কা পিঠা-ই;
যায় গড়িয়ে
তব্ তরিয়ে
রাব ড়ি-পায়স-ক্ষীর পাথার,
ইচ্ছা করে দেই সাঁতার।
আয় তোরা কে যোগ্ দিবিরে
হাল্‌খাতার এই আনন্দেই,—
ভোজের বাহার, মধুর আহার,
দুঃখ শোকের কারণ নেই;
হেথায় কারো বারণ নেই
গরীব ধনী সবাই সমান্
ছোটর হেথা নাই অপমান্
পাচ্ছি প্রমাণ সর্ব্বদাই,
অভিজাতের গর্ব্ব নাই,—
নাইক বিধান মান্ধাতার,
নিমন্ত্রণ্ আজ হাল্‌খাতার।

আশীর্ব্বাণী

শ্রীহাসিরাশি দেবী

প্রথম-প্রাতের তরুণ অরুণ-রথে
যে-বারতা আসে নাম-নাহি-জানা পথে,
তাহারে করিয়া নব জীবনের সাথী
হৃদয়ে জানাও মৃদু-মধুচ্ছন্দাতে।
উদয়-উষার প্রথম যাত্রীদল
আগাইয়া চল দীপ্ত অচঞ্চল !
পথের দু'পাশে ফুল যদি যায় ঝ'রে
তৃপ্তি বিহীন তৃষা যদি ফোটে জলন্ত অক্ষরে,
মরুর তপ্ত বালুকার বুকে যদি হও দিক্‌হারা,—
হে বন্ধু, ঘরছাড়া—
দিক্‌দিগন্তে অনন্ত মেঘ, প্রলয়ের দীপশিখা,
তোমাদের ঐ ললাটে জ্বালিবে বিজয়ের বর্ত্তিকা
নব জনমের মাঝে,
অন্তবিহীন সাঁঝে।

হালখাতা—

শ্রীসুধাকান্ত রায় চৌধুরী

হালখাতাতে গত কালের বকেয়া আসে জের
পাওনা-দেনা চলছে মিশে দেখলে পাবে টের,
হাল দিনের পাওনাটাকে
মহাজন যে-খাতায় রাখে
সেই খাতাতে পুরাতনের দেয়-ই থাকে ঢের।

অপরাজেয় কথাশিল্পী

৺শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

"… …অনেকে মনে করেন যে শরৎচন্দ্র কতকগুলি গুরুতর সমাজ-সমস্যার সমাধান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমার কিন্তু তাহা মনে হয় না।…… তাঁহার চরিত্রাঙ্কনে যে সকল প্যাটার্ণ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা সেই অঙ্কনী প্রতিভার স্বাভাবিক বিকাশ। তিনি যে মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহা মনোবিজ্ঞানের অধ্যায় বিশেষ নহে, তাহা তাঁহার সৌন্দর্য্য সৃষ্টির একাংশ মাত্র। তিনি মনোবিজ্ঞানের বিদ্যা ফলাইতে চাহেন নাই, অথচ তাঁহার মনস্তত্ত্ব এত সূক্ষ্মদৃষ্টি সমন্বিত! শ্রেষ্ঠ শিল্পীর কৃতিত্ব ত এখানেই।"…

রায় বাহাদুর শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

---

৯০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

হাওড়া টু রিস্‌ড়া !

শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী

"—আবার বোমা বর্ষণ—শত শত পল্লী বিধ্বস্ত, লক্ষ লক্ষ নরনারীর কাতর আর্ত্তনাদে বাতাস কম্পিত—" পড়ছেন সকাল বেলা আপনার চায়ের টেবিলেই হোক আর রান্নাঘরের চৌকাঠে বসেই হো'ক (যে পোজিশনের লোক আপনি) গরম পেয়ালাটী হাতে।

টাটকা কাগজের ভাঁজটা খুলে, খেলার আর সিনেমার পাতাটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিয়েই মন দিয়েছেন যুদ্ধের খবরে। চক্ষু বিস্ফারিত, নিশ্বাস রুদ্ধ, চৈতন্য লুপ্তপ্রায়, কাজেই আপনার চা গেল জুড়িয়ে। অতএব পড়ার শেষে আর এক পেয়ালার আবেদন জানাতে হ'ল আপনাকে। ব্যস্।

কিন্তু অনুভব করেছেন কখনো হাজার হাজার বোমা বর্ষণের শব্দ কী মারাত্মক? লক্ষ লক্ষ নরনারীর আর্ত্ত চীৎকার ধ্বনি কী মর্ম্মান্তিক? বোমাবিধ্বস্ত পল্লীর শোচনীয় দৃশ্য কী লোমহর্ষক! করেন নি? করবেন কোথা থেকে চোখে না দেখলে? তবে হ্যাঁ, মোটামুটি আন্দাজ একটা আপনার আসতে পারে, যদি ছুটির আগের, মানে যে কোন ছুটির আগের, হাওড়া ষ্টেশন দেখবার পরম সৌভাগ্য কিংবা চরম দুর্ভাগ্য আপনার ঘটে।

ভেবে দেখুন—সেই ক্রুদ্ধ রুদ্ধ, তপ্ত দৃপ্ত, আর্ত্ত উদাত্ত, রুক্ষ সূক্ষ্ম, ভয়াল করাল, বিশাল—(বর্ণপরিচয়ের সব কটা বানান বসিয়ে দিন, খেটে যাবে) এবং "বঙ্গবিহার উৎকল পাঞ্জাব মারাঠ রাজপুতান" ইত্যাদির মিশাল যে প্রচণ্ড কণ্ঠকল্লোল উঠছে তা'তে কি বাতাস কম্পিত হয়ে উঠছে না? সেই জনসমুদ্রের প্রবল তরঙ্গে বিধ্বস্ত মানুষ, প্রাণটা না হো'ক—হারিয়ে ফেল্‌ছে না নিজের কাছা কোঁচা পাগড়ী দাড়ি, হাত পা নাক কান? নিয়তির হাতে খেলার পুতুলের মত, অসহায় ভাবে ছেড়ে দিচ্ছে না আপনাকে ভীড়ের হাতে?

তবে ?

আর টিকিট কেনার সময়ের অবস্থা, থাক্ সে কথা না তোলাই ভাল মানে তুলে লাভ কি ? কতটুকুই বা বলতে পারবো আমি ? শুধু ট্রেণে চড়ার পর যখন বুকে হাত দিয়ে অনুভব করলাম হার্টটা সম্পূর্ণ ফেল্ করে ফেলিনি, তখন আশ্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে অন্য অবয়ব গুলো মিলোতে বসলাম।

নাঃ ঈশ্বরেচ্ছায় যেখানকার যা ঠিক ঠিকই আছে। মানে দুর্গা নাম স্মরণ করে বেরোণোর দরুণ-ই বোধহয় বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে হয় নি।

শুধু সিল্কের সার্টটা—আন্‌কোরা নতুন ছিল, তা' থাক্, বাঁদিকের হাতা খানা আর পিঠের খানিকটা বাদে সবটাইতো রয়েছে, নতুনই রয়েছে। পিঠের চামড়া খানিকটা পিঠ থেকে হারিয়ে গেছে আন্দাজ করে কাতর হচ্ছিলাম। কিন্তু তা' হারায়নি, গেঞ্জির ভেতরই খুঁজে পাচ্ছি।

কবি ঠিকই বলেছেন—"তোমার মহাবিশ্বে কিছু হারায়না কো কভু—" হারাবার মধ্যে কোঁচার আগাটুকু, কিন্তু কি এমন দামী জিনিস ওটা ? আর কিই বা কাজে লাগে ঘামের সময় মুখ মোছা ছাড়া ? তার জন্যে তো রুমালই রয়েছে।

তেমনি পায়ের দিকে কিছু লাভই হ'ল বরং। এই তো দু'পায়ে দুটো চটি পরে এসেছিলাম—এখন দেখছি ডানপায়ে দিব্যি একপাটি গ্রীসিয়াণ শ্লীপার, জিনিসটা দামী।

যাক, গাড়ীতো "ন স্থানং তিল ধারণং"। বাঙ্কে উঠে পড়াই শ্রেয়। উঠতে যাচ্ছিও—হঠাৎ দারুণ হোঁচোট খেলাম। শারীরিক হোঁচোট নয়—মানসিক। ডাক্তারী শাস্ত্রে যাকে মেণ্টাল শক্ বলে আর কি।

টিকিট সীতারামপুরের !

অবস্থাটা কল্পনা করুন আপনি শ্রীরামপুর যাত্রী, যাচ্ছেন বোনকে আনতে, দুশ্চিন্তার মধ্যে—চেহারাখানা ঠিক নতুন কুটুম্ব বাড়ীর উপযুক্ত কি না এই— হঠাৎ দেখলেন হাতের টিকিটখানা নাম বদলে ফেলেছে ? সীতারামপুর কোথায় সে হতচ্ছাড়া দেশ পূবে কি পশ্চিমে, উত্তরে কি দক্ষণে তাই বা কে জেনে রেখেছে !

মাথায় হাত দিয়ে পড়তাম—যদি পড়বার জায়গা থাকতো, কিন্তু জায়গার অভাবে মাথায় হাত দিয়ে দাঁড়িয়েই থাকলাম। কেউই লক্ষ্য করেনি আমার মৌখিক চেহারাটা, শুধু পাশের সেই ভদ্রলোক, যিনি এতক্ষণ স্রেফ্ বুদ্ধির জোরে ন স্থানং তিল ধারণং গাড়ীতে, নিজের ডজন খানেক ট্রাঙ্ক, সুটকেস্, বেডিং, হোল্ডঅল্, খাবারের চাঙারী, জলের কুঁজো ইত্যাদির স্থান সঙ্কুলান করে নিয়ে সুস্থির চিত্তে সবে একটিপ নস্য নিচ্ছিলেন,—প্রশ্ন করলেন, কি মশাই, কি হল ?

—হল আমার মাথা, ভুল টিকিট দিয়েছে ব্যাটা। আর আশ্চর্য্যই বা কি, যা ভীড়, প্রাণটা নিয়ে বেরিয়ে আসতে পেরেছি এই যথেষ্ট।

—ফোঃ—ভীড় কোথা ? একে আবার ভীড় বলে নাকি ? ভীড় দেখতে চান তো লণ্ডনের এক একটা টিউব ষ্টেশনের মুখে যান, বোমার হুজুগে—যাক সে কথা, কোথায় যাচ্ছিলেন ?

—আজ্ঞে শ্রীরামপুর !

—আরে য্যা, ছ্রীরামপুরের টিকিট কিনতেই একেবারে 'ইয়ে' করে ফেলেছেন ? হুঁঃ। ভদ্রলোকের চোখমুখ আর গোঁফের ডগা দিয়ে অবজ্ঞা আর তাচ্ছিল্য ঝরে পড়লো যেন।

যেন হুগলী শ্রীরামপুর, চুঁচড়ো চন্দননগরের, টিকিট কিনতে মোটেই ভীড় ঠেলতে হয় না, রাস্তায় রাস্তায় ফেরি করেই বেড়াচ্ছে বুঝি বা। তবু লজ্জায় এতটুকু হয়ে গেলাম,—আপনি ?

—আমি ? বম্বে। কণ্ঠস্বরে ঝরে পড়লো বিশ্বের সমস্ত সম্ভ্রম, আর গৌরব। মুখ আর তুলতে পারিনে।

—কোথাকার টিকিট দিয়েছে ?

—আজ্ঞে, সীতারামপুরের, দশটাকার নোট দিলাম একটা—তাড়াতাড়িতে চেঞ্জ নেওয়া হল না, টিকিটটাও দেখে নেওয়া হল না—কি যে করি !

—কিচ্ছু ভাববেন না, দিয়ে দেবেন আমায়, পরের অসুবিধে দেখতে পারি না মশাই, গোছা গোছা টিকিট সঙ্গে রাখি ; এই নিন রিসড়ের টিকিট একখানা—নেমে ঘোড়ার গাড়ী করে নেবেন। সেবারে অমনি—যাক সে কথা।

অভিভূত হয়ে গেলাম—বম্বে যাত্রী হয়ে, বালি আর উত্তরপাড়া, এখান

আর সেখানের গোছা গোছা টিকিট পকেটে মজুত রাখা—নিছক্ পরোপকারের খাতিরে—শুনিনি তো আজ পর্য্যন্ত।

—রিষ্টওয়াচ আছে সঙ্গে? ঠিক সময় দেয়? দিনতো আমারটার সঙ্গে মিলিয়ে নেই। দিতে হল না, নিজেই খুলে নিলেন তিনি।

—আচ্ছা সাহস তো আপনার? এই ভীড়ে রিষ্টওয়াচ—চাপ্ পড়লে বাপ্ বলিয়ে ছাড়বে। 'ট্রেঞ্চে' থাকতে এসব জিনিস সঙ্গে রাখার আইন একেবারেই ছিল না, আমি আবার মশাই—

কৌতুহল অদম্য হয়ে উঠলো, না বলে থাকতে পারলাম না—যুদ্ধে গিয়েছিলেন নাকি?

—কি বললেন? যুদ্ধে গিয়েছিলাম কিনা?—ভদ্রলোকের মুখে একটা রোমাণ্টিক্ হাসি ফুটে উঠলো।—বলি এ যুদ্ধের গোড়াপত্তন করলে কে? পশু 'ল্যাণ্ড' করেই আবার আজ বোম্বে দৌড়ুচ্ছি কেন? যাক্‌গে সে অনেক কথা। দেশের কি জানেন আপনারা—সুভাষ বোসের খবর রাখেন?

—খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তো—

খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না—হুঁ কেন যাচ্ছে না? সকলের নাড়ি নক্ষত্রের খবর এ-ই হাঁড়িটাতে।—

(চক্ষু লজ্জায় হাঁড়ি বললেন বটে—আসলে সেটা জালা ছাড়া কিছু নয়) হুঁ কি বলছিলাম—খবরের কথা? কোন খবরটা চান? কাগজে সত্যি খবর কিছু বেরোয়? রাম কহো—ও তো 'এলে বেলে' খেলা। এই যে হিট্‌লার হিট্‌লার করে মরছে লোকে, আছে সে এখনো? ফোঃ, মরে ভূত হয়ে জন্মালো এতদিনে—কফিন্ তৈরি হ'ল কার হাত দিয়ে? এ—ই শর্ম্মা, রাতারাতি কাঠ চিরিয়ে তক্তা বানিয়ে—যাক্‌গে, বলতে গেলে সে মহাভারত।

সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো—উঃ কী লোককেই সহযাত্রী পেয়েছি, দুহাতে তাঁর বলের মত গোল লোমশ হাতখানি চেপে ধরে বললাম—ছাড়ব না মশাই, বলতেই হবে কী ব্যাপার।

বলি তাহলে—নেহাৎ যখন ছাড়ছেন না—দুটো পান খেয়ে 'যুৎ' করে বসি তা'হলে,—আছে না কি? নেই—তা থাকবে কেন? ইয়ংম্যান,—রাণী উইল হেলমিনা দিনে ক'টা করে পান খান তা' জানেন? পান সাজবার জন্যে

বাঙালী ঝি রয়েছে আলাদা। সে যাক্‌গে—সোনার বোতাম পরে ভীড়ের ভেতর আসবেন না কখনো—যাচ্ছেন তো বোনের শ্বশুর বাড়ী, নিজের তো নয়, তার আবার সিল্কের সার্ট, সোনার বোতাম—ছ্যাঃ ছ্যাঃ রাবিশ। হ্যাঁ, কি বলছিলাম ?—

—সেই যে হিট্‌লারের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া—

—ও হ্যাঁ—হঠাৎ সেই রাইণ নদীর ওপর তুষারপাতের দৃশ্যটা মনে পড়ে কেমন অন্যমনা হয়ে গেছলাম—তারপর তো মশাই—সেই রাত্রে—। ঠিক এই সময় ট্রেণ রিসড়া ষ্টেশনে থামলো।

ভদ্রলোক চকিতের মধ্যে উঠে দাঁড়িয়ে, ব্যস্ত হয়ে বললেন—নেমে পড়ুন মশাই, নেমে পড়ুন—মোটে আধ মিনিট ষ্টপেজ, রদ্দি জায়গা।

দরজা খোলবার আগে একরকম পাঁজা-কোলা করে জানালা দিয়েই ঠেলে দিলেন আমায়। ভালই করলেন। ট্রেণ চলতে সুরু করেছে ততক্ষণে।

পরক্ষণেই ভদ্রলোকের কী কাতর চীৎকার,—"ও মশাই! আপনার রিষ্টওয়াচ যে আমার পকেটেই রয়ে গেল—ছুঁড়ে দেব ? ভেঙে যাবে যে—ঠিকানাটা কি আপনার ? কি বললেন ? তেরোর তিন দর্মাহাটা ? গড়িয়াহাটা ? গরণাহাটা ? মুর্গিহাটা ?···আচ্ছা লোক তো ঘড়িটা ফেলে রেখেই—"

···শেষ বগীখানাও ঘস্‌ঘস্‌ শব্দে চোখের সামনে দিয়ে চলে গেল। কিন্তু শুধুই কি ঘড়ি ? সোনার বোতাম! যাকগে—পার্শেল করবার সময় ভদ্রলোক কি আর ওটার কথা ভুলে যাবেন ? গল্পের শেষটা শুনতে পেলাম না এই আফশোষ।—বড্ড ভুল হল। ঠিকানাটা জেনে নিলেই হত!

হেমন্তে—

শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী

মার্গের শীর্ষ কেন হ'ল অগ্রাণ,
সহজেই টের পাবে, দিকে দিকে লও ঘ্রাণ ;
'মিত্রে'র পূজাতে চাই কত আয়োজন,
ফল চাই, ফুল চাই, রান্নারও প্রয়োজন।
পায়স নূতন গুড়ে, পিঠা মুগ—সামুলি ;
স্বক্তানি, বড়িভাজা, ঘণ্ট যা' মামুলি।
সরুচাকী, রসবড়া, চাল্‌তার অম্বল,
চচ্চড়ি, ভাজাভুজি বাঙালীর সম্বল।
উম্‌নার, ঝুম্‌লার ইতুকথা—লক্ষ্মীর
তিল-সোনা-ব্রতকথা, ডালভাত, দইক্ষীর।
নবান্নে নানা নেঠা, জানে সব গিন্নি,
জনে জনে বেঁটে ফেরা, যেন কাঁচা সিন্নি।
নয়া গুড়, নয়া চাল, দুধ, ফল-ফুলারী,
ক্ষীরপুলি মেওয়া দিলে হয় আরও দুলারী।
সরষের, মুলোফুলে, কলায়ের শুঁটীতে,
সবুজের শোভা বাড়ে রংদার বুটীতে।
সোনা-ফলা পাকা ধানে, ভরে ওঠে ভরা বুক,
আকাশেতে গান ভাসে, ছেলে বুড়ো হাসি মুখ।
'মৃগশিরা' তারকার নামে বটে পরিচয়,
যদিও হয়েছে এর, তবু শুধু তাই নয়।
জমা দেয় গোলাঘরে বরষের অন্ন ;
জীবনের মার্গে এ শ্রেষ্ঠ সেজন্য।

রূপিয়া আর টাকা

অধ্যাপক **শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়**; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

'রূপা' ব'ললে আমরা এক রকম ধাতু বুঝি, হিন্দীতে যে ধাতুর নাম 'চাঁদী,' ইংরেজীতে Silver 'সিল্‌ভর', সংস্কৃতে 'রজত'। এই ধাতুতে তৈরী মুদ্রাকে আমরা বাঙ্‌লায় বলি 'টাকা'; টাকার আধা দামের মুদ্রাকে আমরা বলি 'আধুলি', তার পরে 'সিকি' আগে দুয়ানি-ও রূপার হ'ত। হিন্দুস্থানীরা আর অন্য পশ্চিমারা রূপার টাকাকে বলে 'রুপিয়া (রূপিয়া, রূপেয়া, রূপৈয়া)'। ইংরেজেরা আর অন্য ইউরোপীয়েরা এই 'রুপিয়া' শব্দকে ব'দ্‌লে করে নিয়েছে 'রুপি', rupee, roupie।

'রূপা' আর 'রুপিয়া' বা 'রূপিয়া'—এই দুটো শব্দ পরস্পর সম্পৃক্ত। এ বিষয়ে চিন্তা ক'রলে প্রথমটায় মনে হবে, বোধ হয় 'রূপা' নামে ধাতুতে তৈরী ব'লেই টাকার আর একটী নাম 'রূপিয়া'। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তা নয়। 'রূপিয়া' বা টাকা এই ধাতু থেকে তৈরী হয় ব'লেই, ধাতুটীর নাম হ'য়েছে 'রূপা'।

বাঙলা 'রূপা' আর হিন্দী 'রূপিয়া' শব্দ দুইটীর উদ্ভব একই শব্দ থেকে। সংস্কৃতের 'রূপ্য' বা 'রূপ্যক' শব্দ হ'চ্ছে এ দু'টীর মূল। 'রূপ্য' বা 'রূপ্যক' মানে হ'চ্ছে 'সুন্দর', অর্থাৎ যার 'রূপ' আছে; আবার অন্য মানে হ'চ্ছে, যার উপর কোনও 'রূপ' বা চিত্র—ছবি বা নক্‌শা—ছেপে দেওয়া হ'য়েছে। 'রূপ্য, রূপ্যক' শব্দের এই দ্বিতীয় অর্থ, ক্রমে এর একটা প্রধান অর্থ হ'য়ে দাঁড়াল'। কোনও ছবি বা নক্‌শার ছাপ-মারা স্বর্ণ বা রজত-খণ্ডকে —সোনা বা চাঁদীর টুকরাকে—'রূপ্য, রূপ্যক' বলা হ'ত। প্রাচীন কালেই ক্রমে 'রূপ্য'র অর্থ দাঁড়িয়ে' গেল—ছাপ-মারা টাকা। রজত-খণ্ডের টাকা বেশী প্রচলিত ছিল,—সোনার টাকা এখনকার মত তখনও দুর্লভ ছিল, আর তামার পয়সার দাম, রজত-মুদ্রার সঙ্গে তুলনায় ততটা নয়; সেই জন্য 'রূপ্য, রূপ্যক' শব্দ, বিশেষ ক'রে রজত-ধাতুর তৈরী মুদ্রা বোঝাতে ব্যবহৃত হ'তে

লাগ্‌ল ; আর ক্রমে, অর্থের প্রসারে, রজত-ধাতুরই আর একটা নাম দাঁড়িয়ে গেল 'রূপ্য', 'রূপ্যক' এবং 'রৌপ্য'। প্রাকৃতে অর্থাৎ প্রাচীন কালের মৌখিক ভাষা ভাঙা-ভাঙা সংস্কৃতে এই শব্দ হ'য়ে প'ড়্‌ল 'রুপ্প, রুপ্‌পঅ,' আর পরে তা থেকে আমাদের বাঙলা আর হিন্দী শব্দ। হিন্দীর 'রূপিয়া'তে এখনও 'রূপ্য' শব্দের প্রাথমিক অর্থ—'রূপ বা ছবির ছাপ-মারা মুদ্রা' বা 'রজত-মুদ্রা'—অনেকটা বজায় আছে; বাঙলায় কিন্তু এর বিস্তারিত অর্থ—'রজত-ধাতু'—এখন সাধারণ হ'য়ে গিয়েছে।

বাঙলা 'টাকা' শব্দেরও ইতিহাস কতকটা এই পর্যায়ের। প্রাচীন কালে 'টঙ্ক' ব'লে একটা শব্দ ছিল, তার মানে—'কাট্‌বার কোনও যন্ত্র'। শব্দটা সংস্কৃতে পাওয়া যায়, কিন্তু মূলে এটা কোন্ ভাষার শব্দ, তা জানা যায় না। তারপরে এর মানে দাঁড়াল'—'যন্ত্রের সাহায্যে ছাপ-মারা মুদ্রা''। 'টঙ্ক' থেকে ক্রমে * 'টাঁকা', তার থেকে 'ট্যাকা,' 'টাকা,' 'টেঁয়া' প্রভৃতি প্রচলিত বাঙলা রূপ। (আমরা লিখি 'টাকা,' কিন্তু ক'লকাতা-অঞ্চলে বলে থাকি 'ট্যাকা' ; পূর্ব-বঙ্গের কোনও-কোনও স্থানে 'টাহা', 'ট্যাহা' বলি ; আর নোয়াখালী আর চট্টগ্রামে বলি 'টেঁয়া')। 'টঙ্ক' বা 'টাকা' মানে—যে কোনও ছাপ-মারা মুদ্রা, তা সোনার হ'ক্ বা রূপার হ'ক্, বা তামার হ'ক। সংস্কৃত 'টঙ্কশালা' থেকে বাঙলা —'টাঁকশাল', হিন্দী 'টকসাল'। হিন্দীতে এই থেকে 'টকা' শব্দ এসেছে, 'টকা'র মানে 'তাম্র-মুদ্রা, দুই-পয়সা'। বাঙলায় 'টাকা' মানে দাঁড়িয়েছে 'রৌপ্য-মুদ্রা'। আবার দক্ষিণ-ভারতে—কেরল-দেশে বা ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন-মালাবারে 'টঙ্ক' শব্দ এখনও প্রাচীন 'টঙ্ক' রূপেই প্রচলিত আছে; কেরল-দেশের মালয়ালী ভাষায় 'টঙ্ক' মানে সোনা। এই শব্দ আবার 'তঙ্ক' রূপেও মেলে—দক্ষিণ দেশে, আর বাঙলা দেশেও ; 'টাকা'কে কখনও কখনও বাঙলায় 'তঙ্কা' বলা হয়।

মুদ্রায় বা টাকায় এই যে 'রূপ' বা 'ছবি' থাকে, কত আগে থেকে মানব-সমাজে তার রেওয়াজ চ'লছে? আজ কাল সব দেশের টাকাতেই কোনও না কোনও প্রকারের রূপ বা ছবি থাকে। প্রাচীন মুদ্রার ইতিহাস খুঁজ্‌লে দেখা যায়, জিনিস কেনা-বেচার জন্য কোনও চিহ্ন দিয়ে ছাপ-মারা ধাতু-খণ্ড খুব সম্ভবতঃ ভারতবর্ষেই প্রথম ব্যবহৃত হ'ত। এদেশে

আর্যেরা আসবার আগে, এখন থেকে ৫০০০ পাঁচ হাজার বছর আগে, এইরকম তামার মুদ্রা—চিহ্ন-যুক্ত ক্ষুদ্র তাম্র-খণ্ড—সিন্ধু-প্রদেশে পাওয়া গিয়েছে। এই তাম্রখণ্ডগুলি চৌকা আকারের। এর পরেও আমাদের দেশে বহু প্রাচীন মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে—এখন থেকে আড়াই হাজার বছর আগেকার কালের। এগুলিরও আকার চৌকা,—রূপা আর তামা এই দুই ধাতুতে তৈরী; এগুলির গায়ে নানারকম চিহ্ন, গোরু হাতী ফুল লতা পাতা মন্দিরের ছবি প্রভৃতি ছাপা হ'ত। প্রাচীন ভারতের এইরকম চৌকা মুদ্রাকে 'পুরাণ' বলে।

এশিয়া-মাইনরে Lydia লিডিয়া ব'লে একটী প্রাচীন দেশ ছিল—এই দেশে যীশু খ্রীষ্টের সাতশ' বছর আগে চিহ্ন-দেওয়া ধাতুর মুদ্রা ব্যবহৃত হ'ত। প্রাচীন গ্রীক জাতি বোধ হয় লিডিয়ায় মুদ্রার ব্যবহার লোকেদের কাছ থেকে শেখে। গ্রীকেরা তাদের ঠাকুর-দেবতার মাথা আর মুখের ছবি দিয়ে, জন্তু-জানোয়ার, ফুল-পাতা মানুষের মূর্তি প্রভৃতি দিয়ে অতি সুন্দর সুন্দর টাকা বানাত', সেগুলির সৌন্দর্য অতুলনীয়। গ্রীকেরা গোল আকারের মুদ্রা বিশেষ ভাবে প্রচলিত করে। গ্রীকদের সঙ্গে আমাদের দেশের যোগ ছিল; প্রাচীন ভারতবর্ষেও ক্রমে গ্রীকদের দেখাদেখি গোল মুদ্রার রীতি এসে যায়। গ্রীকদের পরে রোমানরা, তার পরে এদের দেখাদেখি অন্য জাতির লোকেরা গোল টাকা বানিয়ে ব্যবহার ক'রে আসছে।

আগে অসাধু লোকেরা গোল টাকার ধার থেকে একটু-একটু রূপা কেটে নিত। তা'তে টাকার ওজন কম হ'ত,—প্রত্যেক বার লেন-দেন কেনা-বেচার সময়ে টাকা ওজন ক'রতে হ'ত। এই অসুবিধা দূর করবার জন্য, যাতে অসাধু লোক মুদ্রা থেকে রূপা কেটে না নিতে পারে সেইজন্য, টাকার ধারে কিরকিরে' দাগ করে দেবার রেওয়াজ আসে, প্রায় তিন শ' বছর হ'ল। এখন টাকার রূপা কেউ কেটে বা'র ক'রে নিতে পারে না—সে চেষ্টা সহজেই ধরা পড়ে।

আমাদের টাকায় যে ছবি আছে, সে ছবি ভাল ক'রে কি দেখেছ? তার মানে কি, কখনও ভেবে দেখেছ? যেমন এখনকার সম্রাট্ ষষ্ঠ জর্জের টাকা। টাকার একদিকে রাজার মূর্তি—মাথায়-মুকুট গলা-পর্যন্ত মূর্তি। নাম উপাধি ইংরেজীতে লেখা, 'রাজা ও সম্রাট্ ষষ্ঠ জর্জ'। অন্যদিকে মাঝখানে

ইংরেজীতে লেখা 'ওয়ান্ রুপি' বা 'এক টাকা', 'ইণ্ডিয়া' বা ভারতবর্ষ, আর তার নীচে তারিখ বা বৎসর; আর তার পরে তলায় ফারসী হরফে লেখা, 'য়ক্ রূপিয়হ্' বা 'এক টাকা'। টাকার এ পিঠে চারিদিকে ফুল লতা পাতা আঁকা আছে। ফুলগুলির মধ্যে, উপরে মাঝে আছে একটী বড় পদ্ম ফুল, পাশ থেকে দেখলে যেমন দেখায়, আর নীচে তেমনি মাঝে আর একটী পদ্ম ফুল, উপর থেকে ফোটা পদ্ম যেমন দেখায়; পদ্ম হ'চ্ছে ভারতের ফুল, ভারতের লাঞ্ছন বা প্রতীক বা চিহ্ন, টাকায় ঐ দুইটী পদ্ম দিয়ে ভারতবর্ষকে বোঝানো হ'চ্ছে। তার পরে, উপরে দু পাশে দুটী গোলাপ—গোলাপ হ'চ্ছে ইংলাণ্ডের লাঞ্ছন; তার পরে, উপরে তেপাতা, ইংরেজীতে একে Shamrock শ্যামরক বলে, আয়র্লাণ্ডের আইরীশ ভাষায় ব'লে Seamroc, এই তেপাতা আয়র্লাণ্ডের চিহ্ন; আর তারও নীচে দুপাশে thistle থিস্‌ল্—এক রকম কাঁটাঘাসের ফুল—এই ফুল স্কটলাণ্ডের লাঞ্ছন। ভারতবর্ষের মুদ্রায় ইংলাণ্ডের চিহ্ন না হয় রইল—কিন্তু স্কটলাণ্ড আয়র্লাণ্ডের লাঞ্ছন কেন থাকে? আর ফারসীতে লেখা কেন থাকে? মোগল বাদশারা বিদেশী ফারসী ব্যবহার ক'রতেন, রাজভাষা হিসাবে; সেদিন তো অনেকদিন হ'ল চ'লে গিয়েছে। ভারতীয় ভাষা আর ভারতীয় লিপি আমাদের ভারতের মুদ্রায় থাকা উচিত—যেমন নিকেলের সিকি দুয়ানি আর আনিতে থাকে। দেবনাগরী অক্ষর, যাতে সারা ভারতবর্ষে এখন সংস্কৃত লেখা আর ছাপা হয়, আর যা সমগ্র ভারতের শিক্ষিত হিন্দুদের অনেকেই বুঝবে, এটা ভারতের নিজস্ব বর্ণমালা; তাতে 'ভারতবর্ষ' আর টাকার নাম, এগুলি থাকলে আমাদের মনটা খুশি হয়, আর এইটেই হওয়া উচিত।

সমস্যা

অধ্যাপক হুমায়ুন কবির

আলোকে আজ সব ব্যক্ত আর দীপ্ত।
কোথাও নেইকো কোন ঢাকা, কোন ছায়া।
নিরাবরণ নগ্নতায় ঘুচল মায়া।
তাইতো পৃথিবীময় মানুষ আজ ক্ষিপ্ত।
নিজের রূপে নিজের মনে জাগে শঙ্কা।
নিজের কেন্দ্রে মেলেনা ক্ষণিকের স্থিতি।
মরুর মতন চিত্তে কোথায় পাবে প্রীতি?
তাইতো দিকদিগন্তে বাজে ধ্বংশের ডঙ্কা।
নগ্ন প্রকাশে মানুষের চিত্ত জীর্ণ।
চূর্ণ করে ফেলতে চায় নিজের দেহ।
আত্ম-অবিশ্বাসে জাগে যে সন্দেহ,
তারি তীব্র আঘাতে সকল বিশ্ব দীর্ণ।
আলো চাই, চাই আঁধারের অন্তরাল
ব্যক্ত অস্ত্রে অব্যক্তের উর্ণজাল।

কুমারজীব

অধ্যাপক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

তিব্বতের নাম তোমরা জান। তিব্বতের রাজধানী লাশা নগরীতে এক সময়ে কেহই প্রবেশ করিবার অনুমতি লাভ করিতে পারিত না বলিয়া লোকে উহার নাম দিয়াছিল নিষিদ্ধ নগরী বা "Forbidden City"। আচ্ছা বলত তিব্বত এই নামটি কিরূপে হইল? পণ্ডিতেরা বলেন, সে অতি প্রাচীন কালে তু-বুট্ নামে একটা জাতি ছিল বরফে

ঢাকা বন্ধুর এই পার্ব্বত্যদেশের অধিবাসী। বেট্, ভূত, বোড্ এসব শব্দ দ্বারা তিব্বতের সেই প্রাচীন অধিবাসীদের নানা গোষ্ঠিকে বুঝাইত। এই ভাবে তু-বুট হইতে দেশটির নাম হইল তিব্বত। ঐ সব জাতীয় লোকেরা যে মোঙ্গোলীয় তাহাতে কিন্তু কোনও সন্দেহ নাই।

তিব্বতের এই সব অধিবাসীদের মধ্যে ভারতবর্ষের বৌদ্ধ শ্রমণেরা আসিয়া মহাপুরুষ বুদ্ধদেবের ধর্ম্মপ্রচার করেন। আজ যদি তোমরা মধ্য-এসিয়া, কি চীনদেশ বেড়াইতে যাও তাহা হইলে এখনও ভারতীয় শিক্ষা, সংস্কৃতি ও শিক্ষার শত শত নিদর্শন দেখিতে পাইবে।

সেকালে যে সব শ্রমণেরা হিমালয় পর্ব্বতের তুঙ্গ শৃঙ্গ লঙ্ঘন করিয়া তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন তাঁহারা যে কিরূপ ধর্ম্মপ্রাণ, সাহসী, নির্ভিক দেশহিতৈষী ব্যক্তি ছিলেন তাহা তোমরা বুঝিতে পার। আজ এইখানে সেইরূপ একজন মহাপণ্ডিত বৌদ্ধ শ্রমণের কথা বলিতেছি।

দেড় হাজার বছরেরও আগে, অনুমান ৩৮১ খৃষ্টাব্দে, চীনদেশে হিয়ান্-ইউ নামে এক সম্রাট ছিলেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের একজন পরম উৎসাহী পরিপোষক ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে প্রজাদের মধ্যে দশ ভাগের নয় ভাগ লোকই শাক্যমুনির মহদ্ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। চীনাদের বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ এবং চীন সম্রাট এই ধর্ম্মকে রাজধর্ম্ম রূপে গ্রহণ করায় চীনারা বুদ্ধদেবের দেশ এই ভারতবর্ষে আসিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম শাস্ত্র পড়িবার জন্য অতি মাত্রায় ব্যাকুল হইয়া পড়িল। সে সময়কার চৈনিক পর্য্যটকেরা মধ্য এসিয়ার পথে পারস্যদেশ অতিক্রম করিয়া ভারতে আসিতেন। সম্রাট হিয়ান-ইউর সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম চীন হইতে পারস্য পর্য্যন্ত প্রচারিত হইয়াছিল।

৪০৫ খৃষ্টাব্দে চীন সম্রাট তিব্বতে এক অভিযান প্রেরণ করেন। তিনি সৈন্যাধ্যক্ষের প্রতি এই আদেশ দেন যে "তুমি সেখানে যদি কোন ভারতীয় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত দেখিতে পাও তাঁহাকে সঙ্গে আনিবে—কিংবা পাঠাইয়া দিবে।" সে সময়ে কুমারজীব নামে একজন ভারতীয় পণ্ডিত উত্তর তিব্বতের অন্তর্গত খুৎশী নামক স্থানে থাকিতেন, তাঁহার সহিত শ্রমণ বিমলাক্ষ নামে একজন পণ্ডিত ছিলেন, বিমলাক্ষের চোখ দুইটি ছিল নীল পদ্মের মত নির্ম্মল ও উজ্জ্বল। তাই শ্রমণের নাম হইয়াছিল বিমলাক্ষ।

কুমারজীব ও বিমলাক্ষ চীন সম্রাটের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া ৪০৮ খৃষ্টাব্দে চীন দেশে রওনা হইলেন। পথে যে তাঁহাকে কত ভীষণ মরুভূমি উত্তীর্ণ হইতে হইল, সে দুর্গম পথের কল্পনাও তোমরা করিতে পারিবে না। অজানা পথ, জল মিলে না, খাদ্য মিলে না, সঙ্গী নাই, রৌদ্রতপ্ত বালুকার সাগরের যেন সীমা শেষ আর নাই; সেইপথে কুমারজীব চলিয়াছিলেন সঙ্গী বিমলাক্ষকে লইয়া চীন রাজধানী নেন্‌কিনে।

বিমলাক্ষ এই পথের ক্লেশ সহ্য করিয়া চীনে পৌছিলেন বটে, কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হইল।

কুমারজীবকে সম্রাট অত্যন্ত সমাদরের সহিত গ্রহণ করিলেন, তাঁহার সুখ সুবিধার দিকে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিতেন।

সম্রাটের আদেশে কুমারজীব ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রন্থাদির চীনভাষায় অনুবাদ করেন। তোমাদের কাছে হয়ত আশ্চর্য্য মনে হইবে কিন্তু অতি সত্য কথা ৮০০ জনেরও বেশী ভারতীয় পণ্ডিত এই অনুবাদ কার্য্যে শ্রমণ কুমারজীবকে সাহায্য করিতেন। সম্রাট নিজে বৌদ্ধ শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন বলিয়া ঐ সমুদয় অনুবাদ পড়িতেন ও আলোচনা করিতেন। কুমারজীব সংস্কৃত ও চীন ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন বলিয়া অনুবাদের কার্য্যে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেন। তিনি প্রায় ৩০০ শত খানি গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছিলেন। এই সব বইয়ের টীকা-টিপ্পনী এমন সুন্দর ভাবে করেন যে সামান্য লেখাপড়া জানা লোকেও বুঝিতে পারিয়াছে।

চীনদেশের ইউ-ইয়াং নামক দেশের অধিবাসী বিখ্যাত পর্য্যটক ফাহিয়ান কুমারজীবের নিকট বৌদ্ধশাস্ত্র সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করেন এবং পরে ভারতবর্ষে আগমন করেন, বিনয়পিটক সম্বন্ধে গবেষণা করিতে এবং উক্ত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করিতে।

ফাহিয়ানের কথা এই প্রসঙ্গে বলিতে হইতেছে। এই চীন পর্য্যটক তাতার, আফগানিস্থান এমন কি কাস্পিয়ান সাগরের তীরবর্ত্তী অধিবাসীদের মধ্যেও বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রচারিত দেখিতে পাইয়াছিলেন। আফগানিস্থান হইতে তিনি দুর্লঙ্ঘ্য গিরিপথে অগ্রসর হইয়া সিন্ধু নদের পারে নানা দেশ ও পল্লী অতিক্রম করিয়া উজ্জয়িনী আসেন। সেখান হইতে মগধে আসিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান বৌদ্ধতীর্থ পর্য্যটন করিয়া, বহু পুথি সংগ্রহ করিয়া, ফাহিয়ান সিংহলে আসেন। সিংহল হইতে কানট যাইবার সময় সমুদ্রের মধ্যে তিনি ভীষণ ঝড়ে পড়িয়াছিলেন। জাহাজের যাত্রীরা প্রাণভয়ে ভীত হইয়া পড়িয়াছিল। সেই জাহাজের ব্রাহ্মণেরা ফাহিয়ানকে লক্ষ্য করিয়া যাত্রীদিগকে বলিয়াছিল যে, এই চীনা শ্রমণ জাহাজে উঠার জন্যই এমন ঝড় উঠিয়াছে, অতএব আসুন আমরা এই শ্রমণকে একটা দ্বীপে নামাইয়া দি ; একজন লোকের জন্য কি আমরা সকলে প্রাণ হারাইব ?

জাহাজে ফাহিয়ানের এক বন্ধু ছিলেন, তিনি বলিলেন— "যদি তোমরা ফাহিয়ানকে নামাইয়া দাও তবে আমাকেও নামাইয়া দিতে হইবে। কিন্তু মনে রাখিবে যদি কোন রকমে চীন দেশে পৌছিতে পারি তাহা হইলে সে দেশের রাজার কাছে তোমাদের এই হীন ব্যবহারের কথা বলিব। রাজা বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ পক্ষপাতী। অতএব আমাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে ভালভাবে বিচার করিয়া কাজ করিও।" জাহাজের যাত্রীরা এই কথার পর ফাহিয়ানের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করিতে সাহসী হয় নাই।

ফাহিয়ান যখন চীনদেশ হইতে রওয়ানা হন, তখন তাঁহার সঙ্গীরা ছিলেন সংখ্যায় অনেক, কিন্তু পথ ক্লেশে ও ব্যারাম পীড়ায় ভুগিয়া অনেকেই মারা যান।

ফাহিয়ান কুমারজীবের নিকট সংস্কৃতভাষা ও বৌদ্ধশাস্ত্র সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করেন ও দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং তাঁহার আদেশেই তিনি তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেন। তাহাতে বুঝা যায় যে ভারতীয় পণ্ডিত কুমারজীবের প্রতি তিনি কিরূপ শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন।

তোমরা বড় হইয়া যদি পালি ভাষা আলোচনা কর তাহা হইলে জানিতে পারিবে ভারতবর্ষে কুমারজীবের ন্যায় কত শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়া দেশে দেশে ভারতের জ্ঞান-গৌরব প্রচার করিয়াছিলেন।

ঊনবিংশ শতকের একজন বাঙালী কবি

শ্রীসজনীকান্ত দাস

ঈশ্বর গুপ্ত থেকে বাংলা কাব্য-সাহিত্যে যে নব ধারার সুরু হয়েছে, প্রসিদ্ধ, অপ্রসিদ্ধ এবং অধুনাবিস্মৃত অনেক কবিই সেই ধারার পুষ্টিসাধন ক'রে এসেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে রবীন্দ্রনাথ এই ধারার প্রায় শেষ এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি,—তাঁর সমসাময়িক দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল, গোবিন্দচন্দ্র দাস, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ও কবিপ্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। ঈশ্বর গুপ্ত থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত বাকী যাঁরা আছেন তাঁদের একজন, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, অমর কবি-সভায় একটা স্থায়ী আসন অধিকার ক'রে বসেছেন; অন্য কয়েকজনের নামও আমরা আজ পর্য্যন্ত ভুলতে পারি নি। দীনবন্ধু, বিহারীলাল, সুরেন্দ্রনাথ, রঙ্গলাল, হেম, নবীন,—এঁদের কাব্যের সঙ্গে আজকের যুগের পাঠকের যোগ থাকুক আর নাই থাকুক, ফ্যাশন অথবা সংস্কারের বশে এঁদের নাম আমরা প্রায়ই ক'রে থাকি। গিরিন্দ্রমোহিনী, মানকুমারী ও কামিনী রায় স্ত্রী-কবি ব'লেই আজও উল্লিখিত হন। কিন্তু কয়েকজনকে আমরা ভুলেই গেছি। তন্মধ্যে 'বাসবদত্তা'র কবি মদনমোহন তর্কালঙ্কার, 'ভারতগাথা'র কবি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী, 'স্বপ্নপ্রয়াণে'র কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সদ্ভাব শতকে'র কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, 'পুষ্পমালা'র কবি শিবনাথ শাস্ত্রীর নাম বিশেষভাবে করা যেতে পারে। মদনমোহন শিশুসাহিত্য রচনায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ দার্শনিক তত্ত্বালোচনায় ও শিবনাথ ধর্ম্মতত্ত্বব্যাখ্যানে প্রসিদ্ধি লাভ করলেও কবি হিসাবে নেহাৎ উপেক্ষণীয় ছিলেন না। এই কবি-সম্প্রদায় মধ্যে বিহারীলালের আসন একটু স্বতন্ত্র। আমি তাঁরই সামান্য পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব।

বিহারীলাল সৌভাগ্যবান। রবীন্দ্রনাথ ১৩০১ সালে আষাঢ় মাসের 'সাধনায়' বিহারীলালের কাব্য পরিচয় দিয়ে এক বিস্তৃত প্রবন্ধ প্রকাশ করেন—এতে তিনি বিহারীলালকে নিজের গুরুর গৌরব দিয়েছেন। শিশু রবীন্দ্রনাথের মনে 'অবোধবন্ধু' নামক মাসিক পত্রে প্রকাশিত বিহারীলালের কবিতা যে অপূর্ব্ব

প্রভাব বিস্তার করেছিল তিনি স্বয়ং তার বর্ণনা করেছেন। এই প্রভাবের ফলেই রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন বাঙলাকাব্যধারার বহিঃপ্রকৃতির বর্ণনামূলক পদ্ধতি পরিত্যাগ ক'রে অন্তরপ্রকৃতির রহস্যসমূদ্রে অবগাহনে প্রবৃত্ত হন এবং সেই হ'ল রবীন্দ্র-কাব্যের আসল সূত্রপাত। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"সে প্রত্যূষে অধিক লোক জাগে নাই এবং সাহিত্যকুঞ্জে বিচিত্র কলগীত কূজিত হইয়া উঠে নাই। সেই উষালোকে কেবল একটি ভোরের পাখী সুমিষ্ট সুন্দর সুরে গান ধরিয়াছিল সে সুর তাহার নিজের।

ঠিক ইতিহাসের কথা বলিতে পারি না—কিন্তু আমি সেই প্রথম বাংলা কবিতায় কবির নিজের সুর শুনিলাম।

রাত্রির অন্ধকার যখন দূর হইতে থাকে তখন যেমন জগতের মূর্ত্তি রেখায় রেখায় ফুটিয়া উঠে—সেইরূপ অবোধবন্ধুর গদ্যে এবং পদ্যে যেন প্রতিভার প্রত্যূষ-কিরণে মূর্ত্তির বিকাশ হইতে লাগিল। পাঠকের কল্পনার নিকটে একটি ভাবের দৃশ্য উদঘাটিত হইয়া গেল।

"সর্ব্বদাই হু হু করে মন,
বিশ্ব যেন মরুর মতন ;
চারিদিকে ঝালাফালা,
উঃ কি জ্বলন্ত জ্বালা !
অগ্নিকুণ্ডে পতঙ্গ পতন।"

আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে এই প্রথম বোধহয় কবির নিজের কথা।"

বিহারীলালের দ্বারা এ কাজ সম্ভব হয়েছিল, তার কারণ বিদেশী কাব্যসাহিত্যের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয় না থাকলেও কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য প্রমুখ বন্ধুদের সহায়তায় বিদেশী কাব্যের অন্তর্নিহিত কাব্যরসে তিনি অহরহ ডুবে থাকতেন ; তা ছাড়া সংস্কৃত ও বাঙলা সাহিত্যের সঙ্গেও তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। দেহগঠন ও দৈহিক বলের জন্যে তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন ; সুস্থ সবল বিরাট দেহের জন্য তাঁর মনের স্বাস্থ্য ছিল খুব ভাল ; প্রসন্ন এবং পবিত্র মন নিয়ে তিনি কাব্যরচনা করতেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ীতে তাঁর অখণ্ড প্রতিষ্ঠা ও অবাধ গতি ছিল ; সেই বাড়ীর 'কাল্‌চারে'র হাওয়া তাঁর গায়ে লেগেছিল। দ্বিজেন্দ্রনাথ সেই সময়ের কথা এই ভাবে লিখেছেন—"বিহারীবাবু সর্ব্বদাই কবিত্বে মজগুল

থাকিতেন। তাঁহার হাড়ে হাড়ে, প্রাণে প্রাণে কবিত্ব ঢালা থাকিত ; তাঁহার রচনা তাঁহাকে যত বড় কবি বলিয়া পরিচয় দেয়, তিনি তাহা অপেক্ষাও অনেক বড় কবি ছিলেন।"

১২৪২ সালের ৮ই জ্যৈষ্ঠ কলিকাতায় বিহারীলালের জন্ম এবং ১৩০১ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ ৫৮ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। ১২৮৯ সালে কোনও বন্ধুকে লেখা পত্রে তিনি লিখেছেন—

"আমি হিন্দু, যেহেতু হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। অতি সৌভাগ্যক্রমে অন্য কোনও ধর্ম্ম গ্রহণ করি নাই, করিবও না। আমার বাটীতে বিগ্রহ আছেন। নিত্য তাঁহার পূজা-ভোগ হইয়া থাকে। তাঁহাকে লইয়া আমরা সপরিবারে সুখে আছি।"

তাঁর কাব্যপ্রেরণার মূল এই পারিবারিক সুখ। তাঁর ভাষা ও কাব্য সম্বন্ধে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্যের মত এই—

"যাহা তিনি নিজে দেখিতেন, শুনিতেন বা অনুভব করিতেন, যেন কোন এক দুর্দ্দম প্রবৃত্তি তাঁহাকে সেইগুলি কবিতাকারে লিপিবদ্ধ করিতে প্রবর্ত্তিত করিত। যে শব্দটি সম্পূর্ণরূপে তাঁহার মনের ভাবের প্রখরতা-ব্যঞ্জক হইত এবং আপনা হইতেই তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিত, সেই শব্দটি ভাষা হউক, অপভাষা হউক, অপভ্রংশ হউক, তিনি প্রয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। অথচ তাঁহার শ্লোকগুলি পড়িয়া দেখ, এমন খাঁটি বাঙ্গলা আজকাল কুত্রাপি পাইবে না। এরূপ ঝরঝরে বাঙ্গলা বড়ই বিরল, অথচ ভাবগুলি সম্পূর্ণ নূতন ধরণের।"

তাঁর সাহিত্যকীর্ত্তির মধ্যে অবোধবন্ধু সম্পাদনা ; বন্ধুবিয়োগ, প্রেম-প্রবাহিনী, নিসর্গসন্দর্শন, বঙ্গসুন্দরী, সঙ্গীতসতক, সারদামঙ্গল, মায়াদেবী, শরৎকাল, ধূমকেতু, দেবরাণী, বাউল-বিংশতি, সাধের আসন প্রভৃতি কয়েকটি কাব্য ও কবিতা রচনা এবং স্বপ্নদর্শন নামক একটি গদ্য রচনার উল্লেখ করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালের বঙ্গসুন্দরী ও সারদামঙ্গল থেকেই যে প্রথম কাব্যরচনার প্রেরণা পেয়েছিলেন, তা স্বয়ং স্বীকার করেছেন এবং কবি অক্ষয়-কুমার বড়ালও তাঁকে গুরু সম্বোধনে সম্মানিত করেছেন। আধুনিক কালে কবি মোহিতলাল মজুমদার বিহারীলালের কাব্য নিয়ে তাঁ'র 'আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্য' নামক পুস্তকে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তিনি সত্যই বলেছেন—

"আধুনিক বাংলা কাব্যের উৎস সন্ধান করিলে আমরা মাইকেল মধুসূদন দত্তের যে স্থান নির্দ্দেশ করি বিহারীলালের স্থান তাহা হইতে দূরে নহে। বরং উত্তরকালে বিহারীলাল প্রবর্ত্তিত কাব্যসাধনাই সমধিক ফলবতী হইয়াছে; বিহারীলালের কাব্য প্রেরণা আরও সচল ও স্বতঃ স্ফূর্ত্ত, বাঙ্গালীর জাতিগত ভাবনার অনুকূল। তাই আধুনিক বাংলা কাব্যের ইতিহাসে বিহারীলালও এক হিসাবে যুগ প্রবর্ত্তক কবি।"

বিহারীলালের 'সারদামঙ্গল' কাব্য থেকে কিছু উদ্ধৃত ক'রে আদর্শ ও বাস্তবের সমন্বয় সাধনে তিনি কতদূর সফল হয়েছেন তা দেখাতে চেষ্টা করছি—

"সেই আমি, সেই তুমি,
সেই এ স্বরগ ভূমি,
সেই সব কল্পতরু, সেই কুঞ্জবন;
সেই প্রেম সেই স্নেহ,
সেই প্রাণ সেই দেহ;
কেন মন্দাকিনী-তীরে দুপারে দুজন!

* * *

কেন গো পরের করে
সুখের নির্ভর ক'রে
আপনা আপনি সুখী নহে কেন নর!
সদাশিব সদানন্দ,
সতী বিনে নিরানন্দ,
শ্মশানে ভ্রমেন ভোলা ক্ষেপা দিগম্বর।

* * *

বাসনা বিচিত্র ব্যোমে
খেলা করি রবি সোমে
পরিয়ে নক্ষত্র তারা হীরকের হার,
প্রগাঢ় তিমিররাশি
ভুবন ভরেছে আসি
অন্তরে জ্বলিছে আলো, নয়নে আঁধার।

বিচিত্র এ মত্ত দশা
ভাবভরে যোগে বসা
হৃদয়ে উদার জ্যোতি কি বিচিত্র জ্বলে!
কি বিচিত্র সুরতান
ভরপূর করে প্রাণ,
কে তুমি গাহিছ গান আকাশ মণ্ডলে!

* * *

তবে কি সকলি ভুল,
নাই কি প্রেমের মূল,
বিচিত্র গগন-ফুল কল্পনা-লতার?
মন কেন রসে ভাসে,
প্রাণ কেন ভালবাসে
আদরে পরিতে গলে সেই ফুল হার?

* * *

এ ভুল প্রাণের ভুল,
মর্ম্মে বিজড়িত মূল,
জীবনের সঞ্জীবনী অমৃত বল্লরী;
এ এক নেশার ভুল
অন্তরাত্মা নিদ্রাকুল
স্বপনে বিচিত্ররূপা দেবী যোগেশ্বরী।

বাইরের প্রকৃতির বর্ণনা এ নয়, মহাকাব্যের ঘনঘটাও এতে নেই; তথাপি মনে হয়, কবির অন্তর্লোকে এই কয়টি পংক্তি আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে পাঠকেরও যেন প্রবেশাধিকার ঘটল। বাংলা কাব্য-সাহিত্যে এত দিন যে উপমা ও ব্যঞ্জনার আড়ম্বর চলে আসছিল, তা থেকে মুক্তিলাভ করে বঙ্গ-সরস্বতী যেন সহজ সাধারণ মূর্ত্তিতে আমাদের মাঝে এসে দাঁড়ালেন। রবীন্দ্রনাথের সম্ভাবনা সম্ভব হল।

——:০:——

বাঙালী ছেলের প্রার্থনা

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

রামমোহনের মত পারি যেন হ'তে
গুণী জ্ঞানী মহাপ্রাণ ; বিচ্ছিন্ন ভারতে
গড়িবারে পারি যেন অখণ্ড স্বাধীন
এক মহাজাতিরূপে ক্ষয় ভয় হীন।
রামকৃষ্ণ সম হই পবিত্র তাপস
জীবসেবা ধর্ম্মে হোক বিশ্বাস, সাহস ;
বিবেকানন্দের মত জ্ঞান কর্ম্মবীর
সকল সঙ্কটে দুঃখে পরীক্ষায় স্থির।
বঙ্কিমের মত হই বিশাল ধীমান্
মাতৃভাষা সেবা করি' লভি গো সম্মান,
শ্রীমধুসূদন সম মধুর আকর
বিদ্যাসাগরের মত দয়ার সাগর।
হরিনাথ সম হই বহুভাষাজ্ঞানী
রাজেন্দ্রনাথের মত ব্যবসায়ে মানী,
গুরুদাস সম ন্যায় বিশ্বাসী ধার্ম্মিক
ব্রজেন্দ্রনাথের মত শ্রেষ্ঠ দার্শনিক।
সুরেন্দ্রনাথের মত হই বাগ্মী নেতা
অরবিন্দ সম শুদ্ধ পূত দৃঢ় চেতা
চিত্তরঞ্জনের মত স্বদেশ-সেবক
রাসবিহারীর মত জ্বলন্ত পাবক।
আশুতোষ সম হই নৃ-সিংহ মহান্
জগদীশ সম বিশ্বে দিই নব-জ্ঞান
প্রফুল্লচন্দ্রের মত চরিত্রে বিদ্যায়
রবীন্দ্রনাথের মত কবি-প্রতিভায়।

তেরস্পর্শ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

এক গরীব চাষা।

সেবারে তেমন বৃষ্টি হয়নি ব'লে অজন্মা। ফসলের অভাব। কি করে সংসার চলে? অথচ সংসারে খেতে পরতে অনেক লোক! দায়ে পড়ে চাষা ঠিক করলে একটা ছাগল আর একটা গরু এ-দুটো বেচে সেই পয়সায় পাশের গাঁয়ের গঞ্জ থেকে চাল ডাল কিনে আনবে।

গ্রীষ্মকাল। রোদে যেন খই ফুটছে, চাষা মাথায় বেশ করে' পক্কড় জড়িয়ে দোলাই দিয়ে গা ঢেকে গোরু আর ছাগল নিয়ে পথে বেরুলো। রোদের তেজে পথ যেন তপ্ত খোলা! পা পুড়ে' পায়ে ফোস্‌কা হবার জো! চাষা করলে কি, গোরুর ল্যাজের সঙ্গে ছাগলের গলার দড়ি দিল বেঁধে; বেঁধে গোরুর পিঠে নিজে চেপে বসলো—বসে হেট-হেট' করে গোরু চালিয়ে ভিন্ গাঁয়ের গঞ্জে চললো।

ছাগলের গলায় দিলো ঘণ্টা বেঁধে···ঘণ্টার শব্দে বুঝবে, ছাগল ঠিক সঙ্গে সঙ্গে আস্‌ছে, দড়ি ছিঁড়ে পালায়নি।

চলে-চলে চাষা নিজের গাঁ ছেড়ে, ছোট জঙ্গল পার হয়ে এক দিগন্তর মাঠে এলো। মাঠে গাছপালা নেই, রোদে মাঠের মাটী ফেটে যে মূর্ত্তি হয়েছে, মাঠ যেন জলের পিপাসায় হাঁ করে আকাশের পানে তাকিয়ে আছে।

এই মাঠের একদিকে শুক্‌নো একটা পুকুরের পাড়ে বসেছিল তিনজন লোক। তারা খুব ধূর্ত্ত ফন্দীবাজ। চুরি-জুয়াচুরি করে তাদের দিন চলে। এখন অজন্মার দিনে তাদের ব্যবসা হয়েছে মন্দা···তারা বসে মতলব ভাঁজ-ছিল, কি করবে? পশ্চিমে যাবে? না, কলিকাতা সহরের দিকে?

ধূর্ত্তেরা দেখলো চাষা চলেছে গোরুর পিঠে চড়ে—গোরুর ল্যাজে দড়ি দিয়ে ছাগল বাঁধা।

এক-নম্বর ধূর্ত্ত বললে—ওঃ, যেন কৈলাস পর্ব্বত থেকে মহাদেব নেমে এসেছেন! চলেছে দ্যাখো!

দু-নম্বর ধূর্ত্ত বললে—তুই ভারী মুক্খু। মহাদেব গোরুর পিঠে চড়েন না··· তিনি চড়েন ষাঁড়ের পিঠে!

তিন-নম্বর ধূর্ত্ত বললে—আর মহাদেবের ষাঁড়ের ল্যাজে ছাগল বাঁধা থাকে না!

এক-নম্বর বললে—তোমাদের শাস্ত্র আলোচনা রাখো! আমার মাথায় খাশা মতলব এসেছে।

দু-নম্বর বললে—কি মতলব?

এক নম্বর বললে—বেশ নধর ছাগলটি। নিঃশব্দে আমি ঐ ছাগলটি ভোগা দেবো! ও ছাগল সহরে নিয়ে গিয়ে বেচলে কম্‌সে-কম্ পনেরো-ষোল টাকা মিলবে।

দু-নম্বর ধূর্ত্ত এ কথায় যেন হেসে উঠল! সে বললে, বেশ! তুই নিবি ছাগল আর আমি নেবো ওর ঐ গোরু! নিঃশব্দে ও গোরু হাতাবো।

তিন-নম্বর বললে—আমি?

এক-নম্বর বললে—তুই! তুই নি'গে যা ওর ঐ মাথার পাগড়ী আর গায়ের দোলাই! দেখি তোর বুদ্ধি কত!

তিন-নম্বর বললে—দেখিস্! আমি চুরি করে পাগড়ি দোলাই নেবো না··· বুদ্ধি করে নেবো! হুঁ—

এই মতলব করে' তিনজনে নিঃশব্দে চাষার পাছু নিলে। খানিক দূর এসে এক নম্বর চোর করলে কি, ছুরি দিয়ে চলন্ত ছাগলের গলা থেকে দড়ি সমেত ঘণ্টাটি নিলে কেটে; কেটে সে ঘণ্টা সে বেঁধে দিল গরুর ল্যাজে। তার পরে ছাগলের দড়ি ধরে নিঃশব্দে তাকে তাড়িয়ে উল্টো পথে দিল চম্পট!

গোরুর ল্যাজে ঘণ্টা বাঁধা চাষার দৃষ্টি সামনের পথে, কাজেই সে বুঝতে পারলো না যে ছাগলটি আগল-খোলা হয়ে গেছে!

চাষা চলেছে চলেছে

হটাৎ একটা বাঁকের মুখে চাষার চোখ পড়লো পিছন পানে, চেয়ে সে দেখে, ছাগল নেই। গোরুর পিঠ থেকে নেমে চারিদিকে সে তাকালো; ধূ-ধূ মাঠে ছাগলের চিহ্নও দেখতে পেলে না!

দু-নম্বর ধূর্ত্ত আসছিল পিছনে যেন নিরীহ পথিক। সে চাষাকে বললে—কি দেখছেন মশায়?

চাষা বললে—আমার ছাগল! গোরুর লেজের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিলো, দড়ি ছিঁড়ে পালিয়েছে।

দু'নম্বর ধূর্ত্ত বললে—দড়ি ছিঁড়ে পালায়নি। এই পথে আসতে খানিক আগে দেখেছি, একটা লোক যাচ্ছে এক ছাগলের দড়ি ধরে। আচ্ছা, আপনার ছাগলটা কি রাম-ছাগল ছিল?

চাষা বললে—হ্যাঁ।

দু-নম্বর বললে—তার এই এমনি এমনি দুটো শিং?

চাষা বললে—হ্যাঁ…হ্যাঁ……

দু-নম্বর বললে—আর এই এতখানি লম্বা সাদা দাড়ি ঠিক সেই বিশ্বামিত্র মুনির মতো?

চাষা বললে—হ্যাঁ…হ্যাঁ…হ্যাঁ…

দু'নম্বর বললে—ইস্, আমায় যদি আগে বলতেন, তাহলে আমি ঠিক ধরতুম।

চাষা বললে—আগে তো জানতে পারিনি যে বলবো তোমাকে।

দু'নম্বর বললে—তাই তো বটে!

চাষা বললে—এ খবর যখন দিলে তখন একটা উপকার করবে ভাই?

দু'নম্বর বললে—কেন করবো না উপকার? নিশ্চয় করবো! মানুষ হয়ে মানুষের উপকার না করবো তাহলে মানুষ হয়ে জন্মানোই যে মিথ্যা হবে দাদা! কি উপকার করতে হবে ব'লো।

চাষা বললে—বেশী নয়, তুমি এই গোরুর দড়িটা ধরে যদি একটু দাঁড়াও আমি তাহলে ছুট্টে গিয়ে চোরের হাত থেকে আমার ছাগল উদ্ধার করে' আনি।

দু'নম্বর ধূর্ত্ত বললে—এ উপকার কেন করবো না? নিশ্চয় করবো। তুমি তাহলে একটুও দেরী করো না। গোরুর দড়ি আমার হাতে দিয়ে সোজা ঐ বাঁশ বনের দিকে চলে যাও…অনেক দূরে ঐ যে বাঁশবন দেখা যাচ্ছে ঐ হোথাকে। (গরু ও গরুর দড়ি দু'নম্বরের হাতে দিয়ে চাষা ছুটলো দূরে ঐ বাঁশ বনের দিকে!)

তারপর কি হলো, বুঝতেই পারছ!

এক ঘণ্টা পরে গলদঘর্ম্ম চাষা ফিরে এসে দেখে, কোথায় তার সে গোরু আর কোথায় বা সেই উপকারী পথিক বন্ধু! দুজনের চিহ্নও দেখা গেল না—কোনো দিকে না।

মনের দুঃখে বেচারী খানিকক্ষণ বসে কাঁদলো, তারপর ভাবলো, শুধু হাতে এমন বেকুব হয়ে কোন্ মুখে বাড়ী ফিরবে। না, তার চেয়ে…

চাষা আর বাড়ীর দিকে ফিরলো না… সোজা চললো সেই তিন-গাঁয়ের দিকে। ভাবলো, যদি আর কা'কেও ঠকিয়ে তার এ বোকামির শোধ দিতে পারে তাহলেই আবার বাড়ী ফিরবে! না হলে…

চাষা চলেছে আবার চলেছে—

চলে চলে এলো একটা পোড়ো কূয়ার সামনে। চারিদিকে লতা-পাতার ঝোপ। আর সেই ঝোপের পাশে একটা লোক হাউ হাউ করে কাঁদছে!

তাকে কাঁদতে দেখে চাষা বললে—কাঁদছো কেন গো? তোমার কি ছাগল গোরু চুরি গেছে আমার মতো?

সে বললে—না গো না। আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে! তুচ্ছ ছাগল গোরু নয়, দু'হাজার টাকা দামের গহনা ভরা বাক্স! আমার বৌয়ের গহনা!

চাষার দু'চোখ যেন কপালে উঠলো!

চাষা বললে—কি করে গেল?

সে লোকটি বললে—চলে চলে বড্ড তেষ্টা পেয়েছিল,—ঐ কূয়ো দেখে তাতে জল আছে কি না যেমন হেঁট হয়ে দেখছি অমনি গলার চাদরে বাঁধা গহনার বাক্স ঠিক্‌রে গিয়ে পড়লো ঐ কূয়োর মধ্যে! দেখবে এসো, বাক্স দেখা যাচ্ছে; ডোবেনি, কাঠের বাক্স কিনা।

এ কথা শুনে চাষা হেঁট হয়ে কূয়োর মধ্যে উঁকি দিলে…কিন্তু কিছু দেখতে পেলো না। বহু কালের পোড়ো কূয়ো…নীচে কোন্ অতল তলে কালিঝুলোর মতো জল—তার উপর মাকড়শার সাতপুরু জাল—এদিকে আবার মাথার উপর সন্ধ্যার আকাশে অন্ধকার জমে উঠছে।

চাষা বললে—উপায় এখন?

সে লোক বললে—কেউ যদি ঐ কূয়োর মধ্যে নামে তাহলে আমার গহনা-উদ্ধার হয়। দু হাজার টাকা দামের গহনা, বৌয়ের গহনা; সোনার হার বালা তাগা চুড়ি সদ্য তৈরী করিয়ে স্যাকরার বাড়ী থেকে আনছিলুম।

চাষা বললে—তা'হলে কূয়োর মধ্যে নামছো না কেন?

সে লোক বললে—কুয়োর মধ্যে জন্মে কি নেমেছি কখনো যে আজ এখন নামবো! পুকুরে নেমেছি, গঙ্গায় নেমেছি, খালে নেমেছি, বাগানে খানায় নেমেছি কিন্তু কুয়োয় কখনো নামিনি যে।

চাষা বললে—তাহলে?

সে লোক বললে—কেউ যদি নামে, নেমে আমার গহনার বাক্স তুলে এনে ছায়, তাহলে ও গহনার অর্দ্ধেকগুলি আমি তাকে এইখানেই দেবো। আমি প্রতিজ্ঞা করছি।

কথা শুনে চাষা চম্‌কে উঠলো। প্রতিজ্ঞা! আরে ব্যস্, অর্দ্ধেক গহনা যার নাম এক হাজার টাকা! ওঃ! এক হাজার টাকায় অমন দু'তিনশো গরু ছাগল কেনা যায় যে!

চাষা বললে—সত্যি?

সে লোক বললে—সত্যি, সত্যি সত্যি, তিন-সত্যি করছি ভাই—

চাষা বললে—আচ্ছা আমি আনছি তোমার গহনার বাক্স উদ্ধার করে।

এই কথা বলে চাষা মাথার পাগড়ী খুললো। পাগড়ী তো নয়, দশ হাত লম্বা ধুতি। তারপর গা থেকে খুললো গায়ের দোলাই, খুলে পাগড়ী ধুতি আর গায়ের দোলাই কুয়োর ধারে রেখে ভাঙ্গা ইট বেয়ে চাষা নামলো কুয়োর মধ্যে।

ঘণ্টাখানেক পরে কাদা মেখে পাঁক মেখে গায়ে মাকড়শার জাল মেখে চাষা যখন হয়রান হয়ে উপরে এলো, তখন আকাশে চাঁদ উঠেছে।

চাষা বললে—মিছে পণ্ডশ্রম হলো মশায়—গহনার বাক্স কোথনে!

কিন্তু কোথায় সে মশায়? কুয়োর ত্রিসীমানায় কেউ নেই! তার সে দোলাই আর পাগড়ী ধুতিখানি শুদ্ধ উড়ে গেছে!

চোখে অন্ধকার দেখে চাষা সেইখানে ঠক্ করে' বসে পড়লো। ভাবলো এ যাত্রায় তেরস্পর্শ যোগ ছিল না কি?

ঝোপেঝাড়ে তখন ঝিঁঝির সভা বসেছে…

হ্যাঁ, একটা কথা বোধ হয় বলতে হবে না, কুয়োর ধারের ঐ লোকটা আমাদের আগে-থেকে-চেনা সেই তিন নম্বরের ধূর্ত্ত!

'ন্যাস্‌টি' !

[একদৃশ্যে সম্পূর্ণ]

শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্য

[হিরণ্ময়ের বাড়ীর বাইরের ঘর। বড় রাস্তার উপরেই। হিরণ্ময় ও তাহার চারটি সহপাঠি বন্ধু বসিয়া গল্প করিতেছেন। শ্রাবণ মাসের রাত্রি। ঝুপ ঝুপ করিয়া বৃষ্টি হইতেছে। ক্বচিৎ দু একখানা সিডান-বডির গাড়ী সাঁ। করিয়া ভিজিতে ভিজিতে চলিয়া যাইতেছে···মাঝে এক-একখানা রিক্সার ঘণ্টার ভিজে আওয়াজ। হিরণ্ময় বড় লোকের ছেলে এবং নরেশ, নির্ম্মল এবং সোমেনও বড় লোকের ছেলে। ইহারা সকলেই রূপার চামচ মুখে লইয়া জন্মিয়াছে। গাড়ী করিয়া বেড়ায়—কলেজের কেরাণীদের বখ্‌শিষ দেয়—সিনেমা দেখে এবং চৌরঙ্গী অঞ্চলের রেস্তোঁরায় খায়। কেবল অতীন পল্লীগ্রামের ছেলে, সে ইহাদের বন্ধু হইবার যোগ্য নয়, তবে সে পড়াশুনায় আশ্চর্য্য রকমের ভাল ছেলে বলিয়া ইহারা দয়া করিয়া তাহাকে বন্ধু করিয়া লইয়াছে। রাত্রি নয়টা। মুড়ি, শসা, বাদামভাজা ও পাঁপরভাজা সহযোগে চা পান করিতে করিতে নানাপ্রকার বিষয় লইয়া ইহাদের অলস আলোচনা চলিতেছিল]

হিরণ্ময়। বিষ্টিটা মজালে তো !

নরেশ। আমার কিন্তু খুব মন্দ লাগছে না

সোমেন। তার কারণ তোমার বাড়ীটা ঠিক পাশের কিনা !

নরেশ। কেন, তুমি ঘুঘুডাঙ্গায় থাকো ?

সোমেন। ঘুঘুডাঙ্গায় না থাকলেও মুর্গিহাটার কাছাকাছি থাকি, এবং সে স্থানটি এখান থেকে নিতান্ত কাছে নয়।

নির্ম্মল। আজ উচিত ছিল কী জানতো ?

হিরণ্ময়। কী ?

নির্ম্মল। এলিট্‌, মেট্রোয় বা লাইট হাউসে বসে ছবি দেখা।

অতীন। কেন ভাই, ঘরে বসে বিষ্টি দেখাও ত ছবিই দেখা !

সোমেন। এই দেখ ! কবি কথা কয়েছে ! কী বলছো ?

অতীন। বলছি, এখানে বসে এই যে আমরা চা খাচ্ছি আর গল্প করছি।

পাশের জানলাটা খোলা, সেটা দিয়ে দেখতে পাচ্ছি—নির্জ্জন রাস্তায় বৃষ্টি ঝরছে। লোক নেই, জন নেই—চুপচাপ থমথমে atmosphere। এও তো আমার ছবি দেখছি বলেই মনে হয়।

নির্ম্মল। ছবি দেখনা বলেই এই সব 'ন্যাস্‌টি' কাণ্ডগুলোকে তুমি ছবি বলে চালাচ্ছ। কোলকাতা সহরের বিষ্টিতে কোন picture নেই—থাকতে পারে না। সত্যি সত্যি বর্ষায় ছবি তৈরী হয় পল্লীগ্রামে। হ্যাঁ, সেখানকার কোন এক দোতলার জানলা দিয়ে মাঠের দিকে চেয়ে দেখো, দেখবে ছবি কা'কে বলে। কোলকাতার ৪৮৬ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের বাড়ীর সামনের রাস্তাটুকুতে বাঙলার কোন ছবি হয় না। বুঝেছ?

অতীন। তুমি যখন বোঝাতে চাইছো তখন বুঝেছি। কিন্তু তোমার কল্পনায়-গড়া পল্লীগ্রামের এই দোতলা বাড়ীটি আমার ভাল লাগলো। কেন না ওটি কোথাও নেই।

নির্ম্মল। আছে। রাজসাহীতে আমাদের জমিদারীতে, নিবিড় পল্লীগ্রামেও ও রকম দুশো পাঁচশো দোতলা তোমায় আমি দেখাতে পারি।

অতীন। ও! তোমার জমিদারীর পল্লীগ্রামে! Then I am sorry.

সোমেন। কিন্তু এদিকে যে সর্ব্বনাশ হ'ল! খাবার ফুরিয়ে গেল!

নরেশ। তোমার ওই মুড়ি কিন্তু ভাই আর না। বুঝলে হিরণ্ময়!

নির্ম্মল। মুড়ি is a nasty thing. কেবল মাত্র দাঁতের ব্যায়াম ছাড়া ওতে আর কোন কাজ হয় না।

হিরণ্ময়! তাই হবে। ওরে ভোলা!

[চাকর ভোলার প্রবেশ]

হিরণ্ময়। ছাতাটা নিয়ে যা দিকিনি দৌড়ে, মোড়ের ওই পাঞ্জাবীর দোকান থেকে বারো খানা ফাউল কাট্‌লেট কিনে আন্‌তো!

ভোলা। যাচ্ছি দাদাবাবু! আর মা বল্লেন—

হিরণ্ময়। কী বললেন?

ভোলা। মা বললেন আপনারা কেউ চলে যাবেন না, খেয়ে-দেয়ে যাবেন।

(প্রস্থান)

নরেশ। Good Luck সোমেন!

সোমেন। বুঝতে পারছি।

নির্ম্মল। আজকের প্রধান খাদ্যটা কি হিরণ্ময় ?

হিরণ্ময়। পোলাও বোধ হয়।

নির্ম্মল। সেও তো বাপু খেতে খেতে অরুচি ধরে গেল। ন্যাস্‌টি! নতুন কিছু করা গেল না ?

অতীন। সব চাইতে ভাল হচ্ছে ভাত !

নির্ম্মল। For God's sake চুপ করো ! তোমার ওই গেঁয়ো suggestion শুনলে আমার গা ঘিন্ ঘিন্ করে। ন্যাস্‌টি !

নরেশ। যাই হোক। পোলাওটাও কোন রকমে গেলা যেতে পারে, কি বল নির্ম্মল ?

নির্ম্মল। কোন রকমে।

[নেপথ্যে একটি মিষ্টি কিশোর কণ্ঠ শোনা গেল "বাবু !"]

হিরণ্ময়। কে ? ভেতরে এস !

[যে প্রবেশ করিল সে একটি ভিখারী ছাড়া কিছুই নয়। বয়স বছর দশেক হইবে। মুখখানি কচি, গায়ে একটি ছেঁড়া শার্ট ও পরণে ছোট্ট একখানি জীর্ণ কাপড়। সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া জল ঝরিতেছে। তাহাকে দেখিয়া নির্ম্মল ভ্রূকুটি করিল]

হিরণ্ময়। কী চাও ?

কিশোর। চারটে পয়সা।

নির্ম্মল। ন্যাস্‌টি ! ছোঁড়াটার সাহস দেখ ! একটা নয়—চারটে পয়সা চায়।

সোমেন। সত্যিই তো, তুমি চারটে পয়সাই বা কেন চাইছো ?

কিশোর। নইলে এই বিষ্টিতে মা'কে নিয়ে আর কত ঘুরবো।

নরেশ। মা কোথায় ?

কিশোর। ওই ফুটপাথে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি ছোট বলে মা আমাকে একলা ছেড়ে দেন না !

সোমেন। কী তোমার নাম ?

কিশোর। আমার নাম শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় !

নির্ম্মল। ন্যাস্‌টি ! ভিখিরীর নাম অমিয় ! যাও—যাও—ভিক্ষে-টিক্ষে হবে না।

কিশোর। ভিক্ষে তো চাইনি—চারটে পয়সা চেয়েছি।

সোমেন। তোমরা বামুন?

কিশোর। হ্যাঁ।

হিরণ্ময়। তোমার বাবা কী করে?

কিশোর। বাবা আজ দেড় বছর ধরে বাতে বিছানায় পড়ে আছেন, আপনারা পয়সা না দিলে আমাদের চলবে কী করে?

নির্ম্মল। ন্যাস্‌টি! ছোঁড়াটার ক্যাঁট্‌ ক্যাঁট্‌ কথা শোন! কেন? আমরা তোমায় পয়সা দেবো কেন?

কিশোর। আপনাদের আছে বলে। আপনাদের এত পয়সা থাকতে আমরা না খেঁয়ে মরবো কেন? আজ সারা দিন ঘুরে ছ'টা পয়সা পেয়েছি তাতে রাত্রের খাওয়া চলবে। কিন্তু কাল সকালে চা খেয়ে তবে তো পয়সা চাইতে বেরুবো? তাই চারটে পয়সা চেয়েছি!

নির্ম্মল। ন্যাস্‌টি! শূয়োরের বাচ্চার কথা শোন! চা খাবেন! Rotten!

কিশোর। গালাগালি দেবেন না। আমিও তো ভদ্রলোকের ছেলে। আমি তো আপনার কোন ক্ষতি করিনি!

অতীন। ওহে শোন! (কিশোর আগাইয়া আসিল)। এই সিকিটা নাও; তোমার মা ফুটপাথে দাঁড়িয়ে জলে ভিজছেন, তাড়াতাড়ি যাও।

কিশোর। এর ভাঙানি তো আমার কাছে নেই!

অতীন। ওর সবটাই তোমার।

কিশোর। সবটাই?

[তাহার মুখ আনন্দে উজ্জল হইয়া উঠিল। সে মুহূর্ত্ত মধ্যে ঘর হইতে বাহির হইয়া চীৎকার করিতে করিতে ছুটিল, "মাগো! একটা সিকি পেয়েছি মা!" পরক্ষণেই 'গেল-গেল' একটা শব্দ উঠিল এবং একখানি নূতন 'হিলম্যান' গাড়ী ছুটিয়া চলিয়া গেল। গোলমাল শুনিয়া বন্ধুর দল বাহিরে আসিয়া দেখিল গাড়ীখানি ছেলেটার মাথার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। ছোট মাথাটা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহার ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীতে চাপিয়া-ধরা সিকিটি ঠিক আছে]

নির্ম্মল। স্মাস্টি। ব্যাটাচ্ছেলে সিকিটা কিন্তু ছাড়েনি!

হিরণ্ময়। গাড়ীখানা 'হিল্‌ম্যান্‌' না?

সোমেন। হ্যাঁ, টায়ারটাই রক্ত লেগে নষ্ট হ'ল শুধু!

অতীন। ভয় নেই, ও রক্তের দাগ স্থায়ী হবে না, বৃষ্টির জলেই ধুয়ে যাবে।

[জানলা দিয়া ভোলা চাকর ডাকিল—দাদাবাবু, কাট্‌লেট এনেছি]

নির্ম্মল। ঠিক হয়েছে। যে চ্যাটাং চ্যাটাং কথা ছোঁড়াটার—স্মাস্টি! চল! কাট্‌লেটগুলো ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

[ফিরিয়া যাইতে যাইতে তাহারা দেখিল তাহাদের মধ্যে অতীন নাই। সে কখন নিঃশব্দে সরিয়া পড়িয়াছে]

গোরিলা বাহিনীর জননী

কাজি আফসারউদদিন্‌ আহমদ

তোমরা নিশ্চয়ই খবরের কাগজে গোরিলা যুদ্ধের নাম শুনেচো। জাপানের বিরুদ্ধে চীনেরা অনেকদিন থেকে যে-যুদ্ধ চালাচ্চে তাকে বলা হচ্চে গোরিলা যুদ্ধ।

চীনে এই যুদ্ধের উৎপত্তি আর এক মহিয়সী নির্ভীক মহিলার পরিচয় আজকে তোমাদের দেবো।

কিছুদিন পূর্বে শ্রীমতী চাও-উ-টাঙ সাময়িকভাবে প্রতিষ্ঠিত চীনেদের রাজধানী হ্যাংকোতে এসেছিলেন। এঁর বয়েস ষাট-বাষট্টির কম নয়।

সমস্ত চীন সাম্রাজ্যে শ্রীমতী চাও-উ-টাঙকে গোরিলা-বাহিনীর জননী বলা হয়। চীনে জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধ করবার জন্যে যে-সব বড়ো বড়ো সেনা-বাহিনী লড়াই করচে—সময়মতো যাতে তারা প্রচুর রসদ পেতে পারে সে-দিকে চাও-উ-টাঙ তাঁর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখতে ভোলেন নি।

বয়েস হলেও চাও-উ-টাঙ দেখতে চমৎকার সুস্থ, সবল—চলনে স্ফূর্তির আমেজ পাওয়া যায়। এঁর জন্মস্থান মাঞ্চুরিয়াতে।

প্রথম জীবনের বিয়াল্লিশটা বছর ধরে উ-টাঙ স্বদেশে জ্বালাময় স্বাধীনতার প্রেমের বাণী প্রচার করেচেন। জাপানীদের বিরুদ্ধে অবিশ্রান্ত সংগ্রামে এঁর একফোঁটাও ক্লান্তি কখনো দেখা যায় নি।

উ-টাঙের পুত্রও একজন স্বনামধন্য পুরুষ। চীনের ক্ষিপ্রগতি বাহিনীর রণনিপুণ ও সাহসী অধ্যক্ষ হচ্চে চাও-টুঙ্, উ-টাঙের পুত্র।

বাল্যে ও যৌবনের প্রথম দিকটায় চাও-টুঙ্ মুকডেন উত্তর-পূর্ব বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিখেচেন।

সর্বপ্রথম প্রায় ত্রিশ হাজার কৃষকদের হাত থেকে লাঙল ফেলে দিয়ে তলোয়ার সম্বল করে তাদের যুদ্ধক্ষেত্রে তেজোহপ্ত গোরিলা-বাহিনীতে পরিণত করার মধ্যে যে-অসাধারণ কৃতিত্ব আর বীর্যের প্রয়োজন পড়েছিলো তার প্রায় সবটুকুই অনায়াসে পাওয়া গেছে বুদ্ধিমতী উ-টাঙের সহায়তায়।

জাপানীদের মাঞ্চুরিয়া দখলের পর (১৯৩২) এই মহিয়সী মহিলা জাপানের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে সংগ্রামে লিপ্ত হন।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের চীন-জাপান যুদ্ধের সংস্পর্শে যখন উ-টাঙকে আসতে হয়েছিলো, তখন এঁর বয়েস ছিলো মাত্র চোদ্দ বছর।

উ-টাঙের বিয়ের কিছুটা পরেই ১৯০৪।৫ সালের রুষ-জাপানের যুদ্ধের সময়ে আবার জাপানীদের আবির্ভাব হয়েছিলো। জীবনের প্রথম সোপানে বার দুয়েক জাপানীদের ঘনিষ্ট সংস্পর্শে এসে বুদ্ধিমতী উ-টাঙ বুঝতে পেরেছিলেন এবং এ-ধারণাও সম্পূর্ণ বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিলো যে চীনেদের সম্বন্ধে জাপানীদের মতলব মোটেই ভালো নয়।

চার ছেলে তিন মেয়ে নিয়ে উ-টাঙ যখন সংসারে সামান্য জড়িয়ে পড়তে যাচ্চেন এমন সময় আচম্বিতে মুকডেনে তাণ্ডব সুরু হয়ে গেলো। রেডিও মারফতে সংবাদ পাওয়া গেলো ১৮ই সেপ্টেম্বরে জাপানীরা স্বল্পায়াশে বড়ো বড়ো সহরগুলো দখল করে নিয়েচে।

ফেব্রুয়ারী মাসে চাও-টুঙ তার জনকয়েক সহপাঠী নিয়ে পাইপিঙ হয়ে পালিয়ে ফিরে এলো। মায়ের কাছ থেকে সাহায্য এবং অমোঘ সাহচর্য পেয়ে এরা সকলেই জাপানীদের বিরুদ্ধে লড়তে নামবে বলে একদল স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী সংগ্রহের কাজে আত্মনিয়োগ করলো।

নিজের জমানো সামান্য অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে উ-টাঙ পুত্র চাও-টুঙকে বললেন :— আমার সম্বল তোমার হাতে তুলে দিচ্চি। সর্ত রইলো শুধু একটা, জাপানীরা চীনের মাটি পরিত্যাগ করে না যাওয়া পর্য্যন্ত তোমরা কিছুতেই সংগ্রামের শেষ হতে দেবে না।

সাতখানা বন্দুক যোগাড় করা হলো অনেক কষ্টে। তারপর সাতবন্ধুতে অস্ত্র হাতে শত্রুদের বিরুদ্ধে আচম্বিতে আবিভূত হয়ে আকস্মিক আক্রমণে তাদের বিধ্বস্ত করতে স্থরু করলো।

উঁচু এবং জংগলাকীর্ণ পাহাড়ের ওপর এদের আস্তানা হলো। বিদ্যুৎবেগে এরা নেমে আসতে লাগলো আর অ ক্রমণ চালাতে লাগলো ছোটো ছোটো জাপানী সেনাদলের ওপর।

যখনই কোনো ছোটো সেনাবাহিনী রসদপূর্ণ সাজোয়া গাড়ি নিয়ে সে-পথ দিয়ে যেতে আরম্ভ করতো তখনই এই সাতবন্ধু মাত্র সাতটি বন্দুকের সাহায্যে অমিত বিক্রমে আক্রমণ চালাতে থাকতো। অল্পদিনের মধ্যেই চারপাশের কৃষকদের কাছে এরা বীর বলে গণ্য হলো।

একমাসের মধ্যেই হাজারেরও বেশি লোক চাও-টুঙের দল পুষ্ট করে ফেললো। উ-টাঙের বাড়ীটা হলো প্রধান আড্ডা ; রসদের সর্বশ্রেষ্ঠ নিরাপদ ঘাঁটিও এটা হলো। আক্রমণ করতে যেয়ে যারা আহত হয়ে পড়তো, তাদের শুশ্রূষার জন্যে আনা হতো এখানেই।

অবিশ্যি এদিকে ১৯৩৪ সালের মধ্যেই জাপানীদের টনক নড়ে উঠলো। উ-টাঙের কারসাজী আর লুকোনো রইলো না শত্রু-মিত্র কারুর কাছে।

(২)

৫ই ফেব্রুয়ারির দিনটা চাঙ-পরিবারের মন থেকে কোনোকালেও দূর হয়ে যাবার নয়।

জাপানী পুলিশ আর গোয়েন্দাতে সমস্ত বাড়িখানা ভরে গেছে। রাত শেষ হওয়ার আগেই সশস্ত্র জাপানী পুলিশ সমস্ত বাড়িখানা ঘিরে ফেলেছিলো তারপর আরম্ভ হলো খানাতল্লাসী।

কয়েকটি চাকর এবং নিরক্ষর কৃষক গোয়েন্দাদের ঘোরপ্যাঁচ দেয়া প্রশ্নের

জবাব দিতে বিলম্ব করতেই তাদের পিস্তলগুলো সশব্দে গর্জন করে উঠলো। হতভাগ্যেরা তখনই লুটিয়ে পড়লো মাটিতে।

খানাতল্লাসীতে কিছু না পাওয়া যাওয়ায় প্রকাণ্ড বাড়িখানার চারপাশে আগুন লাগিয়ে দেয়া হলো। বৃহৎ চাঙ-পরিবারের প্রায় ত্রিশ জনেরও বেশি লোককে এক সারিতে দাঁড় করিয়ে দেয়া হলো।

কোর্ট মার্শালে তাদের সোজা গুলি করে হত্যা করা সাব্যস্ত হলো।

তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্না বীরাংগণা উ-টাঙ শেষবারের জন্যে কমাণ্ডারের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করলেন কপট ভগ্নকণ্ঠে ও সজল চোখে, বললেন: আপনারাই বলুন না, আমার দিকে চোখ তুলে দেখুন। আপনাদের কি মনে হয়, আপনাদের অতো বড়ো বাহিনীর বিরুদ্ধে আমি স্বেচ্ছা-সেনা বাহিনী গড়ে তুলতে পারি! আমার ক্ষমতা কতটুকু? আমার দিকে চেয়ে দেখুন, আমি বৃদ্ধা। কোনো শ্রমের কাজ করা কি এখন আমার পক্ষে কখনো সম্ভব?

উ-টাঙের এমনতরো সরাসরি কাকুতি এবং প্রশ্নের আঘাতে জাপানী-জজেরা বেশ কিছুটা ইতস্তত করতে সুরু করে দিয়েছিলো।

সুযোগ বুঝে উ-টাঙ একটা অসাধারণ কৌশল করে ফেললেন। চাঙ-পরিবারকে যারা শত্রুর হাতে ধরিয়ে দেবার ফিকির করেছিলো অর্থের মোহে পড়ে, সে-সব বিশ্বাসঘাতক চীনেদের নির্দেশ করে তিনি বললেন: শুনুন, আমার কথায় বিশ্বাস করুন, আমি বুড়ো হয়ে পড়েচি, ভগবান বুদ্ধের নামে বলচি, আমার কথায় বিশ্বাস করুন। এরা সবাই স্পাই। জাপানী সৈন্যের প্রতিটি অঙ্গ-সঞ্চালনের খবর এরাই চীনে-বাহিনীর অধ্যক্ষের কাছে সব-সময়ে পৌঁছে দিচ্চে। হয়তো এতোক্ষণে চীনে-বাহিনীর গোরিলারা আপনাদের ধ্বংস করবার মতলব আঁটচে!

উ-টাঙের কথা শুনে জাপানীগুলো সচকিত হয়ে উঠলো। উ-টাঙ আরো বললেন: চীনে গ্রামে শান্তি স্থাপনই যদি আপনাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হয়, তা-হলে এদের সবক'টার প্রাণদণ্ড দিন, দেখবেন, এক হপ্তার মধ্যেই সব গোলযোগ মিটে যাবে।

কৌশলটা কাজের হলো। বিশ্বাসঘাতকদের কাতর কান্নায় কেউ কর্ণপাত করা মনে করলো না। তলোয়ারের আঘাতে সব কটাকেই হত্যা করা হলো।

চাঙ্-পরিবারকে মুক্তি দেয়া হলো। জাপানী অধ্যক্ষেরা তাদের বলে গেলো, গ্রামে গ্রামে গিয়ে যেন উ-টাঙেরা জাপানী সেনা-বাহিনীর গুণকীর্ত্তন করতে ভুল না করে।

১৯৩৭ সালের মধ্যে গোরিলা-বাহিনী চল্লিশ হাজারে এসে দাঁড়ালো। এদের কাজ হলো, জাপানীদের সুসজ্জিত রক্ষী সেনাবাহিনীর ওপর ঝড়ের মতো আপতিত হয়ে নিজেদের ক্রুদ্ধ দাপটে জাপানীদের ছত্রভংগ করে দিয়ে আবার অতর্কিতে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া।

গোরিলা-বাহিনীর উল্লেখযোগ্য অস্ত্র সংগ্রহ হয়েছিলো "ফার্ষ্ট হোপাই মডেল্ প্রিজন্" থেকে। এই কয়েদখানা ছিলো পাইপিঙের দক্ষিণ-পশ্চিম সহরতলীতে।

একদিন ভোরে শোনা গেলো, সাতশ' কয়েদীকে জাপানীরা নৃশংসভাবে হত্যা করবার দুরভিসন্ধি করচে। সংগে সংগে খবরটা উ-টাঙের কানে এসে পৌঁছুলো।

তিনি তাঁর কর্তব্য স্থির করে ফেললেন। তারপর এক অন্ধকার রাত্রিতে গোরিলা-বাহিনীর শ্রেষ্ঠ সাকরেদদের সংগে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন কয়েদখানার ওপর।

আক্রমণ করার ফলে, দুটো ভারি মেশিনগান, গোটাকতোক বন্দুক আর পিস্তল তাদের হাতে এসে পড়লো। প্রায় সমস্ত কয়েদীরাই জাপানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্যে চাও-টুঙের বাহিনীতে যোগ দিলো। বিপুল উত্তেজনায় ও দলপুষ্টিতে গোরিলা-বাহিনী শেষ পর্য্যন্ত ভয়ংকর হয়ে উঠলো। তোমরা যারা নিয়মিত খবরের কাগজ পড়ে থাকো, তারা নিশ্চয় জানো যে, জাপানীরা এই দুর্দমনীয় গোরিলা-বাহিনীর কাছে খণ্ড যুদ্ধে কেমন করে দিনের পর দিন পরাজিত হয়ে আসচে।

এখন উ-টাঙের সম্বন্ধে আর দুটো কথা বলে আজকের মতো এ কাহিনীর শেষ করবো। বাষট্টি বছর বয়েস হলেও জাপানের বিরুদ্ধে নির্মম সংগ্রাম চালাবার অটল সংকল্পে চাও-টাঙ ইস্পাতের মতোই কঠিন।

"চীনা গোরিলা-বাহিনীর জননী" এ উপাধি শ্রীমতী চাও-উ-টাঙকে আশ্চর্য

মানায়। এঁর প্রথম ও তৃতীয় পুত্র ১৯৩২ সাল থেকেই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে যোগ দিয়ে কায করচে। দ্বিতীয় পুত্র স্বনামধন্য চাও-টুঙ ত্রিশ হাজার চীনে যোদ্ধার অধিনায়ক।

ইতিহাসে এই অতুলনীয়া বীরাংগণা অমর হয়ে থাকবেন তাঁর ত্যাগ, বীর্য ও মহত্ব নিয়ে।

তানসেন

অধ্যক্ষ ডক্টর **শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস**

ভাগীরথী বনতটে, উষাকালে সূর্য্য ওঠে,
কোয়াশার মেলা পাখা, দেয় গগনেরে ঢাকা
মাখা যেন কনকের ধূলি ;
শ্রেণীবদ্ধ বৃদ্ধশাল, পত্রপুষ্পে ঘেরা ডাল,
ছায়াতরু পত্র ভালে, সূক্ষ্ম শাখা অন্তরালে,
ঝকমকে কিরণ অঙ্গুলি।
নাগকেশরের কুঞ্জে, অলি ফেরে পুঞ্জে পুঞ্জে
মৃদু বায়ু সঞ্চরণে, শিরীষের মুঞ্জরণে,
গন্ধ আসে বায়ুর গুঞ্জনে ;
প্রশান্ত উদার মাঠ, সীমন্তে গ্রামের বাট,
তরী চলে ভরা পালে, নদী নীর তালে তালে,
নেচে চলে ঢেউএর শিঞ্জনে।
রবির কিরণ দলে, শষ্পের শিশির জলে,
ইন্দ্রধনু বর্ণ ফাঁদে, ভুবনের রূপ বাঁধে,
অবিজ্ঞাত মন্ত্রের কৌশলে ;
গগনের বর্ণরেখা, আনে অনন্তের লেখা,
কোন্ অবর্ণ হানে পাখা, ঝরে বর্ণময় আঁকা,
আলোকের পুলকের ছলে।

তান্‌সেন মহানন্দে, গান করে নানা ছন্দে,
নানা সুর জাল বন্ধে, পুষ্প যেন নিজ গন্ধে,
মত্ত হয়ে মহাবেশে রহে ;
সে মহা কাকলিগান, ভরে আকাশের কান.
বিহগ স্তিমিত তান, অতিমৃদু স্পন্দমান,
ভাগীরথী ধীরে যায় বহে।
মৃগকুল পালে পালে, শস্য ক্ষেতে আলে আলে,
বিহগেরা ডালে ডালে, পতঙ্গ সুরের জালে,
বদ্ধ হ'য়ে রহে স্পন্দহীন,
সঙ্গীতের কলস্বরে, ভুবন প্লাবন তারে
হরষ ঝরণা ঝরে সে সুধা বরষ করে
তাহে সৃষ্টি রহে স্তব্ধ লীন।
পদচারী আকবর দিল্লীর ঈশ্বর
আলোকের ঝরঝর সমসেই মধুস্বর
শুনিয়া নিস্পন্দ হ'য়ে রহে,
দণ্ড দুই গেলে চলে নয়ন প্লাবিত জলে
গায়কেরে কোন ছলে নেবে কালি সভাস্থলে
নিজ অনুচরে চাহি কহে।
তারপরে পরদিন তানসেন অতিদীন,
গাহে বীণা যন্ত্রলীন সবে রহে বাক্যহীন,
মহাসভা নিস্পন্দ নিশ্চল ;
গানের রাগিণী উঠে, বর্ণময় হয়ে ফুটে—
ভাবের ঝঙ্কার-লুঠে, চেতনার বক্ষ টুটে,
সকলের ঝরে অশ্রুজল।
তবু বাদসাহ কহে, এ সঙ্গীত নহে নহে,
স্বর্গের অন্তরে রহে' গিয়েছিল যাহা বহে,
জলে স্থলে আনন্দের স্রোতে ;
এ শুধু মর্ত্ত্যের ভরা শুধু আনন্দের ঝরা

বেদনা আকুল করা সুখেতে হৃদয় হরা
ছোটে না এ সেই উচ্চপথে।
শিল্পী কহে জুড়ি কর, ত্রিভুবন অধীশ্বর,
হৃদিপদ্মে করি ভর, যেথা তোলে কণ্ঠস্বর
আপনার আনন্দনন্দনে ;
সে কণ্ঠের অর্ঘ্যথালি, তোমারে কেমনে ঢালি,
যাহে ভুবনের মালী, পূর্ণ করে নিজ থালি,
আপনার প্রভাত বন্দনে ?
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল, করি রসে ছল ছল,
যেথা নয়নের জল, বেদনায় টলমল,
নিখিলের অধিপতি করে ;
যে গান আমার নহে, দিবার তা ধন নহে,
চক্ষের বাহিরে রহে, বক্ষেরে নিঙারি বহে,
কেমনে তা দিব তব করে ?
বচন কারো না সরে, সবে রহে মৌন ভরে
বৃক্ষে পত্র নাহি পড়ে, শব্দহীন বদ্ধ ঘরে
পাত্র মিত্র স্তব্ধ সভাস্থল।
সকল হৃদয় হানে, একটি স্রোতের টানে,
কি মহা নিস্তব্ধ গানে, ছুটে চলে ঊর্দ্ধ পানে
সর্ব্ব নেত্রে ঝরে শুধু জল

স্বপ্ন না সত্য

শ্রীমেঘেন্দ্রলাল রায়

আরাম কেদারায় উপবিষ্ট অবসরপ্রাপ্ত বিচারক রামসদয় বাবু তাঁহার বালী-গঞ্জস্থ বাটীর ছাদে জ্যোৎস্না-স্নাত আকাশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য প্রফুল্লমনে উপভোগ করিতেছিলেন। যদিও তিনি জ্যোৎস্না-প্লাবিত নক্ষত্রখচিত নীলা-কাশের অপরূপ মাধুরী প্রফুল্লমনে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন তথাপি তিনি যে জীবনে কখন আঘাত পান নাই একথা বলা কঠিন। কর্ম্মজীবনের উজ্জ্বলময় প্রভাতে একমাত্র শিশুপুত্র সমীরকে লইয়া তিনি দীর্ঘকাল বিপত্নীক ছিলেন। কিন্তু শেষে আত্মীয়, বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীর বিশেষ অনুরোধে-বয়স্থা সুন্দরী বিদুষী কনককে বিবাহ করেন। দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করিয়া অনেকের সংসারে যে অশান্তি লক্ষিত হয় তাহা রামসদয় বাবুর জীবনে আজও দৃশ্যমান নহে।

কনকের পুত্র সন্তান নাই—দুই কন্যা, প্রভা ও ইন্দু। প্রথম পক্ষের পুত্র সমীর বি, এস্-সি পরীক্ষায় রসায়ন বিভাগে অনার্সে প্রথমস্থান অধিকার করিয়া পিতার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে। প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে পাঠ সাঙ্গ করিয়া সমীর আই-সি-এস্ পরীক্ষার নিমিত্ত বিলাতযাত্রা করিবে এইরূপ রামসদয় বাবুর ইচ্ছা।

যদিও ইহা সত্য যে, রামসদয় বাবু কার্য্য হইতে যথাসময়ে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন তথাপি ইহাও সত্য তিনি বৃদ্ধত্বে উপনীত হয়েন নাই। তিনি শীঘ্র যে বৃদ্ধত্বে উপনীত হইবেন সে আশাও কম। তিনি ভোজনবিলাসী লোক—সকালে মহিষের দুগ্ধে চা তৈয়ারী হইয়া থাকে। বৈকালে ছাগ দুগ্ধের সাহায্যে নির্ম্মিত সোনালী রংএর সুগন্ধ চা পান করিয়া থাকেন—কোনদিন ভাত, কোন দিন ঘি-ভাত, কোনদিন লুচী—প্রত্যহ নূতন খাদ্যদ্রব্যের একান্ত প্রয়োজন—এমন কি পুডিং তাহাও নিত্য নূতন—কোন দিন ছানার পুডিং, কোন দিন ডিম পাউরুটীর পুডিং, কোন দিন বা জলন্ত পুডিং আহার করিয়া থাকেন। মাংসের রুচি সম্বন্ধেও তাঁহার বৈশিষ্ট্য ছিল—সাধারণতঃ লোকের ফাউলের মাংসের প্রতি আকর্ষণ দৃষ্ট হয় কিন্তু রামসদয় বাবুর ভাল মাটনের মাংসের প্রতি বিশেষ

দৌর্ব্বল্য লক্ষ্য করা কঠিন নহে। শরীর সুস্থ রাখিবার জন্য মোটর গাড়ী থাকা সত্বেও পদব্রজে প্রচুর ভ্রমণ করেন ও লিভারকে বিশ্রাম দিবার জন্য সপ্তাহে নিয়মিত এক বেলা লঙ্ঘন দিয়া থাকেন। পঞ্চাশোর্দ্ধে এরূপ জীবনযাত্রার প্রণালী এই অকাল-বার্দ্ধক্য-প্লাবিত বঙ্গদেশে যে বিশেষ প্রশংসার্হ ও তাঁহার বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক এরূপ মন্তব্য নিঃসঙ্কোচে প্রকাশ করা যায়।

কিছুকাল হইতে তিনি "বোর্ণভিটা"র বিশেষ ভক্ত হইয়াছেন। সাহিত্য সম্রাট রবীন্দ্রনাথের বোর্ণভিটা সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পাঠ করিবার পর তিনি তাঁহার বহুকালের প্রিয়তম সখা "ওভাল্‌টীন্"কে নির্ম্মমভাবে পরিত্যাগ করিয়াছেন। আজও জ্যোৎস্না-প্লাবিত সন্ধ্যায় প্রফুল্লচিত্তে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে করিতে এক কাপ "বোর্ণভিটার"ই প্রতীক্ষায় আরাম কেদারায় তিনি আসীন।

যখন আরাম কেদারার নিকটে কনক এক কাপ বোর্ণভিটা লইয়া উপস্থিত তখন তিনি সহাস্যে কনককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বসো, এতো তাড়াতাড়ি কেন? কী এমন কাজ তোমার?" কনক উত্তর দিলেন, "কী যে ব'লো তার ঠিক নেই—খোকা ফোন্ করেছে এখনই আস্‌বে।" রামসদয়বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "খোকা আস্‌বে? কলেজের তো এখন ছুটী নেই—শরীর খারাপ হয়নি তো?" কনক সহাস্যে উত্তর দিলেন, "শরীর খারাপ হবে কেন? সে হগ মার্কেট থেকে এখনই ভাল মাটন্ নিয়ে আস্‌ছে—এখানে তো সে রকম ভাল মাটন্ পাওয়া যায় না।" রামসদয়বাবু সোৎসাহে বলিলেন, "ব'লো কী—তবে……।" কনক তাঁহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই প্রস্থান করিয়াছেন।

রামসদয় বাবুর মহা বিপদ উপস্থিত হইল। রাত্রে যখন ভাল মাটনের কোর্ম্মার উপস্থিতি অবশ্যম্ভাবী সেক্ষেত্রে এখন বোর্ণভিটা পান করার ঔচিত্য সম্বন্ধে তিনি সন্দিহান হইয়া পড়িলেন। কিন্তু ভগবানের আশীর্ব্বাদে তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা ইন্দু ঠিক এই সময়ে উপস্থিত হইয়া এই কঠিন সমস্যার সমাধান করিল। ইন্দু বলিল, "বাবা আমায় একটু বোর্ণভিটা দাও না—মা দিল না"। তিনি যেন অকূলে আশ্রয় পাইয়া বলিলেন, "এই নে সবটাই খেয়ে ফেল্—"। ইন্দু পিতার এইরূপ অপ্রত্যাশিত ঔদার্য্যে বিস্মিত হইয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা সবটাই খেয়ো ফেল্‌বো"—রামসদয় বাবু বলিলেন, "নে শিগ্‌গীর খেয়ে

ফেল, মাকে বলিস্‌নে যেন"—। ইন্দু পিতার কথামত কার্য্য সম্পাদন করিয়া বলিল, "বাবা জান—দাদা ফোন্ করেছে মা'কে—সে খুব ভাল মাটন্ আন্‌ছে, সঙ্গে দুটো বড় আনারস্।" রামসদয় বাবু বলিলেন, "বলিস্ কীরে—অ্যাঁ—মাটন্ আনারস্ কিস্‌মিস্ দিয়ে কোর্ম্মা? চারুকে শিগ্‌গীর ব'ল্ গাড়ী বের ক'র্‌তে—যাই লেকে হেঁটে আসি আড়াই মাইল।" ইন্দু বলিল, "বাবা, আমি যাব"—রামসদয় বাবু বলিলেন, "তুই হাঁটতে পারবি তো?" ইন্দু হাসিয়া বলিল, "খুব হাঁটতে পারব বাবা—বেশ ক্ষিদে হবে।" রামসদয় বাবু বলিলেন, "Capital—তোর খুব বুদ্ধি তো, যা শিগ্‌গীর ব'ল্ চারুকে গাড়ী বের ক'র্ত্তে—"। ইন্দু প্রস্থান করিল ও রামসদয় বাবু নীচে আসিয়া সকন্যা গাড়ীতে বাহির হইয়া গেলেন।

রামসদয় বাবু যখন বালীগঞ্জে নূতন বাড়ী নির্ম্মাণ করিলেন কনকের বিশেষ অনুরোধ সত্ত্বেও সমীর বাটী হইতে পাঠাভ্যাস না করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় হোষ্টেলে থাকিয়াই পাঠ সাঙ্গ করিবে এইরূপ মত প্রকাশ করে। রামসদয় বাবুও এ ব্যাপারে সমীরকে সমর্থন করেন।

সমীর আর কনকের মধ্যে বয়সের বিশেষ পার্থক্য ছিল না। সেই কারণেই বোধ হয় কনক সমীরকে এতো স্নেহ করে এবং সমীরও বিমাতাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে ও ভালবাসে। কনকের হয়তো মনে দুঃখ ছিল যে তাঁহার কন্যাদ্বয় প্রভা ও ইন্দু গৌরাঙ্গী নহে অথচ কনক নিজে উজ্জ্বল গৌরাঙ্গী—কন্যাদের গায়ের রং আকৃতি সবই পিতার ন্যায়—অথচ সমীর দেখিতে ঠিক সাহেবের ছেলের মতন সুন্দর স্বাস্থ্যবান যুবক—সমীর হইয়াছে অনেকাংশে তাহার মাতার ন্যায়। রং-এর ঔজ্জ্বল্যের জন্যই হউক বা সমীর মাতৃহারা এই কারণেই হউক সমীরের প্রতি কনকের তীক্ষ্ণদৃষ্টি ছিল যাহাতে সে বাটী আসিলে তাহার কোনরূপ অযত্ন না হয়।—কনক তখনও সমীরের ঘর ঠিকভাবে সাজাইতে ব্যস্ত ছিলেন এই সময়ে সমীরের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। কনক তাহা লক্ষ্য করিয়া ভোজনাগারের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সমীর বলিল, "ছোটমা, খুব ভাল মাটন্ এনেছি—দেখোতো, এরকম মাটন্ এখানে পাওয়া যায় না।

কনক মাটন্ দেখিয়া সহাস্যে বলিলেন, "চমৎকার মাটন গ্র্যাম সেভ—যাও ওপরে গিয়ে মুখ হাত পা ধুয়ে ফেলো"।—মাটন্ সম্বন্ধে ছোটমার মন্তব্যে সে

বিশেষ উৎসাহিত হইয়া দ্বিতলে প্রস্থান করিল। বলা বাহুল্য গৃহের সাজসজ্জার পারিপাট্যে সে বিশেষ প্রীত হইয়াছে।

সে মুখ হাত পা ধুইয়া ঘরের পাখা খুলিয়া কার্পেটের উপরে পায়চারী করিতেছিল—এমন সময় কনক আসিয়া বলিলেন, "যা ভেবেছি ঠিক তাই—মুখ হাত পা তো ধুয়েছো কিন্তু মাথার চুল কী অবস্থায় রয়েছে তা দেখোনি। এদিকে এসো—চুল ঠিক ক'রে দি।" সমীর ছোটমার সান্নিধ্যে আসিলে তিনি চুল ঠিক করিয়া সাদরে তাহার গালে দুটী চাপড় দিয়া কহিলেন, "তুমি আমার বুড়ো খোকা, ঘরে না ঘুরে ছাতে গিয়ে পায়চারী করো। বেশ ঠাণ্ডা"—তিনি পাখা বন্ধ করিরা নীচে প্রস্থান করিলেন।

যখন কনক সমীরকে আদর করিতেছিলেন সেই সময়ে সমীর নিজের আকৃতির সহিত কনককে প্রতিবিম্বিত হইতে দেখিয়াছিল আয়নায়—কিন্তু কী চেহারা সে দেখিল ছোটমার? সে শিউরিয়া উঠিল। সে পুনর্ব্বার ছোটমার মুখ দেখিল মুকুরে, কৈ কিছুই তো লক্ষ্য করিল না—সেই সুন্দর হাসি মুখ, তবে সে কী দেখিল দর্পণে?

চাঁদিনী রাতে আরাম চেয়ারে বসিয়া নিমেষে-দেখা ছোটমার অদ্ভুত প্রতিবিম্বিত মূর্ত্তি সম্বন্ধে সে চিন্তায় মগ্ন হইল—কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভবপর হইল না। কত সময় যে কাটিয়া গিয়াছে তাহা লক্ষ্য করে নাই। হঠাৎ ইন্দুর কণ্ঠস্বরে তাহার চমক ভাঙ্গিল—ইন্দু সংবাদ দিল যে আহার প্রস্তুত, তাহার জন্য সকলে অপেক্ষা করিতেছেন। সমীর দ্রুতপদে নীচে নামিয়া আসিল।

সুন্দর ডাইনিং হল—ধব ধব্ করিতেছে সাদা পাথরের প্রশস্ত ডাইনিং টেবল্—টেবিলের উপরে নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য সজ্জিত রহিয়াছে, মাথার উপরে পাখা বন্ বন্ করিয়া ঘুরিতেছে। সমীর ঠিক রামসদয়বাবুর পার্শ্বের চেয়ারে বসিয়াছে। রামসদয়বাবু বলিলেন, "দেখ্ খোকা, সাবধানে খাস্—কখন তোর হাত থেকে কোন্ বাটী ছিট্‌কোবে তার কোন ঠিক নেই—বিলেতে গিয়ে করবি কি?"

সমীর সে কথার কোন উত্তর দিল না। সে আজও ঠিক ধারণা করিতে অক্ষম কেন তাহার হস্ত হইতে হঠাৎ বাটী বা ডিস্ ছিট্‌কাইয়া পড়ে। যাহা হউক সে সাবধানেই আহারে বসিয়াছে যেন কোন অঘটন না ঘটে। ভাল

তরকারী আহারের পর যখন সমীর মাংসের বাটী উঠাইয়া পাতে ঢালিতে যাইবে তখন এমনভাবে সেই বাটী ছিট্‌কাইয়া গিয়া পড়িল রামসদয়বাবুর পাতে যে খাওয়া তাঁহার নষ্ট হইল। মাংসের ঝোল ধব্‌ধবে পাঞ্জাবীতে লাগিয়া তাহার অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল। রামসদয়বাবু বিশেষ ক্রুদ্ধ হইয়াই বলিলেন, "যা বলেছি তাই—ওকে টেবিলে খেতে দেওয়ার দরকার কি—টেবিলে খাবে?—জঙ্গলী।" তিনি টেবিল ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলেন। সমীরও নিতান্ত অপরাধীর ন্যায় মুখ নীচু করিয়া উঠিয়াছে। কনক বলিলেন, "বাটী ফেলেছে তো হয়েছে কি? খাবার মাংস প্রচুর আছে, বাসনপত্র সব ব'দ্‌লে দিচ্ছে—খাওয়া ছেড়ে উঠে যাওয়ার কী দরকার।" রামসদয়বাবু বলিলেন, "খাবার সব টেবিলেই আছে তো—টেবিলে খাই ব'লে ছেলের এঁটো উচ্ছিষ্ট খেতে পার্‌ব না—এক কাপ বোর্ণভিটা, দু স্লাইস পাঁউরুটী বেশ পুরু করে মাখন মাখিয়ে আর মিছরীর টুক্‌রো শিগ্‌গীর পাঠিয়ে দাও ওপরে।" তিনি আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া সশব্দে দ্বিতল ঘরে অগ্রসর হইলেন।

রামসদয়বাবুর যে ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়াছিল, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন,—এই মাটনের রান্না সুচারুরূপে আহারের জন্য তিনি কত পরিশ্রম করিয়াছেন তাহা আমরা জ্ঞাত আছি। তাঁহার পক্ষে এ ভাগ্য বিপর্য্যয়ে সংযমের গণ্ডী অতিক্রম করা খুবই স্বাভাবিক,—তিনি যে ক্রোধে আত্মহারা হইয়া সমীরকে প্রহার করেন নাই, তাহার কারণ বোধ হয় মাটন্ কষ্ট করিয়া সমীরই আনিয়াছিল।

প্রভা আহার হইতে উঠিয়া ঠাকুরের সাহায্যে পিতার আহারের ব্যবস্থা করিতে ছুটিল। কনক সমীরকে হাত ধরিয়া অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া পুনর্ব্বার আহার করিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু সে আর আহারে প্রবৃত্ত হইল না।

সমীর নিজের ঘরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিল। কিছুক্ষণ পর বালকের ন্যায় উপাধানে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল। যে উৎসাহ আশা লইয়া সে মিউনিসিপাল মার্কেট হইতে ভাল মাটন্ আনিয়াছিল তাহার পরিণতি যে এই প্রকার হইবে ইহা তাহার কল্পনার অতীত ছিল। তাহার পিতা ভোজন-বিলাসী, মাটনের মাংস তাঁহার বিশেষ প্রিয়, এই কারণেই সে মূলতঃ মাটন্ আনিয়াছিল—কিন্তু পিতাকে প্রীত করিবার পরিবর্ত্তে সে পিতা কর্ত্তৃক বিশেষ লাঞ্ছিত হইল। পিতা তাহাকে কোনদিন বিশেষ অপমান করেন নাই, আজ

তিনিই তাহাকে "জঙ্গলী" বলিলেন, সে আজও টেবিলে আহার করিবার যোগ্যতা অর্জন করে নাই। সে বিনিদ্র অবস্থায় উষ্ণ মস্তিষ্কে শয্যার এপাশ ওপাশ করিতেছে—গভীর রাত্রি সমাগত—কলিকাতা নগরীর যন্ত্ররাজ তিনিও নীরব, শান্ত। এই নীরবতার মধ্যে নির্মেঘ নীলাকাশে চাঁদের প্রবল বন্যা ঘরের বৃহৎ উন্মুক্ত বাতায়নের মধ্য দিয়া আসিয়াছে সমীরের স্বর্গীয়া জননীর বিরাট তৈল-চিত্রের উপরে—শিশু সমীরকে কোলে করিয়া তিনি উপবিষ্টা।—সে একদৃষ্টে মাতার তৈল-চিত্রের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল—তাহার মনে হইল সে মাতৃহীন, সেই কারণেই বোধ হয় পিতা তাহাকে "জঙ্গলী" বলিতে সাহস করিলেন—কৈ তাহার বিমাতা এইরূপ অপমানের কোন প্রতিবাদ করিলেন না তো। সে মাতার তৈল-চিত্রের প্রতি পুনর্ব্বার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বালকের ন্যায় ফুপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

কখন সে নিদ্রার ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়াছে সে জানে না—তাহার মনে হইল সে যেন স্বপ্ন দেখিতেছে।

স্বপ্নে সে যেন অনুভব করিল যে তাহার মাতা শয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সস্নেহে বলিতেছেন, "খোকা দুঃখ করিস্‌নে—বাটী যে তোর হাত থেকে প'ড়ে যায় তা তোর দোষ নয়—আমারই দোষ—আমিই তোর হাত থেকে বাটী ফেলে দি"। সে স্বপ্নে উঠিয়া মাকে অন্বেষণ করিতে হস্তে আঘাত পাইল। নিদ্রা তাহার ভঙ্গ হইয়াছে।

সমীর বিজ্ঞানের কৃতীছাত্র—সে স্বপ্ন বা পরকাল বা ঈশ্বর কিছুই বিশ্বাস করে না। তাহার সহপাঠীদের মধ্যে যাহারা পরকাল বা স্বপ্ন বা ঈশ্বরে আস্থাবান তাহাদের বিদ্রূপ করিতে কোন দিন সে কার্পণ্য প্রকাশ করে নাই। এমন কি স্যার অলিভার লজ্‌ বা উইলিয়াম ক্রুক্‌স্‌এর নাম করিলেও সে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া নিঃসঙ্কোচে বলিয়াছে যে তাঁহাদের "ভীমরতি" হইয়াছে। তাহার পক্ষে এ স্বপ্ন বিশ্বাস করা কঠিন। কিন্তু মানব যতই যুক্তি তর্কের জয় ঘোষণায় ব্যাপৃত থাকুক না কেন, যে স্থানে তাহার হৃদয় লইয়া কথা সে স্থলে যুক্তি তর্ক বৈজ্ঞানিক গবেষণা সব ভাসিয়া যায় হৃদয়ের কোমল সুরে। মাতার মধুর করুণ স্মৃতি তাহাকে যুক্তি তর্কের রাজ্য হইতে লইয়া গিয়াছে বহু দূরে।

সমীরও আজ স্বপ্নে মাতার কথা গভীরভাবে চিন্তা করিতেছে। প্রথমে

তাহার মনে এই প্রশ্ন আসিল যে সত্যই কি তাহার মাতা এইরূপে বাটী ফেলিয়া দেন? তাহার পর মনে হইল, "কেনই বা তিনি এইরূপে বাটী ফেলিয়া দেন?" তাহার পর হঠাৎ মনে হইল, "যদি তাই হয়?" পরক্ষণে আবার মনে হইল, "তাই বা কি ক'রে সম্ভব?" সে একটী শিশি ভাল করিয়া ধুইয়া ছিপি আঁটিয়া পকেটে রাখিল। প্রাতঃকালে সে বলিল, "ছোটমা আমার কলেজ আছে—শিগ্‌গীর ভাত চাই।

সে শীঘ্রই স্নানাদি সমাপন করিয়া আহারে বসিল। সে আহারের সময় প্রত্যেক বাটী সজোরে ধরিয়াছে ও সাবধানে উঠাইতেছে। সে মনে মনে ভাবিতেছে আহার তো প্রায় শেষ হইয়া আসিল, কিন্তু এখনও তো বাটী পড়িল না! সে স্বপ্নের কথাকে "ভূতুড়ে" কাণ্ড মনে করিয়া হাসিতেছে। শেষে যখন দুগ্ধের বাটী উঠাইয়া মুখে দিবে সেই সময়ে তাহার মনে হইল যে কোন এক অদৃশ্য মহাশক্তি যেন তাহার হস্তে সজোরে ধাক্কা দিয়া বাটী ফেলিয়া দিল। সে এদিক ওদিক দেখিয়া বাটীর অবশিষ্ট দুগ্ধ শিশিতে ভরিয়া সাবধানে পকেটে রাখিল।

সমীর কলেজের ল্যাবরেটরীতে গিয়া প্রথমেই সেই দুগ্ধের রাসায়ণিক বিশ্লেষণ আরম্ভ করিল। কিছুক্ষণ পরেই দুগ্ধের মধ্যে আর্সেনিক বিষ লক্ষ্য করিয়া চমকিয়া উঠিল। তখন তাহার আর বুঝিতে বিলম্ব হইল না, কেন সে হঠাৎ বিমাতার বীভৎস রূপ দর্পণে দেখিয়াছিল। তখন সে সম্যক উপলব্ধি করিল কেন তাহার হস্ত হইতে হঠাৎ বিশেষ বাটী বা ডিস্ পড়িয়া যায়।

তাহার বিজ্ঞানের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া বিজ্ঞানই তাহাকে মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝাইয়া দিল যে স্বপ্নও সত্য হয়। তাহার মনে হইল যে মাতা মৃত্যুর পরপার হইতেও তাহাকে সদা সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছেন। এই কথা চিন্তা করিয়া তাহার চক্ষু সজল হইয়া আসিল,—সে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল "মা—মা আমার।"

"অধিকন্তু ন দোষায়"

শ্রীনরেন্দ্র দেব

ছ্যাচ্ড়াপাড়ার জমিদার ছটাকী মুখুজ্জের মেয়ে কুমারী চকমকি দেবীর আজ পাকা দেখা। অনেকদিন ধরেই কুমারী চকমকি দেবীর বিয়ের চেষ্টা চলছিল। ভাল ভাল সম্বন্ধও অনেকগুলি এসেছিল। তারা মেয়ে দেখে পছন্দও করেছিল, কারণ, ছটাকী মুখুজ্জের মেয়ে ছিল নামেও চকমকি রূপেও চকমকি। বিদ্যুতের শিখার মতোই ছিপ ছিপে সুন্দর গড়ন, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ দেহ, আষাঢ়ের মেঘের মতো নিবিড় কালো চুল। চোখ দুটি টানা-টানা, নাকটি টিকালো, অপছন্দের মেয়ে সে নয়। কিন্তু মেয়ের একটি দোষের জন্যে শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত সম্বন্ধই ভেঙে যাচ্ছিল।

কুমারী চকমকির বাঁ হাতে আঙুল ছিল ছ'টি। ক'ড়ে আঙুলের পাশ থেকে অকারণ আর একটি আঙুল বেরিয়ে এসে সবাইকে যেন আঙুল নেড়ে নিষেধ করছিল, 'সাবধান! এ মেয়ে ঘরে নিয়ে যেয়ো না।' পাত্রীর এই ছ'আঙুলের ছুতো ধ'রে একে একে সবাই সরে পড়ছিল।

কিন্তু ছেঁচ্কিপুরের ছ-আনির অংশীদার ছ্যাবলা বাঁড়ুজ্জে এ মেয়েকে তাঁর একমাত্র পুত্র ক্যাবলাকান্তর জন্য পছন্দ করে দেনা-পাওনার ফর্দ্দ মিটিয়ে আজ সদলবলে ভাবী পুত্রবধূকে আশীর্ব্বাদ করতে এসেছেন।

বরপক্ষকে সাদরে অভ্যর্থনা জানিয়ে ছটাকী মুখুজ্জে তাঁর সুসজ্জিত প্রকাণ্ড নাচঘরে বসিয়েছেন। কন্যাপক্ষেরও বহু আত্মীয়-স্বজন নিমন্ত্রিত হ'য়ে এসেছেন। ছটাকী মুখুজ্জের গুরুপুত্র রাঘব ভট্টাচায্যিও পত্র পেয়ে যথাসময়ে দেশ থেকে এসে উপস্থিত হয়েছেন।

ঘন ঘন শঙ্খধ্বনির মধ্যে বরপক্ষের প্রবীণ পুরোহিত লঙ্কেশ্বর শর্ম্মা উঠলেন, সর্ব্বপ্রথম কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করতে; একমুঠো ধান দুর্ব্বা তিনি চুয়াচন্দনে চুবিয়ে নিয়ে যখন পাত্রীর কপালে ছোঁয়াবার জন্য কাছে এগিয়ে গেছেন, হঠাৎ পাত্রীর বাঁ হাতের দিকে তাঁর নজর পড়ে যাওয়ায় তিনি থমকে দাঁড়ালেন। তাঁর চোখের দৃষ্টি তখন নিষ্পলক হয়ে কন্যার সেই কড়ে আঙুলের পাশে উদ্যত ষষ্ঠ আঙুলটির দিকে নিবদ্ধ!

প্রবীণ পুরোহিত লক্ষেশ্বরের ভাব গতিক দেখে কন্যাপক্ষ প্রমাদ গুণলেন। ছটাকী মুখুজ্জের মুখ ফেণী বাতাসার মতো ফ্যাকাসে হ'য়ে গেল! মেয়ের মামা মটকা গাঙ্গুলীর বিষণপুরী ঘিয়ের মটকির মত জালাভুঁড়ি বাটা কোম্পানীর ফাটা-ফানুষের মতো চুপ্‌শে যাবার যোগাড়! মনে মনে তিনি দুর্গানাম জপ্‌তে সুরু করলেন।

চক্‌মকির পাকা-দেখা বুঝিবা ভেঙে যায়!

লক্ষেশ্বর শর্ম্মা ইঙ্গিতে ছ্যাব্‌লা বাঁড়ুজ্জেকে কাছে ডেকে কন্যার বাঁ হাতটি দেখিয়ে নিম্নস্বরে বললেন, তোমরা কি কন্যার এই বিকলাঙ্গ দেখেও এই পাত্রীকে পছন্দ করেছ?

চকমকির চোখ মুখ লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠলো! আঙুলটা সে যেন লুকোতে পারলে বাঁচে! ছ্যাবলা বাঁড়ুজ্জে পুরোহিতের কথায় কোনো উত্তর না দিয়ে বিস্ময়ে নির্ব্বাক হয়ে চকমকির বাঁ হাতখানি ধ'রে সেই অতিরিক্ত আঙুলটির দিকে চেয়েছিল।

প্রবীণ পুরোহিত লক্ষেশ্বর শর্ম্মা কণ্ঠস্বর এবার আরও একটু নামিয়ে প্রায় ফিস্‌ ফিস্‌ ক'রে ছ্যাবলা বাঁড়ুজ্জের কানে কানে বললেন,—এর জন্য যৌতুকের টাকা যদি কিছু বেশী পেয়ে থাকো, বলো বাবাজী—আশীর্ব্বাদ সেরে নিই—নইলে—

ছ্যাবলা বাঁড়ুজ্জে চম্‌কে উঠে জিজ্ঞাসা করলে, নইলে—?

নইলে—কন্যা সুলক্ষণা নয় ব'লে এ সম্বন্ধটি বাগ দানের পূর্ব্বেই ভেঙে দেওয়া কর্ত্তব্য মনে করি।

ছ্যাব্‌লা বাঁড়ুজ্জে কিছুক্ষণ মাথা চুলকে বললে,—কিন্তু ঠাকুরমশাই, একটা কথা রয়েছে এর মধ্যে—আমি যখন মেয়ে দেখে পছন্দ করে যাই, তখন কিন্তু পাত্রীর আঙুল মাত্র পাঁচটিই ছিল!

সে কি বলছো বাবাজী?

আজ্ঞে হ্যাঁ; আমি নিজে শুধু চোখে দেখে নয়, ভাল করে গুণেও গেছি। কারণ, লোক মুখে এটা আগে শুনেছিলুম কিনা!

বলো কি হে? কতদিন আগে মেয়ে দেখে পছন্দ করে গেছলে?

আজ্ঞে, তা' প্রায় মাসখানেক হ'লো বই কি।

"কিন্তু,..." প্রবীন পুরোহিত কিছুক্ষণ কী ভেবে বললেন,—আঙুলটি দেখে ত ওটি মাত্র মাসাধিক কাল পূর্ব্বে জাত বলে বোধ হ'চ্ছে না—

ছ্যাবলা বাঁড়ুজ্জে কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করলে—তবে? আঙুলটি কতদিন আগেকার বলে মনে হ'চ্ছে আপনার?

পুরোহিত মৃদু হেসে বললেন—সেকথা বলা বড় শক্ত বাবাজী। একটি কিশোরী বালিকার একটি মাত্র আঙুল—তাও আবার কনিষ্ঠার অঙ্গসংলগ্না এবং প্রয়োজনাতিরিক্তা! তার বয়স নির্দ্ধারণ করা কি সহজ বলে মনে করো? বিশেষতঃ যখন মেয়েদের নিজেদের যথার্থ বয়সই নির্ণয় করা অত্যন্ত সুকঠিন—তখন তাদের শুধু একটি আঙুলের—

ছ্যাবলা বাঁড়ুজ্জে বললে—বুঝেছি ঠাকুর মশাই, ওটা আপনি ঠিকই বলেছেন—একেবারে অসম্ভব ব্যাপার! আমার স্ত্রীর বয়সই আমি আজ পর্য্যন্ত ঠাওর করতে পারিনি!

—যথা কথা বাবাজী, যথা কথা!...বৃদ্ধ পুরোহিত হেসে বললেন—ব্রাহ্মণীর সম্বন্ধেও অবিকল তাই বলা চলে।

ছ্যাবলা বাঁড়ুজ্জে উৎকণ্ঠিত হ'য়ে প্রশ্ন করলে...কিন্তু সে যাই হোক্ ঠাকুর মশাই, উপস্থিত কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করা সম্বন্ধে কি আদেশ করেন বলুন?

—ষড়াঙ্গুলীযুক্তা কন্যাকে পুত্রবধূ করা অনুচিত। তবে, ক্ষেত্রবিশেষে যদি অতিরিক্ত অঙ্গুলীর জন্য কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত অর্থ প্রাপ্তি ঘটে, তা'হ'লে—

—উত্তম, তা'হলে আপনিই এ প্রস্তাবটা কন্যাপক্ষের কাছে করুন—আমি অনেক মেয়ে দেখেছি ঠাকুরমশাই আমার ছেলের জন্য, কিন্তু এমন পছন্দসই সুন্দরী মেয়ে আর একটিও পাইনি। সুতরাং এ মেয়ে আমি হাতছাড়া করতে ইচ্ছা করি না। আমি আপনাকে আবার জোর করেই বলছি, মেয়ে যখন প্রথম দেখি—তখন মাত্র পাঁচটি আঙুলই ছিল। আধখানিও বেশী ছিল না।

প্রধান পুরোহিত লক্ষেশ্বর শর্ম্মা একটু সংশয়াকুল চিত্তে প্রশ্ন করলেন—গুণতে ভুল করনি ত বাবাজী?—তুমি আবার শটিকেতে বরাবরই একটু কাঁচা কিনা—তাই ভাবছি হয়ত—

ছ্যাব্লা বাঁড়ুজ্জে জোর করে মাথা নেড়ে বললে,—না না ঠাকুর মশাই, সে হতেই পারে না! এ আপনি পাগলেরমতো বলছেন—হাতের পাঁচটা

আঙুল যে সমান নয় এ জানতে কাউকে শুভঙ্করী বা ধারাপাত পড়ে অঙ্ক কষে দেখতে হয় না! পাঁচ আঙুলের হিসেব লোকে মায়ের পেট থেকে পড়েই শেখে।

—তা'বটে ছোবল, এটা তুমি যথাকথাই বলেছ! কিন্তু, তাহ'লে এ আঙুলের সমস্যা যে আরও জটিল হয়ে উঠলো! একমাসের মধ্যেই কি তবে এ পরিবর্ত্তন ঘটেছে? কিন্তু আমি ত বরাবর শুনে আসছি এসব আঙ্গিক বাহুল্য নরনারী ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নিয়ে জন্মায়। পরে কখনও কা'রও এমন কিছু অতিরিক্ত প্রত্যঙ্গ উদ্গত হয়েছে বলে তো জানা নেই?

ছ্যাবলা বাড়ুজ্জে বললে—কেন ঠাকুর! পায়ে যে আপনার এই প্রকাণ্ড গোদ—এ ত আপনি ভূমিষ্ঠ হবার অনেক পরেই উদ্গত হয়েছে। আমার কপালের বাঁ দিকে এই যে আব দেখছেন, এ ত' এই সেদিন হ'ল। এ নিয়ে ত' আমি জন্মাই নি। আমার ক্যাবলাকান্তর 'গজদন্ত' বেরুলো যখন তার বয়স আট বছর। ভূমিষ্ঠ হবার সময় আমাদের কারুরই ত এসব আঙ্গিক বাহুল্য ছিল না ঠাকুর?

—তা' বটে, তা' বটে! টিকি দুলিয়ে মাথা নেড়ে প্রবীণ পুরোহিত বললেন— যথাকথাই বলেছ—যথাকথাই ব'লেছ। হয়ত তাহ'লে এটা পরে হতেও পারে বা! এই মাসাবধিকালের মধ্যেই কিশোরী কন্যার করে নবাঙ্গুলী সঞ্চার—হ্যাঁ, এমন কিছু বিস্ময়কর নয়। তবে, কন্যাকে একবার প্রশ্ন করে এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যাক।—

—বলি মা জননী, একবার মুখখানি আমার দিকে তোলো ত মা! তোমার এ বুড়ো ব্রাহ্মণ সন্তানের কাছে লজ্জা কিসের মা এত? তোমার নামটি কি মালক্ষ্মী?

'কুমারী চক্‌মকি মুখোপাধ্যায়।'

—বেশ! বেশ! কল্যাণীয়া কুমারী কি ব'ললে মা—চাম্‌চিকী মুখোপাধ্যায়—?

—আজ্ঞে না—চক্‌মকি। মেয়ের বাপ ছটাকী মুখুজ্জে উত্তর দিলে। ওর দাদামশাই আদর করে ওই নাম রেখে গেছলেন। যদিও তখন দেয়াশালাই উঠেছিল কিন্তু আমার শ্বশুর মহাশয় ব্যবহার করতেন না। তিনি চক্‌মকির পক্ষপাতি ছিলেন। কিন্তু, ও যেদিন ভূমিষ্ঠ হয়, সেইদিন থেকে তিনি 'চক্‌মকি' ছেড়ে

দেয়াশালাই ধরেন এবং এই ত্যাগকে স্মরণীয় ক'রে রাখবার জন্তই নাতনীর নাম দেন চকমকি !—

—উত্তম ! উত্তম !···সাধু পুরুষ ছিলেন তিনি। তা' হ্যাঁ মাতঃ চক্রমুখী, একটি প্রশ্ন করতে চাই আমি তোমায়। আমাদের কেবলের ভাবী বধূরূপে আশীর্ব্বাদ করবার পূর্ব্বে—তোমার বামহস্তে যে অতিরিক্ত আঙুলটি অবলোকন করছি, ওর ইতিহাস তুমি কিছু জানো ?

কুমারী চকমকি মুখোপাধ্যায় বুড়োর মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল ! ইতিহাস ? ইতিহাস ত সে পড়েনি। ছোটবেলায় ইস্কুলে সে ভূগোল পড়েছিল। মৃদুস্বরে বললে—আমি ভূগোল জানি !

—উত্তম ! উত্তম ! তুমি তাই বলো মাতা চক্রমুখী। তোমার ঐ অতিরিক্ত ষষ্ঠাঙ্গুলীর ভৌগলিক অবস্থান কি কনিষ্ঠার মূলে জন্মাবধিই ছিল ? না, সম্প্রতি শরীরাভ্যন্তরস্থ কোনো প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় বশতঃ এই মাসাধিক কালের মধ্যে সেটা সংঘটিত হয়েছে ?

চকমকি এই বৃদ্ধ পুরোহিতের পণ্ডিতি ভাষা কিছুমাত্র বুঝতে না পেরে মনে করে নিলে, তাকে বোধ হয় ভূগোল পড়ার কথাই জিজ্ঞাসা করা হ'চ্ছে। সে মৃদুকণ্ঠে বললে—ছেলেবেলায়······'পাঠশালায় পড়েছি', আরও কি সে বলতে যাচ্ছিল—কিন্তু প্রবীণ পুরোহিত লঙ্কেশ্বর শর্ম্মা বাধা দিয়ে অকস্মাৎ তারস্বরে বলে উঠলেন—নারায়ণ ! নারায়ণ ! ছেলেবেলা থেকেই আছে ;—অর্থাৎ তোমার জ্ঞান হ'য়ে পর্য্যন্ত তুমি দেখেছ ! উত্তম, উত্তম······

তারপর, ছটাকী মুখুজ্জের উদ্দেশে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—আমার বহুমানাস্পদ যজমানের ভাবি বৈবাহিকা দেব্যা কি যমজ কন্যার গর্ভধারিণী ? আপনার কি অবিকল এইরূপ আকৃতির আর একটি কন্যা বিদ্যমানা ?

ছটাকী মুখুজ্জে বিস্মিত হয়ে বললে—তার মানে ?

পুরোহিত বললেন,—অর্থ এর মোটেই দুর্বোধ্য নয়। যেহেতু আমার যজমান শ্রীমান ছ্যাবলারাম বলছেন তিনি মাসাধিক কাল পূর্ব্বে যে কন্যা দেখে গিয়ে তাঁর পুত্রবধূরূপে মনোনীত করে গেছলেন সে কন্যার কোনো আঙ্গিক বাহুল্য বিদ্যমান ছিল না। তিনি উত্তমরূপে পর্য্যবেক্ষণ করে সে কন্যার মাত্র পঞ্চাঙ্গুলীই পরিদর্শন করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আজ এই বাগ্‌দান সভায়—সমবেত গুরুজন

ও আত্মীয়বর্গের আশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছা-গ্রহণের জন্য আপনার যে কন্যাটি উপস্থিত হয়েছেন তিনি ষড়াঙ্গুলীযুক্তা। সুতরাং মনে হচ্ছে তাড়াতাড়িতে আপনার অন্তঃপুর হ'তে ভ্রমক্রমে যমজ ভগ্নীর অপরটিকে সভাস্থলে পাঠানো হয়েছে। আপনি অনুগ্রহ করে পুরনারীদের অসাবধানতা বশতঃ এই যে অদল বদল ঘটে গেছে সেটা সংশোধন করে নিয়ে এলে আমরা সানন্দে বাগ্‌দান ক্রিয়া সুসম্পন্ন করে যেতে পারি।

সেঘরে অকস্মাৎ বজ্রাঘাত হ'লেও ছটাকী মুখুজ্জে বোধ হয় এত বিচলিত হতেন না। তিনি অনেকক্ষণ পুরোহিতের এ প্রস্তাবের কোনো উত্তরই দিতে পারলেন না।

ভগ্নীপতির এই শোচনীয় অবস্থা দেখে মেয়ের মামা মটকা গাঙ্গুলী অগ্রসর হয়ে বললে—ঠাকুর মশাই, মাপ করবেন। আমার ভগ্নীর এই একটিমাত্র মেয়ে ছাড়া আর দ্বিতীয় কন্যা নেই, সুতরাং আপনার অনুরোধ রক্ষা করতে পারবো না বলে আমরা দুঃখিত। আপনি যা অনুমান করছেন তা' একেবারেই ভুল।

বৃদ্ধ পুরোহিত অপ্রতিভ হয়ে ছ্যাবলা বাঁড়ুজ্জের মুখের দিকে নিরুপায়ের মতো চাইতেই—ছটাকী মুখুজ্জে ততক্ষণে একটু সামলে নিয়ে বললে—আমার মেয়ের যে একহাতে ছ'টি আঙুল এ খবর ছ্যাঁচড়া পাড়ার মশা টিক্‌টিকি পর্য্যন্ত জানে। আমি তা কোনোদিনই গোপন করিনি—করতে চাইওনি। বেয়াই মশাই বলছেন একমাস আগে এ আঙুল তিনি দেখেন নি, তা' যদি না দেখে থাকেন তাহ'লে তাঁর উচিত একটু ভালো দামী চশমা ব্যবহার করা। তাঁর চোখের অবস্থা যে খুবই খারাপ সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না—কারণ, মানুষের হাতের আঙুল তার মাথার চুলের মতো সূক্ষ্ম পদার্থ নয়,—আঙুল লোককে চোখে আঙুল দিয়েই দেখিয়ে দেয় তার অস্তিত্ব।……

—যথা কথাই ত! যথা কথাই ত!—কন্যার পিতা ঠিক কথাই বলেছেন ছ্যাবলরাম! এখন তুমি বলো এই ষড়াঙ্গুলীসম্পন্না কন্যাকে প্রসন্নমনে তুমি পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করতে প্রস্তুত কিনা?—

রাঘব ভট্টাচার্য্য এইবার রুখে উঠলেন। রাঘবের বাস পূর্ব্ববঙ্গে। উনি হুঙ্কার দিয়ে প্রশ্ন করলেন—হঃ, গ্রহণ না করবা ক্যান্? ইসে, কওতো ঠাউর

মোরে—ছয় অঙ্গুলীর বাধাটা কি? ইসে, পাঁচটার পরিবর্ত্তে এলে ছয়ডা পাইছেন, বালো, আপনগোর মন্দটা হইছে ক্যাম্নে?—

প্রবীণ পুরোহিত অকস্মাৎ এই বোমা ফাটায় থতমত খেয়ে গিয়ে আমতা আমতা করে শুধু বললেন—অবশ্য, অবশ্য; কিন্তু, লক্ষণটা বোধ হয়···এইরূপ পাত্রী সুলক্ষণা কিনা—শাস্ত্র বলে—

—আরে, রাহেন মুশয়! ইসে শাস্ত্র পুথি আমাগোরও কিছু কম জানা নাই—শাস্ত্র শিখবানে কি পুরুৎবাড়ী যাইয়্যা? ইসে পড়েন নাই কিছু, খামখা আইসেন তর্ক জুড়তে! ইসে আমার পিতা ছিলেন তর্ক চূড়ামণি! আমি কইতেছি ছয় অঙ্গুলী সুলক্ষণ! জানেন কি জৈমিনী কৃত বিবাহ-মঙ্গলে ল্যাখছে "অধিকন্তু ন দোষায়"—পাঁচের পৃষ্ঠে ছয়, হঃ তাতে হইচে কি? হঃ, মহাভারত অশুদ্ধ হইল আর কি? ন্যান্, আশীর্ব্বাদ শুরু করেন, অকারণ বিলম্ব হইচে, শুভ-লগ্ন যায়!

—যথা কথাই ত, যথা কথাই ত! আপনি পণ্ডিত লোক, ঠিকই বলেছেন—"অধিকন্তু ন দোষায়!" বেশ! বেশ! শাস্ত্রের কথাই ত বটে এই!—তাহ'লে আশীর্ব্বাদ করি ছ্যাবল্‌রাম—অন্তঃপুরে শঙ্খধ্বনি করতে বলো।

—আজ্ঞে হ্যাঁ শুভকার্য্য শুরু করুন। বেয়াই মশাই বলছেন ওই অতিরিক্ত আঙুলটির জন্য আরও অতিরিক্ত একহাজার টাকা দেবেন—

—উত্তম! উত্তম! একেই বলে—"অধিকন্তু ন দোষায়!" *

---

* এই গল্পটি নাটকাকারে 'অল্ ইণ্ডিয়া রেডিয়ো'তে অভিনীত হইয়াছে

মহাবীরের মহিষ-শিকার

—'সম্বুদ্ধ'

শিকারের গল্প শুনতে ভালবাসে সবাই; বল্‌তে পারে অল্প লোকেই। তার কারণ, শিকার করা আর গল্প বলা দু'টো এক জাতের জিনিষ নয়—এটা যিনি অনায়াসে করেন, ওটা পারতে তিনি হিমসিম খেয়ে যান। ভাল শিকারী, কিন্তু গল্প বল্‌তে পারেন না, অতএব তাঁর অভিজ্ঞতার কাহিনী লোকে জান্‌তে পায় না; বা ভাল গল্প বলিয়ে, কিন্তু শিকারের শ-ও জানেন না, অতএব লোককে জানাবার মত তাঁর অভিজ্ঞতা নেই; দু'রকমের দুর্ঘটনাই আমরা দেখি।

আমি ভাল গল্প বলি কিনা জানিনে, কিন্তু মাঝে মাঝে গল্প বলি। শিকারের অভিজ্ঞতা অবশ্য আমার ভয়ঙ্কর। ব্যাং-ট্যাং কখন কখন মেরেছি; সাপ লোকে মেরেছে দেখেছি, বাঘ লোকে মারে শুনেছি।

গল্প-শোনার যা অভিজ্ঞতা আমার আছে তা থেকে বল্‌তে পারি, শিকার করার চাইতে তার গল্প শুন্‌তে মজা বেশী, যদি শিকারটা বেশ মজাদার রকম হয়।

সেই রকমের একটা গল্প তোমাদের শোনাচ্ছি।

গল্প নয়, ঘটনাটা সত্যি। বলব সবই, শুধু সন, তারিখ আর জায়গার নাম বল্‌ব না। নাম ধাম পরিচয় দিয়ে বলা উচিৎ হবে না, ব্যক্তিগত ব্যাপার দাঁড়িয়ে যাবে।

ঘটনাটা অনেকদিন আগেকার। তোমরা তখনও জন্মাওনি। আমিও না! আমি এ গল্প শুনেছি আমার ঠাকুরমার মুখে। তাঁ'র দেখা। নাম করব না, দক্ষিণ-বঙ্গের একটা শহরে আমাদের বাড়ী। সেইখানে ব্যাপারটা ঘটেছিল।

শহরটা ছোট। এখনও ছোট, এখন ত তবু অনেক বেড়েছে। তখন সবে তার পত্তন হচ্ছে। জায়গাটি ভাল—নদীর ওপার। নদীর ওপারে মস্ত বড় মাঠ—ধান ক্ষেত। তার পরে বাড়ী ঘর। ওদিকে বাড়ীর সঙ্গে থাকে আম, নারিকেল, সুপুরির বাগান, দূর থেকে ঘর বাড়ী চোখেই পড়ে না—বনের মত দেখায়।

এহেন শহরে গেলেন সব নতুন নতুন সায়েব, ম্যাজিষ্ট্রেট, ইত্যাদি হয়ে। সায়েবরা হালে এদেশে এসেছেন, তাঁরা জানেন, ভারতবর্ষের সব জায়গাই বন, আর বাংলাদেশের পথে ঘাটে রয়াল বেঙ্গল টাইগার ব'সে শুয়ে পড়ে থাকে। তাঁরা দেখলেন, নদীর ওপারে মাঠ আর বন—নিশ্চয়ই বাঘ আছে। শিকারের যোগ্য ক্ষেত্র।

চিঠিপত্র কি লেখালেখি হ'ল কে জানে। একদিন হঠাৎ শহরে সাড়া পড়ল—শিকার করতে সায়েবরা আসছেন। ক্রমে শিকারের সরঞ্জাম এসে পৌঁছতে সুরু হ'ল। গোটা ত্রিশেক হাতী, বন্দুক, সেপাই কত কি! আমাদের জেলায় হাতী নেই—হাতী দেখতে লোকের ভিড় জমে গেল। সকলের শেষে এলো সায়েবদের দল—সে বড় সায়েব, ছোট সায়েব, ঢ্যাঙা সায়েব, বেঁটে সায়েব, সরু সায়েব, শাদা সায়েব, কালো সায়েব,—একেবারে বহুবিধ সায়েব। লোকজন হাতী বন্দুক নিয়ে হৈ চৈ রৈ রৈ ক'রে শিকারীর দল যাত্রা করলেন, নদী সাঁতরে হাতী গিয়ে ওপারে উঠল।

তারপর অভিযান। এবড়ো-খেবড়ো ফাটা মাঠে চল্‌তে হাতীর পায়ের দফা শেষ, কায়ক্লেশে মাঠ পেরিয়ে তারা গিয়ে বনে ঢুকল।

এ পর্য্যন্ত বেশ চলেছিল। কিন্তু বনে ঢুকে দেখা গেল, বাঘ কেন, শেয়ালও নেই। সায়েবরা দূর থেকে দেখেছেন, বন আছে। বাঘ সত্যি আছে কিনা সেটা কেউ দেখে আসেননি, বন থাকলেই নিশ্চয় বাঘও থাকবে ব'লে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। এখন দেখা গেল বাঘরা বিশ্বাসের মান রাখেনি। ছোটলোক সব। কিন্তু সে ত হল, এখন নিজের মান বাঁচে কিসে? বাইরে থেকে বৃহৎ বৃহৎ সায়েবরা ভরসা ক'রে এসেছেন, বাঘ মেরে নিয়ে তাঁরা ফিরবেন, বাড়ীতে মশলা বেটে রাখতে পর্য্যন্ত বলে রাখা হয়েছে। এখন উপায়?

স্থানীয় সায়েবরা বল্‌লেন,—এই পেশকার, বাঘ কোথায়? বাঘ বা'র কর!

পেশকার সায়েবদের হাইফেন, সমস্ত স্থানীয় ব্যাপারের সঙ্গে তাঁ'দের যোগসূত্র। বাধ্য হয়ে তাঁরাও সঙ্গে গিয়েছিলেন। সায়েবের ধমক খেয়ে অভ্যাসবশে ব'লে ফেললেন,—কর্‌ছি হুজুর।

সায়েব বললেন,—এক্ষুনি।

তাঁরা বললেন,—ইয়েস স্যর্, এক্ষুনি স্যর্! আড়ালে এসে বললেন: এইবার কেলেঙ্কারি করেছে। সুপুরি বাগানে বাঘ কোথায় পাই?

কেউ কেউ বল্লেন: কোথায় পাবেন সেটা তখন ভাবলেই পারতেন। খুব ত' মুখ নেড়ে ব'লে এলেন 'ইয়েস্ স্যর্'!

যাঁরা বলেছিলেন তাঁরা বল্লেন: বল্‌ব না ত কি মশাই মারা পড়ব? তখন-কার মতন ত প্রাণ বাঁচল।

এঁরা বললেন: তা হ'লে এখনকার মতও প্রাণ বাঁচান।

ওঁরা বললেন: বাঁচাবই ত। ভয় করি?

এঁরা বললেন: তা কেন করবেন, করলে যে সর্ব্বনাশ পুরো হয় না। এবার সাম্‌লান ঠ্যালা। কঠিন মামলায় আটুকে গেছি বাবা, তামাসা নয়!

ওঁরা বললেন: ডরাই না মামলাকে, উকিল দেব।

উকিল একজন সঙ্গেই ছিলেন। বাঁড়ুজ্যে বামুন, চট্ ক'রে ব'লে দিলেন: বিকল্প দাও!

কিন্তু বিকল্প কি দিয়ে দেওয়া যায়! সে বনে জীবজন্তুর মধ্যে বেঁজি, গিরগিটি, ব্যাং আর শামুক। বড় গোসাপ পর্য্যন্ত মিল্‌বে না একটা! লোকেরা নিঃশ্বাস ফেলে বল্লেন: প্রাণটা গেল এবার!

কিন্তু বাঘ থাক আর না থাক সায়েবদের একটা কিছু বুঝিয়ে দিতে হয়। পেশকার গিয়ে নিবেদন করলেন: স্যর্, বাঘ ত নেই, হুকুম হ'লে অন্য জন্তু দিই।

সায়েব বললেন: আমার মান আর রাখলে না আজ! কি জন্তু দেবে, শিগ্‌গির কর!

পেশকার বল্লেন: ইয়েস্ স্যর্, ভেরি সুন্ স্যর্!

ব'লে জন্তু খুঁজতে চললেন। খুঁজবেনই বা কি ছাই, জন্তুই নেই! মনে মনে বললেন, মা কালী, আমাকেই না হয় একটা বাঘ ভালুক বানিয়ে দাও, তাই ওরা মেরে সুস্থ হ'ক। মা কালী শুনলেন না। অগত্যা ভদ্রলোক গঙ্গার শরণ নিলেন। জলে ডুবেই আজ প্রাণ দেবেন। নদীর ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে জোড়করে বললেন, মা গঙ্গা, সায়েবের গুলিতে মরবার চাইতে তোমার জলেই মর্‌ব মা, শুধু দেখো যেন কুমীরে না খায়। তারপরই ভাবলেন, তাই বা বলি কেন, কুমীর পেলে ত আর আমাকে মরতে হয় না। নেই কি?

ভদ্রলোক চশমা মুছে এদিক ওদিক তাকালেন। জয় মা কালী—মানে জয় মা গঙ্গা!

বাঁকের মুখে জলের ওপর দু'টী ছোট বিন্দু দেখা যাচ্ছে। পেশকার এগিয়ে চললেন। কি ও দু'টী? বিন্দুর সামনেই এক ফুট দূরে দু'টি ফুটো ভাসছে। নাক দেখা দিলেন তা হ'লে। কিন্তু নাক ত' বুঝলাম, পেছনে বিন্দু দু'টি কি? ওখানে থাকতে পারে শুধু একটী—মানে দু'টি জিনিষ, শিং। মা গঙ্গার শিং নেই। তবে কি কুমীর? তাদেরও শিং থাকে না। তবে?

পেশকার দাঁড়ালেন। নাকটাকে টিপ করে এক ঢেলা ছুঁড়লেন। প্রাণ ত গেছেই, কা'র জন্যে আর মায়া। ঢেলা ছুঁড়তেই জল তোলপাড় করে মস্ত বড় দুই শিং ভেসে উঠল। তারপর মুখ।

পেশকার কপালে হাত ঠেকিয়ে বললেন, বাঁচালে মা ভাগীরথী। ছুটে গিয়ে সায়েবকে বললেন: স্যর্, গট্।

সায়েব বললেন: বাঘ?

পেশকার বললেন: মোষ। বেশ বড়। কিন্তু কিনে নিতে হবে।

সাহেব বললেন: কিন্‌বে মানে? বুনো নয়?

পেশকার বললেন: এদেশে বুনো মোষ নেই স্যর্, সব পোষা।

সায়েব বল্‌লেন: কিন্তু পোষা মোষ নিরীহ, ওয়াইল্ড বাফেলো চাই।

পেষকার বললেন: ওয়াইল্ড বানিয়ে দেবো স্যর্, সে ভার আমার। আপনি ভাববেন না।

. সায়েব বললেন: তাই সই। কিনে নাও মোষ, টাকা দোবো। মান যায়।

পেশকার ছুটলেন। মোষের মালিককে খুঁজে বার করলেন। সে বেচতে চায় না। অনেক ভজিয়ে রাজি করান হল। দাঁও বুঝে ডবল দাম হাঁকালে, না, ভয়ে পড়ে আধা দামে ছাড়লে সেটা জানি না। মোষ কিনে পেশকার মালিককে বললেন: সর্ষে আছে রে? দে তো খানিক।

সর্ষে আস্‌তে পেশকার মোষের দুই কানের ভেতর দু'মুঠো পুরে দিলেন। মোষ ক্ষেপে গেল। ল্যাজিয়ে ঝাঁপিয়ে মাঠময় সে দুদ্দাড় সুরু করলে। পেশকার সায়েবদের বললেন: লুক্ স্যর্, একদম ফরেষ্ট বাফেলো স্যর্!

সায়েবরা বললেন: ঠিক্।

হাতী চল্‌ল। বন্দুক ছুটল। মোষও মরল শেষ পর্য্যন্ত। সেই মরা মোষকে মহাসমারোহে হাতীতে তুলে নিয়ে ভ্যাভাং ভ্যাভাং ক'রে শিকারীর দল শহরের দিকে ফিরলেন, বেলা তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

এ পর্য্যন্ত যা' যা' ঘট্‌্‌ছিল বেশ হয়েছিল, কিন্তু বিপদ বাধ্‌ল শহরে এসে। কেমন ক'রে কে জানে, শিকারের তথ্যটা শহরের চ্যাংড়ারা জেনে ফেলেছে।

নদী সাঁতরে হাতী এসে পাড়ে পৌছাল, ডাঙায় উঠ্‌তে পথ পায় না। নদীর ধার ধ'রে ধ'রে সারবন্দী হয়ে ভিড় করেছে শহরের ক্ষুদে বাহিনী, কারুর বয়স ন' বছরের ওপরে নয়। তাদের হাতে চীনে-কাগজের নিশান আর তেলের খালি টিন, কাঠি দিয়ে তা'রা টিন বাজাচ্ছে আর গাইছে—

ইঁদুর মারলাম কলে,
পিঁপড়ে মারলাম বলে,
চোদ্দ বছর যুদ্ধ ক'রে
ব্যাং-কে ফেল্‌লাম জলে।

সায়েবরা ভয়ঙ্কর গম্ভীর হ'য়ে বল্‌লেন: বাংলা গান আমরা বুঝি না।

হেঁয়ালি

অধ্যক্ষ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, এম. এ., আই. ই. এস্.

নিরাকার দশাটির মাপ ক' আঙ্গুল? —দশ
কোন্ গাড়ী চড়ে ঘোড়া, টানে নরকুল? —রথ
রসনায় গণনায় আগে কোন্ নাম? —রাম
কিসে পুষ্ট হ'লে কলা সুগোল সুঠাম? —চন্দ্রে
মুখে রা থাকে না যবে কি হয় রাবণ? —বন
বানরের নরবলি শুনিতে কেমন? —বা
বাত ছাড়ে যে বাতাসে কি থাকে তাহাতে?—আসে
শালাই মুখাগ্নি-কর্ত্তা সে কোন্ হাবাতে? —দিয়া
আগে কথা দিয়া পরে কে মরে কাঁদিয়া?—
দশরথ রামচন্দ্রে বনবাসে দিয়া।

"মুক্তি কমল করে কুটি কুটি"

ডাঃ শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, এম. এ., বি. এস-সি., এম. বি., ডি. টি. এম.

ভারতের ধন ভারতের ধারা ভারতের অবদান
ত্যরাজু তৌলে লঘু নিঃসার ভুলেও ভেবো না যেন
জীবিত চেতন জাগ্রত আজি ভারতের সন্তান
এক মনোপ্রাণ এক ভগবান অক্ষম হবে কেন ?

"সুপ্রভাতে"ই পর্য্যবসিত স্মিত পরিচয় যা'র
"ধন্যবাদ" আর "দুঃখিত" বলে আবাল বৃদ্ধ নারী
বহিশ্ছদের ছদ্মবিলাস তত্ত্ব সারাৎসার
প্রাজ্ঞ আকার কথা ভার ভার—যত মর্য্যাদা তা'রি !

শঙ্খ বলয় পীত সূত্রের আয়তি চিহ্ন ধরি
প্রদোষে প্রাহ্ণে আহ্নিক পূজা পরম তুষ্ট মনে
অনবরুদ্ধ পর্ণকুটীরে পোহাইত শর্ব্বরী
অমৃতের ধ্যান শ্রুতি প্রজ্ঞান নিদিধ্যাসন সনে।

সেই ভারতের অনপহরণ অস্তেয়-বাদ পরে
পাশ্চাত্যের সুবিধাবাদের যন্ত্র বিভূতি রাজি
উষ্মা রশ্মি গতি বিদ্যুৎ শক্তি সাধনা ক'রে
অষ্ট নায়িকা সিদ্ধি কবচ ভারত পরিবে আজি।

পূর্ব্বের রবি আজি পশ্চিম গগনে পড়েছে ঢলি'
এমনি চক্রনেমি ক্রমণ চলিয়াছে কালে কালে
গ্রীসীয়, রোমক, মিসর, আরব আর্য্যাবর্ত্তে ছলি'
শ্বেত দ্বীপেরে পরাল মাল্য তিলক লিখিয়া ভালে।

পলাশী যেদিন পলাশ রক্ত বরণ বস্ত্র পরি'
রণ ভৈরবী ত্রিশূল ত্যজিয়া হইল বৈরাগিণী
ধিক্কার করি নিজ গর্ভজে বিদেশী বণিকে ধরি'
আপন হস্তে দিল সমস্ত অবিজিত বন্দিনী।

শতেক বরষ গেল নিদ্রায় কুম্ভকর্ণ সম
দিনেকের তরে জাগিয়া মরিল উন্মত বিদ্রোহে
গোধূলি মেখেলা হইতে আঁধারে ডুবিল প্রগাঢ়তম
কেতাবে খেতাবে কেরাণী গোলাম দোঁহারে নিরখে দোঁহে।

গত শতার্দ্ধ বরষে ঘড়ির আবার ঘুরিল কাঁটা
কমলের মত সলিল শয়নে শিশির সহে না তবু
দারু বিগ্রহে ঘুণ ধরিয়াছে ভক্তি জোয়ারে ভাঁটা
দাস ফিরে নিল দাসখৎখানি ইস্তফা নিল প্রভু।

ম্রিয়মাণ শশী গ্রহণ-মসীর ম্রক্ষণে নিষ্প্রভ
ফুটে শুকতারা অরুণোদয়ের রক্তিমা সঞ্চারে
রক্ত চন্দনের ললাটিকা বক্ষ নিঙাড়ি' তব
জয়লাভ কর পরাজয় করি' মিথ্যা অহঙ্কারে।

ম্লেচ্ছ, কাফের বাংলা মায়ের অভিমানী দুই ছেলে
দলিত পীড়িত মায়েরে দেখিয়া ওই দেখ ছুটে আসে
মুক্তি কমল করে ফুটি ফুটি জলে হিল্লোল খেলে
ধ্বনিছে তূর্য্য উদিছে সূর্য্য স্বর্গে দেবতা হাসে।

উপনিষদের গল্প

শ্রী ইন্দিরা দেবী

সেদিন ঘনঘটা করে মেঘ করেছে, জানালার ধারে একা চুপচাপ বসে আছি, হাতে বিশেষ কোনও কাজ নেই আর যা আছে তা করবার মত মন আমার ছিল না। আকাশ অন্ধকার, ঘন কালো মেঘে ঢাকা, যেন অভিমানে মুখ ভার করে থম থম করছে, মাঝে মাঝে মেঘ ডাকছে, বিদ্যুৎও চমকাচ্ছে। হঠাৎ দূরে কোথায় বাজ পড়লো। ছেলেমেয়েরা ঘরের মাঝে খেলা করছে, তাদের অর্থহীন কলকল ধ্বনি কানে ভেসে আসছিল—কিন্তু বাজ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সব বন্ধ। সব দৌড়ে এসে ভয়ে আমায় জড়িয়ে ধরলো।

মাগো, আমার ভয় করছে, অলকের ক্ষীণ কণ্ঠের কাতরতা।

ছোটদি,—ব্যস, বাণীর মুখে আর কথা যোগায় না।

ও কি ভীষণ শব্দ, বুলু গা ঘেঁসে দাঁড়ায়।

তাদের সব কাছে টেনে নিয়ে আশ্বাস দিয়ে বল্লাম : ভয় কি রে?

অলক ভয় ব্যাকুল কণ্ঠে তখন বলছে—ওঃ কী ভীষণ বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।

বাণী অতিকষ্টে বল্লে : চোখ ধাঁধিয়ে দেয় যে?

অরুণ বিজ্ঞের মত বল্লে : তাও জানিস না বুঝি—মেঘে মেঘে ধাক্কা লাগলে মেঘ ডাকে আর বিদ্যুৎ চমকায়।

একথা সত্যি? অলক সাহস পেয়ে জিজ্ঞাসা করে।

হ্যাঁ, কিন্তু এর চেয়ে সত্যি কথা বিদ্যুৎ মেঘের বুকে 'দ' এঁকে দিয়ে যায়।

সেটা কি?

বলো না ছোট্টদি।

বলো না মাসী, লক্ষীটা—

এতগুলি শিশুর করুণ মিনতি। আচ্ছা শোন তবে বলি :—

অতীত ভারত। উপনিষদের যুগ। ব্রহ্মা হলেন সকলের পিতা। দেবতা, মানুষ ও অসুর সকলকে তিনি সৃষ্টি করেছিলেন—তাই ব্রহ্মাকে বেদে প্রজাপতি নামে অভিহিত করা হয়।

দেবতা মানুষ ও অসুর! এঁরা তিন ভাই, ক্রমশঃ এঁরা বড় হয়ে উঠলেন—লেখাপড়া শেখার বয়স হলো—তাই তাঁরা এলেন তাঁদের পিতা প্রজাপতি ব্রহ্মার কাছে। পিতার আশ্রমে শিষ্যের মত অবস্থান করে ব্রহ্মচর্য্য পালন করে বসবাস করতে লাগলেন।

এইভাবে বহু যুগ কেটে গেলো।

পরম পবিত্র ভাবে থেকে ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতী হওয়ার ফলে দেবতারা ক্রমশঃ পরম তেজস্বী ও নির্ম্মল স্বভাব হলেন। তখন তাঁরা সকলের আগে ব্রহ্মার কাছে উপস্থিত হয়ে বল্লেন : বহু যুগ ধরে ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতী হয়ে আপনার আশ্রমে আছি, এবার আমাদের দীক্ষা দিন।

দেবতারা স্বভাবতঃ একটু অস্থির চিত্ত ছিলেন। তাই প্রজাপতি ব্রহ্মা তাঁদের শুধু বল্লেন—'দ'। অর্থাৎ 'দম্যত'! দমন করো।

দেবতারা নিজেদের অস্থির চিত্তের কথা ভালভাবেই জানতেন তাই প্রজাপতি

ব্রহ্মের মুখে 'দ' বাণী উচ্চারিত হতে তাঁরা বুঝতে পারলেন তাঁদের পিতা তাঁদের এই অস্থির চিত্তবৃত্তিকে 'দ' অর্থাৎ 'দম্যত'—দমন করতে আদেশ করেছেন।

পিতার এই আদেশ বাণী নিয়ে দেবতারা চলে গেলেন।

এক যুগ কেটে গেল।

এবার এলেন মানুষেরা। প্রজাপতি ব্রহ্মাকে প্রণাম করে তাঁরা বল্লেন: আপনার আশ্রমে বহুদিন ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতী হয়ে শিষ্যের মত পরম পবিত্রভাবে জীবন যাপন করেছি—এবার আমাদের উপদেশ দিন।

প্রজাপতি ব্রহ্মা তাঁর স্বভাবলোভী মানুষদের শুধু বল্লেন 'দ' অর্থাৎ 'দত্ত'! দান করো।

মানুষেরা তাঁদের লোভের কথা জানতেন, তাই বুঝতে পারলেন—এই স্বভাব লোভের কথা স্মরণ করে তাঁদের পিতা প্রজাপতি এই লোভের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য তাঁদের অবিরত দান করতে বলেছেন।

মানুষদের কানের কাছে ব্রহ্মার উদাত্ত কণ্ঠে উচ্চারিত 'দ' বাণী বার বার ঝঙ্কৃত হতে লাগলো 'দ'—'দত্ত' দান করো, দান করো। পিতার উপদেশ বাণী নিয়ে মানুষরা প্রজাপতি ব্রহ্মার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

আর এক যুগ কেটে গেলো।

এবার এলেন অসুররা। এঁরা স্বভাবতঃ ক্রুর ও হিংস্র প্রকৃতির ছিলেন। পিতার আশ্রমে ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতী হয়ে শিষ্যের মত অবস্থান করে বহুবর্ষব্যাপী সাধনার পর প্রজাপতি ব্রহ্মার কাছে উপদেশ গ্রহণ করতে এলেন। বল্লেন—আপনার আশ্রমে আমোদের শিক্ষা শেষ হয়েছে, এবার আমাদের উপদেশ দিন।

ব্রহ্মা তাঁর ছেলেদের অন্তর জানতেন তাই শুধু বল্লেন—'দ'! অর্থাৎ 'দয়ধ্বম্' —দয়া করো।

অসুররা প্রজাপতির মুখ নিঃসৃত 'দ' বাণীর অর্থ অন্তরে গ্রহণ করতে সমর্থ হলেন। তাঁদের কানের কাছে অবিরত বাজতে লাগলো 'দ'—দয়ধ্বম্—দয়া করো। অসুরেরা বিদায় নিলেন।

তারপর কত যুগ কেটে গেছে তার ঠিক নেই; কিন্তু আজও প্রজাপতির অনুশাসন বিদ্যুৎ বাণীতে আকাশের বুকে এঁকে দেয়। দেবতা, মানুষ আর অসুরদের স্মরণ করিয়ে দেয়—দম্যত! দত্ত! দয়ধ্বম্—দমন করো, দান করো, দয়া করো।

মালঞ্চ

শ্রীকালিদাস রায়, কবিশেখর

আমরা কয়টি ভাইবোন মিলে লাগায়েছি গাছপালা,
নিজে হাতে করে বাঁধিয়াছি বেড়া বেঁধেছি মাচান চালা।
আমি সেঁচি জল দিদি তুলে ঘাস গাছেদের গোড়া হ'তে,
কোদাল ধরিয়া দাদাটি আমার মাটি খোঁড়ে, চারা পোঁতে।
লতাটি জড়াই, পাতাটি কুড়াই, ফুল লয়ে খেলা করি,
সবুজ ঠাণ্ডা মাচানের তলে দুপুরে ঘুমায়ে পড়ি।
কুঁড়িটি ধরিলে ফুলটি ফুটিলে প্রথম ধরিলে ফল,
খাওয়া নাওয়া সব ভুলে যাই মোরা হাসি নাচি অবিরল।
পাতাটি ঝরিলে লতাটি পড়িলে বুকে বড় ব্যথা পাই,
প্রজাপতি সাথে ঝোপে ঝাড়ে রই দু'টি বোন দু'টি ভাই।
লক্ লক্ করে কিবা কচি কচি পুঁইএর ডগলাগুলি,
লাখ লাখ সাপ তুলিতেছে যেন চক্‌চক্ ফণা তুলি'।
ঝিঙে ফুলে ফুলে ঢাকিয়াছে পাতা হলুদের ছড়াছড়ি,
মাচান ছাপিয়ে লাউ লতাগুলি ভুঁয়ে যায় গড়াগড়ি।
বড় বড় কাঁধি কলা গাছ ভেঙে ভারেতে পড়েছে ঝুঁকি'
কোলে চড়িয়াই হাতটি বাড়ায়ে ছুঁতে পারে ছোট খুকী।
শাকের চাকড়া যেন বা বিছানো ময়ূরকণ্ঠী শাড়ী,
বেগুনী ফুলেতে ভরা শিমলতা আঁচলা বিছায় তা'রি।
তক তক করা বাগানের পথ, দুই পাশে তার দুলে,
পালঙের শীষ রোশ নাই জলে মটরের ফুলে ফুলে।
মাথার উপরে অতসীর গাছ বাজাতেছে ঝুন্‌ঝুনি,
হলুদ রক্ত ফুলে আলো করে বিকালে সন্ধ্যামুনি।
পট পট করে চায় যেন তারা কহিবারে চায় কথা,
জীবন্ত তারা বলিতে পারে না বুকে যে তাদের ব্যথা।

গলা উঁচু করে কি যেন বলিছে রজনীগন্ধাগুলি,
কতই আদরে আহ্লাদে তারা পায়ে পড়ে ঢুলি' ঢুলি'।
পুঁই মেটুলীর আলতা পরিয়া চুলে গুঁজি জবাফুল,
কানে দেয় দাদা পরায়ে আদরে ঝুম্‌কো ফুলের দুল।
শিউলি বোঁটায় কাপড় রাঙাই, গলে পরি বেলি মালা,
হাতে পরি মোরা নীল ফুলে ভরা অপরাজিতার বালা।
দোপাটি ফুলেরে আরতি করিয়া প্রজাপতি ঘুরে ফিরে,
পাখীগুলি কেউ করেনাক' ভয়, কাছে বসে ধীরে ধীরে।
ফড়িঙের সাথে ভোমরার মাঝে ঝিঁঝিঁদের দলে থাকি'
মটর ছড়ায়ে পায়রাগুলোরে ছাদ হতে আনি ডাকি'।
চীনে করবীর ডালে ঝুল খেয়ে কেটে যায় সারা বেলা,
ভাই বোনে মিলি' শুধু গাছ-গাছ ফুল-ফুল করি খেলা।

পাশ ফেল

শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

নিখিলের জীবনে মস্ত সমস্যা দেখা দিয়েছে। কি করবে নিখিল ভেবে পায় না আর রাগে দুঃখে অভিমানে হতাশায় তার দু'চোখে জল এসে পড়ে। পরীক্ষা কাছে এগিয়ে আসছে, এখন থেকে মন দিয়ে পড়াশোনা করা দরকার, কিন্তু এরকম মানসিক অবস্থায় কেউ পড়াশোনায় মন দিতে পারে? পরীক্ষাই হয়তো এবার তার দেওয়া হবে না।

তিন দিনের মধ্যে পরীক্ষার ফিজ্‌ দাখিল করতে হবে। কোথায় পাবে সে ফি-এর টাকা?

দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়ের বাড়ীতে কোন রকমে ঘাড়গুঁজে থেকে আরও কয়েকজন আত্মীয় স্বজনের দয়ায় কোন রকমে এতদিন সে পড়ার খরচটা চালিয়ে এসেছে। আত্মীয়টি ইচ্ছা করলে পরীক্ষার জন্য দরকারী টাকাটা অবশ্য দিতে

পারেন কিন্তু তিনি স্পষ্টই বলে দিয়েছেন একসঙ্গে অত টাকা দেবার ক্ষমতা তাঁর নেই। নিখিলকে যে সিঁড়ির ঘরটাতে থাকতে দেন আর দু'বেলা খেতে দেন, তাই তিনি যথেষ্ট মনে করেন। অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের কাছেও নিখিল দরবার করেছে। তাঁদের প্রত্যেকেই নিজের অক্ষমতা জানিয়েছেন আর সেই সঙ্গে মামা বলেছেন কাকার কাছে যেতে, কাকা বলেছেন পিসের কাছে যেতে।

নিখিলের ভাগ্যটাই খারাপ। তার যে ক'জন দূর সম্পর্কের আত্মীয় আছেন দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁদের প্রত্যেকের মনে একসঙ্গে এই ধারণার উদয় হয়েছে যে, নিখিলের পরীক্ষার খরচ যোগানোর দায়িত্বটা অন্যজন নেবেন না কেন?

টাকা না দিয়েও যাতে পরীক্ষা দিতে পারে সেজন্য নিখিল চেষ্টা করেছিল, তারও কোন ফল হয়নি।

এখন উপায়? আর তিনটি দিন সময় মাত্র হাতে আছে, তারপর টাকা যোগাড় করতে পারলেও কিছু লাভ হবে না। কত দুঃখ কষ্ট লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করে, প্রাণপণ চেষ্টায় কতশত কষ্ট অতিক্রম করে এতদিন সে পড়া চালিয়ে এসেছে—এখন তীরে এসে তরি ডুবল!

কেবল একজনের কাছে চেষ্টা করা বাকী আছে—সতীশবাবু। নিখিলের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই, নিখিলের বাপ বেঁচে থাকতে দু'জনের মধ্যে পরিচয় ছিল মাত্র। কিন্তু সতীশবাবুর কাছে, আবেদন জানিয়ে কোন লাভ হবে এ ভরসা নিখিলের নেই। ভদ্রলোক যেমন ধনী তেমনি কৃপণ,—বোধহয় আরও বেশী নিষ্ঠুর। একবার দু'টি টাকা সাহায্য চাইতে গিয়ে তাঁর সম্বন্ধে কতখানি আশা করা যায় সে বিষয়ে নিখিল পরিষ্কার জ্ঞান অর্জ্জন করে নিয়ে এসেছে।

তবু, আর কোন দিকে কোন উপায় দেখতে না পেয়ে নিখিলের আজ মনে হতে লাগল, সতীশবাবু কিছুই করবেন না জানা কথা, কিন্তু একবার চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি? আগেরবার সে যখন গিয়েছিল, হয়তো তখন সতীশবাবুর মেজাজ ভাল ছিল না। মনটা ভাল থাকলে হয়তো নিজের হাজার হাজার বাড়তি টাকা থেকে নিখিলের পরীক্ষার খরচটা দান করে ফেলবার উদারতা তাঁর জাগতে পারে।

অনেকক্ষণ ভেবে, অনেক ইতস্ততঃ করে, বেলা প্রায় ন'টার সময় নিখিল সতীশবাবুর প্রকাণ্ড বাড়ীর গেটে গিয়ে হাজির হল।

দোতালার একটি ছোট ঘরে সতীশবাবু সকালবেলা নিজের কাজ কর্ম করেন, হিসাব পত্র মেলান। এ বাড়ীতে নিখিলকে সবাই চেনে, যদিও বড়লোকের বাড়ীতে আসবার ভরসা হয় তার কদাচিৎ। দু'একজন শুধু জিজ্ঞাসা করল সে কেমন আছে। আর কেউ কোন প্রশ্ন করল না। নিখিল উপরে গিয়ে সতীশ বাবুর ঘরের ভেজানো দরজা ঠেলে ভিতরে প্রবেশ করল।

তখন তার বুক টিপ টিপ করছে। সতীশবাবু তার শেষ আশা, সতীশবাবু যদি সাহায্য করতে অস্বীকার করেন তবে তার আর পরীক্ষা দেওয়া হবে না। ঘরে ঢুকে সতীশবাবুকে না দেখে এক মুহূর্তের জন্য নিখিল একটু স্বস্তি বোধ করল। পরক্ষণে তার বুকের টিপটিপানি বেড়ে গেল শতগুণ।

টেবিলে খাতা আর কাগজপত্রের পাশে একতাড়া নোট পড়ে আছে।

ব্যাপারটা অনুমান করতে তার দেরী হল না। হিসাব মেলাতে মেলাতে সতীশ-বাবু দু'এক মিনিটের জন্য কোন দরকারে উঠে গেছেন—এখনই ফিরে আসবেন।

কিন্তু তাঁর ফিরে আসার আগেই নিখিল কয়েকটি নোট তুলে নিয়ে অনায়াসে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে পারে।

নিখিলের সমস্ত শরীর শিউরে উঠল, মাথা ঘুরে উঠল। মাথার মধ্যে কেবল একটি চিন্তা পাক খেতে লাগল যে, এ জগতে তার আপনজন কেউ নেই, চুরি করেই হোক আর ডাকাতি করেই হোক নিজের ব্যবস্থা নিজে করে নিতে না পারলে তার কোন উপায় নেই। সতীশবাবুর এত টাকা আছে, চাইলে সতীশবাবু একটি পয়সা দেবেন না, এরকম অবস্থায় তার দরকারী কয়েকটা টাকা টেবিলের নোটের তাড়া থেকে তুলে নিলে কি আসে যায়? এরকম নিরুপায় অবস্থায় একটিবার, জীবনে শুধু একটিবার, চুরি করা এমন কী মহাপাপ?

চেয়ে সতীশবাবুর কাছে সাহায্য পাবার সামান্য একটু ভরসা থাকলে, কি কাজ সে করতে যাচ্ছে ভাল করে ভেবে দেখবার সময় পেলে নিখিল হয়তো প্রলোভনটা জয় করতে পারত। কিন্তু কয়েক সেকেণ্ডের বেশী ভাববার সময় ছিল না। কেবল তার দরকার যাতে মিটবে অনেকগুলি নোট থেকে কেবল সেই ক'খানা নোট নিয়ে নিখিল ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পরদিন সকালে প্রায় সেই সময় সতীশবাবু সেই ঘরে বসে কাজ করছিলেন, ভেজানো দরজা খুলে চোরের মত নিখিল ঘরে ঢুকল।

সতীশবাবু গম্ভীর মুখে কর্কশ কণ্ঠে বললেন, 'কি চাই ?'

নিখিল কথা বলতে পারল না। নীরবে কয়েকখানা নোট সতীশবাবুর সামনে রেখে দিল।

'কিসের টাকা ?'

'কাল চুরি করেছিলাম।'

'তা জানি। ফেরত দিচ্ছ কেন ?'

নিখিল মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। কি বলবার আছে তার ?

সতীশবাবু খানিকক্ষণ নিখিলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর তিনি যখন কথা বললেন, মনে হল গলাটা যেন অনেক কোমল হয়ে এসেছে।

'টাকাটা কেন চুরি করেছিলে নিখিল ?'

নিখিল জড়িয়ে জড়িয়ে কোনরকমে মোটামুটি ব্যাপারটা বলল। প্রতি মুহূর্তে তার ইচ্ছা করছিল, বিকট একটা আর্তনাদ করে ঘর থেকে ছুটে কোন বনে জঙ্গলে পালিয়ে যায়।

সতীশবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'অন্য কোথা থেকে পরীক্ষার টাকা পেয়েছ ?'

'না।'

'তবে টাকাটা যে ফেরত দিচ্ছ ?'

'পরীক্ষা দেব না।'

সতীশবাবু আবার কিছুক্ষণ ভাবলেন।

'আমার কাছে না চেয়ে চুরি করলে কেন ?'

নিখিল চুপ।

'চাইলে আমি দেব না ভেবেছিলে, না ?'

নিখিল এবারও চুপ।

'কিন্তু দ্যাখো, এবার না চাইতেই দিচ্ছি নিখিল। দান করছি ভেবো না কিন্তু, ধার দিচ্ছি। এবার থেকে আমি তোমার সব পড়ার খরচ চালাব, তুমি আমার এখানে থাকবে। পড়াশোনা শেষ হলে তোমায় আমার একটা কাজে লাগিয়ে তোমার মাইনে থেকে সব শোধ করে নেব। কেমন ?'

নিখিল সজল চোখ বুজে শুধু ঘাড় নেড়ে সায় দিল।

হালখাতা

শ্রীরাধারাণী দেবী ("লীলাকমল" রচয়িত্রী)

হালখাতা ব্যাপারটি কেবলমাত্র ব্যবসায় বাণিজ্য সম্পর্কিত ক্ষেত্রেই যে আবদ্ধ তা' নয়। সাহিত্যে, শিল্পে, সমাজে, রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সর্বত্রই হালখাতার প্রবর্ত্তন দেখা যায়। বিপুল পৃথিবীর বুকে এই বহুবিচিত্র মানব সভ্যতারও হালখাতা বারংবারই সম্পাদিত হয়ে এসেছে। তাই আজকের পৃথিবীর পানে তাকিয়ে মনে হয়, বর্ত্তমান শতাব্দীর রাষ্ট্র, সমাজ ও সভ্যতার মজবুত খাতাখানি ভিতরে ভিতরে অনেকটাই কীটদষ্ট ও জীর্ণ হয়ে পড়েছে। আর বুঝি সংশোধন করে পাতা উলটে এর দ্বারা কাজ চালানো সম্ভব নয়। এবার ইতিহাসের উঁচু শেল্‌ফে একে তুলে রেখে দিয়ে, সম্পূর্ণ নূতন মলাটে নূতন পাতা বেঁধে হালখাতা প্রবর্ত্তন হবে হয়তো বা।

সংসারে বড় কিছু এবং নূতন কিছু লাভ করতে হলে তার উপযুক্ত মূল্য দিতেই হয়। মানুষ আজ পর্য্যন্ত বৃহৎ এবং মহৎ যা-কোনও-কিছু লাভ করতে পেরেছে, তাকে দিতে হয়েছে তার পরিবর্ত্তে ত্যাগ দুঃখ ও পরিশ্রম। দুঃখের মূল্য ব্যতিরেকে আজও কোনও মহৎ কল্যাণ সাধিত হয়নি। আজ পশ্চিমে যে ধ্বংস-অনল হোমে বিরাট মারণ-যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হচ্ছে, এই অশুভের অন্তে কোনও পরমশুভের অভ্যুদয় কি সম্ভব মনে হয় না ?

যে দুঃখ বেদনা, যে বিরাট ক্ষতি, বিপুল ত্যাগ ও অবর্ণনীয় কষ্টস্বীকারের মধ্য দিয়ে আজ সমগ্র য়ুরোপবাসীদের প্রচণ্ড অগ্নিপরীক্ষা চলেছে এর পরিশেষে অগ্নিশুদ্ধ য়ুরোপ কি এবারে যথার্থই ভিত্তিমূলক সত্যের (Fundamental truth) উপরে রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করে শান্তিমন্ত্র উচ্চারণ করতে পারবে না ? স্বর্ণ অরুণোদয়ের পূর্ব্বে গাঢ় অন্ধকারেরই মত আজকের এই অকল্যাণ-কুটিল ভয়ংকর ভাঙনলীলা হয়তো কল্যাণ-সুন্দর নব সংগঠনেরই পূর্ব্বভূমিকা। পাশ্চাত্য দেশের জড়বাদী সভ্যতা, ধনতন্ত্র, রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে যে গুরুতর ত্রুটী, বঞ্চনা ও অন্যায় আছে, বর্ত্তমান মহাসমর তারই প্রত্যক্ষ নিদর্শন এবং অবশ্য প্রতিফল মাত্র।

করায়ত্ত ক্ষমতার অপব্যবহারে মানুষ অন্য মানুষকে তার সহজ অধিকার হতে বঞ্চিত করে। এই অপরকে বঞ্চিত করার ব্যবস্থা উত্তরোত্তর কঠোর হতে কঠোরতর করতে করতে একদা মানুষ ভুলে যায় যাদের প্রতি এই অবিচার চলেছে তারাও তাদেরই মত মানুষ। ব্যষ্টি মানবের সামান্য স্বার্থের প্রয়োজনে সমষ্টি মানবের পরম স্বার্থ নিষ্ঠুরভাবে বলি পড়তে থাকে। ক্রমে সহ্যের সীমা অতিক্রম করলে সেই উৎপীড়িত মানব সমাজে আপত্তিসূচক মনোভাব আপনিই জাগ্রত হতে থাকে। এই স্বতোস্ফূর্ত্ত বিরুদ্ধ মনোভাবই বিদ্রোহ। একে প্রচলিত ব্যবস্থা ভস্মীভূত করণের অনলকণা বলা চলে। বিপ্লবরূপ অগ্নিকাণ্ড অথবা আমূল পরিবর্ত্তন এরই অবশ্য পরিণতি মাত্র।

ইতিহাসে অষ্টাদশ শতাব্দীতে আমরা রাষ্ট্রীক হালখাতা উৎসব দেখতে পাই 'ল্যুই' রাজবংশের রক্তরঞ্জিত ফ্রান্সে। বহু উৎপীড়ন, অত্যাচার, লাঞ্ছনা ও দুঃখের বিনিময়ে ফরাসী বিপ্লবরূপে রাষ্ট্রব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন সম্ভবপর হয়েছিল। তাই দুই শতাব্দী পরে আবার রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার এক বিরাট হালখাতা উৎসবের পানে সমস্ত পৃথিবী সচকিত বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল রাশিয়ার বিস্তীর্ণ ভূভাগে।

একদা পৃথিবীর একাংশে যে উৎপীড়িত, বঞ্চিত, মূক মানব সমাজের প্রবল বেদনার মধ্য হতে গণআন্দোলন জন্মগ্রহণ করেছিল,—সেই গণআন্দোলন শিশু ফরাসী বিপ্লবের মধ্যে তার ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রয়োজন কেবলমাত্র ইঙ্গিতে প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছিল। তখনও তার ভাষাস্ফূর্ত্তি ঘটেনি। প্রকাশের ক্ষমতা সুস্পষ্ট এবং শক্তি সংহত হয়ে ওঠেনি। ফ্রান্সের বাক্‌শক্তিহীন শিশু পেয়েছে রাশিয়ার কোলে বাক্যস্ফূর্ত্তি। তাই রাশিয়ার গণআন্দোলন কেবলমাত্র রাষ্ট্রীকক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রইল না, সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তিতেও প্রচণ্ড আঘাত হেনে সম্পূর্ণ নূতন সমাজের ভিত্তিপত্তন দাবী করল। কিন্তু আজও পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই অধিকাংশ মানুষ অল্পসংখ্যক মানুষের প্রবল চাপে মানুষের সহজ অধিকার স্বাভাবিক পাওনা হতে বঞ্চিত হয়ে আছে। তাই পৃথিবীতে মানুষের নিজের তৈরি সমাজে নিজেদের বিভেদ বৈষম্য, দুঃখ ও অসন্তোষের অন্ত নেই।

বর্ত্তমান য়ুরোপের চরম দুঃখ দুর্দ্দশাময় দুর্দ্দিনের পানে তাকিয়ে তাই মনে হয় না কি—সাম্য স্বাধীনতা ও মৈত্রীর আদর্শ বহন করে যে শিশু একদা ফ্রান্সের

শোণিতরঞ্জিত রাজপথে জন্মগ্রহণ করে ক্রমশঃ রাশিয়ার মহাপ্রান্তরে যে স্ফুটবাক্ হয়ে উঠেছে, আজ সমগ্র য়ুরোপের পরম দুঃখের অভিজ্ঞতার মধ্যে সে কি তার সুস্পষ্ট বাণী উচ্চারণ করে ক্রমপরিণতির পথে অগ্রসর হয়ে আসবে না ?

এই বিংশ শতাব্দী কি বিশ্বব্যাপী সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় নূতন হালখাতা আনতে অসমর্থ হবে ? বহ্নিবিক্ষুব্ধ য়ুরোপের পানে তাকিয়ে কবির বাণী মনে জাগে না কি—'If winter comes will spring be far behind ?'

আশ্চর্য্য !

শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

হাবুর মাথায় সত্যিই কিছু নেই। একপায়ে লাফিয়ে তিনটে ঘর পার হওয়া কী এমন কঠিন কাজ ? অথচ সে কিনা দু' দুবার মাঝখানকার দাগে পা ফেলে মোর হল ! বিরক্ত হয়ে মণ্টু দিলে তার মাথায় এক গাঁট্টা বসিয়ে।

মণ্টুর গাঁট্টা, বুঝতেই পারছো, কি লাগানটা লেগেছিল ! হাবু হাউমাউ করে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলো। মণ্টু এ রকমটার জন্যে প্রস্তুত ছিল না, সে ওকে মারতেও চায়নি—চেয়েছিল একটু সংশোধন করে দিতে। কিন্তু সংশোধনটা নিজের অজান্তেই বড় বেশী কড়া হয়ে পড়লো। বেগতিক দেখে সে সড়াৎ করে সামনের জাম গাছটায় উঠে, পাতার আড়ালে লুকিয়ে পড়লো।

কারণটা আর কিছুই নয়, হাবুর পিসিমা খ্যান্তমণি জলের কলসী কোমরে নিয়ে পুকুর থেকে উঠে আসছেন। এই খান্তমণিকে গাঁয়ের বুড়োরা পর্য্যন্ত বাঘের মতো ভয় করে, ছেলেরা ত কোন ছার। যেমন তাঁর গলার আওয়াজ, তেমনি ঝগড়ার দম। তাঁর সামনে পড়লে মণ্টুর আজ আর রক্ষে ছিল না। না লুকিয়ে সে আর করে কি ?

পুকুরপাড়ে উঠে হাবুকে কাঁদতে দেখেই খ্যান্তমণি কোমর থেকে কলসী নামালেন, তারপর টান করে আঁচলটা কোমরে জড়িয়ে নিয়ে হাঁক ছেড়ে বললেন, কিরে হেবো, হয়েছে কি ?

—মণ্টু মাথায় মেরেছে।

—মেরেছে? কেন? তার এত দাপট বাড়লো কিসে?

—শুধু শুধু। দু'জনে খেলছিলাম······

—কোথায় গেল সে আবাগের ব্যাটা?

কান্নার ঝোঁকে হাবু লক্ষ্যই করেনি মণ্টু কোথায় পালিয়েছে। মণ্টুকে ত সে জানে। মার লাগিয়েই সে সিধে ষ্টেসনের পথ ধরে দৌড় দেয়, তারপর সুবিধে মতো আবার পাড়ায় ফিরে আসে। কাঁদতে কাঁদতে হাবু বললো, এষ্টেশনের দিকে পালিয়েছে······

—পালিয়েছে? পালানো বেরুবে আজ তার। দেখিস তুই আজ, সে রেলে কাটা পড়বে, পড়বে, পড়বে। হে মা কালী, হে মা ভৈরবেশ্বরী, আমার দুধের বাছাকে যেমন মেরেছে, তেমনি মণ্টা মুখপোড়া যেন আজ বাড়ী না ফেরে।

মনের সুখে গলা ফাটিয়ে খ্যান্তমণি শাপ দিচ্ছেন, হঠাৎ এক গাদা কাপড় এক হাতে, আর এক হাতে একটি জলের বালতি নিয়ে সামে এসে দাঁড়ালেন আন্নাকালী। কে তিনি জানো না নিশ্চয়! মণ্টুর মাসীমা।

বাঘের মতো গজরিয়ে তিনি বললেন,—কেন রে হতচ্ছাড়ী, তোর হেবো থাকনা চুলোয় মুখ দিতে। মণ্টু তার মায়ের কোল জুড়ে থাক। তাকে কেন তুই গাল্ দিবি রে?

খ্যান্তমণি প্রথমটা থতমত খেয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তক্ষুণি সাম্‌লে নিয়ে বললেন, বেশ করবো দোব। আমার হাবুকে সে মারবে কিসের জন্যে?

—বেশ করবি দিবি? তাহলে সেদিন যে টাকা ধার নিয়েছিস, আগে তা ফেরৎ দে। দে বলছি, নইলে তোর হেবোর মাথা খাবি।

—এত বড় কথা বলিস? মনে নেই গেল বছর ক'সের ময়দা ধার নিয়েছিলি? এখন বুঝি হজম হয়ে গেছে, তাই বড়লোকী দেখাচ্ছিস!

এই হতে হতেই ঝগড়া পাকিয়ে উঠলো। তুমুল ঝগড়া। দু'জনে টান করে খোঁপা বেঁধে, কোমরে আঁচল সাপ্টে, হাত নেড়ে, গলা ছেড়ে সুরু করলেন দু'জনকে গালাগালি। এমন চীৎকার আর আস্ফালন চলতে লাগলো যে মুখুজ্যে পাড়ার সমস্ত বাড়ী খালি করে মেয়ে-পুরুষে রাণীপুকুরের কিনারায় এসে জড়ো

হল। হাবুর ত চক্ষু স্থির! ভয়ে ভয়ে কখন সে সটকে পড়েছে কেউ দেখতেই পায়নি।

দেখতে দেখতে একটি দু'টি করে লোক হয় এদিকে, নয় ওদিকে যোগ দিতে দিতে ঝগড়াটা ক্রমে একটা যুদ্ধের মতো চেহারা ধরলো। হাবু আর মণ্টুর কথা কোথায় গেল চাপা পড়ে, ঝগড়াটা চলতে লাগলো আন্নাকালী আর খ্যান্তমণির দোষ গুণ নিয়ে। দু'জনের কে কবে কা'কে কি বলেছে, কার কবে কি ক্ষতি করেছে, তাই নিয়ে দুই দলে চলতে লাগলো হৈ হৈ রৈ রৈ কাণ্ড।

বুড়ো চক্রবর্ত্তী মশায় দূরে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিলেন আর মধ্যে মধ্যে দুই দলকেই থামতে বলছিলেন। কিন্তু ঝগড়ার উৎসাহে কেউই তাঁর কথায় কান করে নি।

হঠাৎ বুড়ো চেঁচিয়ে উঠলেন,—ঐ দেখ, ঐ দেখ!

সবাই তাকিয়ে দেখে রাণীপুকুরে উল্টোপাড়ে রায়েদের মটরশুটির ক্ষেতের পাশ দিয়ে একটা ন্যাকড়ার ফালি মুখে নিয়ে ছুটছে মণ্টু আর তার পেছনে দড়ি ধরে, হাতে একটা কঞ্চি নিয়ে ঘোড়া চালাচ্ছে হাবু।

ঝগড়া সঙ্গে সঙ্গে গেল থেমে।

খ্যান্তমণি কলসী কোমরে তুলে নিলেন। বললেন, বেহায়া হতভাগা!

আন্নাকালী কাপড়গুলো গুছিয়ে নিয়ে পুকুরের দিকে পা বাড়ালেন। যাবার সময় বলে গেলেন, গলায় দড়ি জোটে না অমন ছেলের!

বুড়ো চক্রবর্ত্তী মশায় শুধু হাসলেন। বললেন, যাদের ঝগড়া তারা ত কোন্ কালেই মিটিয়ে ফেলেছে, কিন্তু তোমরা যে মরলে লড়াই করে এ কে মেটাবে?

চোর—

শ্রীসুশীল রায়

ছেলেমেয়েদের ছুটোছুটি লাফালাফি আর চেঁচামেচিতে কিছুক্ষণ আগে পর্য্যন্তও বাড়িটা ছিলো সরগরম, হঠাৎ সব উৎসব থেমে গিয়ে বিষাদের স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া বাড়িটা ঘেরাও করেছে। প্রত্যেকের চোখেমুখে এখন উৎকণ্ঠা ও বেদনার ছায়া। প্রত্যেকেই গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসেছে। কী সাংঘাতিক কথা! এমন অঘটন কি মানুষের ঘটে! মিনুর আজ জন্মদিন, এমন দিনে তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সে তো কোথাও যাবার মেয়ে নয়। তবে গেলো কোঁথায়?

বেলা আড়াইটে পর্য্যন্ত তার সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। মদন চাকর নাকি তাকে তেতলার সিঁড়িতে তুলোর বস্তার আড়ালে জড়োসড়ো হয়ে ব'সে থাকতে দেখেছে। মদন তার দিকে তাকাতেই সে নাকি তাকে ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে কথা না বলতে ইঙ্গিত করেছিলো। তারপর মদন তাকে আর ছাখেনি।

বুড়ি চাকরাণী হর্ষবালা বললো, বেলা দেড়টা নাগাদ—

মিনুর মেজদা তাকে ধমক দিয়ে উঠলো, বললো, দেড়টার খবর দিয়ে হবে কি? শুনছো, মদন তাকে আড়াইটের সময়—

মিনুর মা ছল্‌ছল্‌ চোখে তাকিয়ে বললেন, দেড়টার সময় কোথায় দেখলি হর্ষ?

—তোমার ঘরে, মা। মনা, শৈল, হাস্না,—ওদের সঙ্গে কি নিয়ে তর্ক করছিলো।

ছেলেমেয়েরা মিনু-বিভ্রাটে নিজেরাই অপরাধী হয়েছে, তাদের ডাকা হলো। ভয়ে ভয়ে তারা এসে দাঁড়াতেই চারিদিক থেকে প্রশ্ন আরম্ভ হলো। তাদের উত্তর থেকে বোঝা গেল, তখন তাদের তর্ক হচ্ছিলো চোর-বিভ্রাট নিয়ে। প্রথমে মিনুকে সকলে চোর হতে বলে, মিনু তাতে রাজি হয় না। তখন ঠিক হলো লটারি হবে। কাগজের টুকরো কেটে কেটে তাতে প্রত্যেকের নাম লিখে মুড়ে ফেলা হয়। চোখ বুজে মিনু যেই একটা কাগজের টুকরো তুলেছে, দেখা গেলো

তাতে মিন্নুরই নাম লেখা। অতএব মিন্নু চোর হলো। অনেকক্ষণ মিন্নু নাকি চোর ছিলো—কিছুতেই কাউকে খুঁজে পায় না, খুঁজে পেলেও ছুঁতে পারে না। মিন্নু নাকি এতে খুব রেগে যায়, তারপর অনেক কষ্টে সে শৈলকে ছুঁয়ে ফেলে।

গবেষণার পর স্থির হলো, মদনের সঙ্গে তেতলার সিঁড়িতে তাহলে শৈল চোর হবার পর মিন্নুর দেখা হয়।

সিঁড়িটাই তাহলে আবার ভালো করে খোঁজা হোক্। পুরণো ভাঙা ছাতির বাণ্ডিল, ছেঁড়া জুতোর স্তূপ, রঙচটা ভাঙা টিনের বাক্স, তুলোর বস্তা—সব ওলোট পালোট ক'রেও মিন্নুকে পাওয়া গেল না। সকলে ছাতে গিয়ে দেখলো ছাত ফাঁকা। তবুও চেষ্টার ত্রুটি করতে কেউ রাজি নয়; ছাতের রেলিঙে ভর দিয়ে সকলে বাড়ীটার চারিধার তদন্ত করলো। একপাশে পুকুর, একপাশে ফুলের বাগান, আর দু'পাশে রায়বাহাদুরের বাসা ও সদর রাস্তা। রেলিঙ টপ্‌কে জলে বা জঙ্গলে পড়েনি তো মিন্নু? দুদ্দুড় ক'রে কেঁপে উঠ্‌লো সকলের বুক, দুদ্দাড় শব্দে সবাই নেমে এলো একতলায়।

রাত ন'টা বেজে গিয়েছে। গেলো কোথায় মেয়েটা! প্রায় সাত ঘণ্টার কথা, তার কোন খবর নেই। এমন অবস্থায় নিশ্চেষ্ট হয়ে কেউ বসে থাকতে পারে না। কিন্তু চেষ্টা করার জায়গাই-বা কোথায়? মিন্নু তো কোথাও যায় না, সে তো কোথাও যাবার মেয়ে নয়!

পুকুরে যদি পড়েই থাকে, কি করে এখন খোঁজা যায়? ফুলের বাগানটা অযত্নে প্রায় জঙ্গলে পরিণত হয়েছে, টর্চ নিয়ে মিন্নুর বড়দা, মেজদা ও হেমন্ত-মামা বাগানের ঝোপঝাপ খুঁজতে আরম্ভ করলো। মিন্নুকে পাওয়া গেলো না বটে, কিন্তু তার অতি আদরের ডল-টি পাওয়া গেলো—হাত-পা ছেঁড়া ও মুখ তোবড়ানো অবস্থায়।

মিন্নুর মা এবার একটু শব্দ করেই কেঁদে উঠ্‌লেন, বললেন, ও তবে বাগানেই পড়ে আছে। আবার খোঁজ তোরা, ভাল করে খোঁজ। এ পুতুল তো সে কখনো কোল-ছাড়া করেনি।

হান্না ভয়ে ভয়ে বললো, না, মনাদার কাছে পুতুলের একটা হাত ছিঁড়ে গিয়েছিলো। তাই রাগ করে সব হাত-পা ছিঁড়ে ফেলে পা দিয়ে মাড়িয়ে রাঙাদিই ওটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলো।

—কখন? সেজদা, হেমন্তমামা ও মা একসঙ্গে প্রশ্ন করলেন।

অস্পষ্ট গলায় হান্না বললো, আমি যখন চুপ করে বসেছিলাম।

—সে কখন? কখন তুই চুপ করে বসেছিলি?

হান্না কাঁদ-কাঁদ হয়ে বললো, যখন রাঙাদি পুতুল ভেঙে ফেললো।

হান্নার উত্তরের নমুনা দেখে সেজদার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটলো। তিনি হান্নার গালে সজোরে একটি সশব্দ চড় মেরে বললেন, এখন সাধু সাজা হচ্ছে সব। চুপ করে বসেছিলাম! চুপ করে যদি বসেই ছিলি, তবে গেলো কোথায় মিন্থু? বল্, বল্, শিগ গির রাস্‌কেল!

হান্না আরও একটা চড় খেতো, কিন্তু হেমন্তমামা বাধা দিলেন। সহজ গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে তিনি বললেন, ক্ষেপলে নাকি শিবু? ও-সব রেখে এক কাজ করো—তুমি থানায় যাও! মিথ্যে সময় নষ্ট করো না। দ্যাখো, রাত ক'টা।

হাত-ঘড়িটা হেমন্তমামা সেজদার মুখের কাছে তুলে ধরলেন।

বড়দা পাশ থেকে উঁকি দিয়ে বললেন, Is it? ন-টা চল্লিশ? শিবু, শিগ গির যা তুই থানায়। আমি হস্‌পিটাল ক'টায় ফোন্ করি। চেহারার ডেস্‌ক্রিপশান্ দিবি। কপালের ডান দিকে কাটা দাগ আছে, মনে আছে তো,—চোখ কটা, রং ফর্সা। ভুলিস্ নে! আর ইয়ে—পরণে, ও মা শুনছো, পরণে নেভি-ব্লু ফ্রক্ ছিলো, তাই না? যা, যা তুই। আরে, পঁয়তাল্লিশ হতে চললো যে!—পৌনে দশ কি সোজা রাত নাকি?

সেজদা তৎক্ষণাৎ ছুটে বেরিয়ে গেলো। এদের চাঞ্চল্য ও ব্যস্ততা দেখে মা আতঙ্কে নীল হয়ে যেতে লাগলেন। তাঁর কাঁদা উচিত, কি, স্থির হয়ে থাকা উচিত—এ বিষয়ে তিনি মনস্থির করতে পারলেন না। তাঁর বুকের আন্দোলন দ্রুত হয়ে উঠতে লাগলো। চোখের সমুখে বীভৎস দৃশ্য সব ভেসে ভেসে উঠতে লাগলো। জন্মদিনের উৎসবায়োজন সম্মুখে নিয়ে তিনি অমঙ্গল কথা ভাবতে লাগলেন। কি কি জিনিষ সে ভালবাসতো, তার আদরের জিনিষ ছিলো কি কি, কবে তিনি অযথা তাকে ধমক দিয়েছিলেন—ইত্যাদি নানা কথা ভেবে মনে মনে তিনি অনুতাপ করছেন। জন্মতিথির আয়োজন প্রস্তুত! কিন্তু সে কই—যাকে উপলক্ষ ক'রে এই বন্দোবস্ত? মিন্থুর বন্ধুরা নিমন্ত্রিত অতিথি-

রূপে সেজেগুজে প্রস্তুত হয়ে এসে অপ্রস্তুত মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে—মা তাদের বসতে বলতে পর্য্যন্ত ভরসা করছেন না!

নিজের ঘরে মেজেতে তিনি বসে আছেন চুপচাপ, মাঝে মাঝে কাপড়ের আঁচল দিয়ে চোখের কোণ পরিষ্কার করছেন। কেউ কেউ তাঁর পাশে বসে আছে, কেউ-বা খাটের ওপর বসে নীরব হয়ে আছে।

হঠাৎ বারান্দার দেয়ালঘড়িটা ঢং ঢং করে বেজে উঠতেই মা বিচলিত হ'য়ে উঠলেন। এমন সময় বড়দা দরজা দিয়ে উঁকি দিতেই মা চেঁচিয়ে উঠলেন, পেলি খোঁজ? হাঁসপাতাল কি বললো? বল্ শিগ্‌গির, গোপন করিস্‌নে। কতক্ষণ আমার কাছে গোপন রাখতে পারবি তোরা?

বড়দা বললেন, কেন যে তুমি বিশ্বাস করোনা—তা বুঝিনে ছাই! বলছি, তারা কোনো খোঁজ জানে না বললে। শিবু থানায় গেছে, ফিরুক্!

—হেমন্ত কই?

—হেমন্তমামাকে খবরের কাগজের আপিসে বিজ্ঞাপন দিতে পাঠিয়েছি! ব'লে দিয়েছি, পাঁচশো টাকা পুরস্কার দেব লিখো দিতে, যে খোঁজ দিতে পারবে তাকে। তুমি ভেবো না মা, চেষ্টার কিছু ত্রুটি হচ্ছে না। তুমি একটু বসো তো, বসো! ও কি, কেঁদে লাভ কি?

মা আর নিজেকে সংযত রাখতে পারলেন না, চীৎকার করে কেঁদে উঠলেন। যারা তাঁকে ঘিরে ছিলো এবং যারা খাটের ওপর ছিলো সকলেই তাঁর কান্নায় যোগ না দিয়ে পারলো না। এমন কি বড়দাও মায়ের হাঁটুর ওপর মাথা দিয়ে ফোঁপাতে লাগলেন।

একে মশার কামড়, তার ওপর এই চীৎকার,—এতে ঘুম কা'র না ভাঙে? প্রকাণ্ড ট্রাঙ্ক ডিঙিয়ে, বড় স্যুটকেস্‌টির পাশ কাটিয়ে খাটের তলা থেকে মিন্টু মুখ বার করলো। কপালে তার কাটা দাগ ও চোখ দু'টি কটা—প্রথমেই সকলের চোখে পড়লো। তারপর ধীরে ধীরে নেভি-ব্লু, ফ্রক সুদ্ধ সে বাইরে বেরিয়ে এসে সমুখে শৈলকে পেয়ে বললো, কেমন মজা! বলিনি, সারাদিন তোকে চোর করে খাটাবো!

ইসান দৌলৎ বেগম

এস, ওয়াজেদ আলি, বি. এ. (কেণ্টাব), বার-এট-ল

সুলতান বাবরের নাম তোমরা অবশ্যই শুনেছ। তিনি ছিলেন মহামতি সম্রাট আকবরের পিতামহ। ভারতের মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি তিনিই স্থাপন করেন। আকবর অনেকাংশে তাঁরই পদাঙ্কের অনুসরণ করেন। তিনি যেমন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা ছিলেন, উদারতায় এবং রাজনীতি জ্ঞানেও তেমনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্রাটদের মধ্যে তিনি একজন। এই অসাধারণ মহাপুরুষ যে তাঁর বীরত্ব এবং চরিত্রের দৃঢ়তা অনেকাংশে তাঁর পিতামহী বীরনারী ইসান দৌলৎ বেগমের নিকট থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন নিম্নলিখিত ঘটনা থেকে স্পষ্টই তা বোঝা যায় :—

বাবরের পিতামহ ইউসুফ খাঁ সমরকন্দের বাদশা ছিলেন। শেখ জামাল তাঁকে যুদ্ধে পরাজিত করে বন্দী করেন। তাঁর বেগম, বাবরের মাতামহী ইসান দৌলৎ বেগমও শেখ জামালের হস্তগত হল। বৈরী-নির্য্যাতনের উদ্দেশ্যে শেখ জামাল তাঁর প্রিয় এক সেনানীর সঙ্গে জবরদস্তি ইসাম দৌলৎ বেগমের বিবাহ দেবার সঙ্কল্প করেন।

প্রভুর আদেশ মত সেনানী, বেগম সাহেবের পাণিগ্রহণের জন্য, যথাসময়ে তাঁর মহলে উপস্থিত হলেন। বেগম সাহেব সেখানেই 'নজরবন্দী' ছিলেন। বিজেতার উদ্দেশ্যের বিষয় অবহিত হয়ে সাদরে তিনি সেনানীর অভ্যর্থনা করলেন। অভ্যর্থনার বহর দেখে সেনানী মহাশয় আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। একজন বাংলার পরমাসুন্দরী মহিষীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হবে, এর চেয়ে সৌভাগ্য আর কি হতে পারে ?

যথা সময়ে সেনানী মহাশয়কে বেগম সাহেবের কক্ষে উপস্থিত করা হল। বেগম সাহেব পরিচারিকাদের আদেশ করলেন, "সব দরওয়াজা বন্দ করো।" আদেশ অবিলম্বে প্রতিপালিত হল। তারপর যা হল, সেনানী মহাশয় তা'র জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। বেগম সাহেব এবং তাঁর পরিচারিকার দল ছোট ছুরিকা হস্তে ভীমবেগে তাঁকে আক্রমণ করলেন। বিবাহের বাসর মৃত্যু শয্যায় পরিণত হল। বেগম সাহেবের আদেশ অনুযায়ী সেনানীর মৃতদেহ রাজপথে নিক্ষিপ্ত হল।

সহরময় হুলস্থূল পড়ে গেল। শেখ জামাল পরিস্থিতির বিষয় অবিলম্বে অবহিত হলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি দূতহস্তে বেগমের এই আচরণের জন্য জবাব তলব করে পাঠালেন। দূতকে সম্বোধন করে আধকম্পিত কণ্ঠে বেগম বললেন, "আমি হচ্ছি ইউসুফ খাঁর ধর্ম্মপত্নী। পবিত্র আইন অমান্য করে শেখ জামাল আমাকে পরপুরুষের হস্তে সমর্পণ করেছিলেন। আমি সেই অনাচারীকে হত্যা করেছি। শেখ জামালের যদি ইচ্ছা হয়, তিনিও আমাকে হত্যা করতে পারেন।"

শেখ জামাল প্রকৃতপক্ষে নীচমনা লোক ছিলেন না। ইসান দৌলৎ বেগমের চরিত্রবল, বীরত্ব এবং পতিভক্তি দেখে তিনি বিস্ময়ে অভিভূত হলেন। আর স্বামীর সঙ্গে বাস করবার অনুমতি দান করে তাঁর প্রতি তিনি অন্তরের শ্রদ্ধা প্রকাশ করলেন।

পথিক

—কাদের নওয়াজ

আমি পথিক, পথ-চলা মোর কাজ,
কাটল পথে কতই সকাল সাঁঝ।
সামনে পেলাম কতই 'সরাই-খানা,'
বহুলোকের সাথেই হ'ল জানা।
বন্ধু অনেক আস্‌ল কাছে হেসে,
'মারীচ' যেন স্বর্ণ-মৃগের বেশে।
এম্‌নি তারা বিশ্বাসী-অন্তর,
ঠিক যেন হায় চোরা-বালির চর।
ভীষণ আঁধার, পথ যে উঁচুনীচু,
ঘুরতেছিলেম দূর-আলেয়ার পিছু।
এম্‌নি সময় কে কাছে মোর এসে,
ক্ষত দেহে হাত বুলালো হেসে।

যেন সে মোর অনেক কালের চেনা,
আজকে হ'ল চোখের লেনা-দেনা।
জানি তোমায় ভুল্‌বনাক' কভু,
হয়ত তুমি ভুল্‌বে আমায় 'নবু'—
তবু আমার এই শবরীর হিয়া,
থাকবে চেয়ে তোমার স্মৃতি নিয়া।
তোমার লাগি হৃদ্‌-কুসুমের হার,
গাঁথবে সে যে, আর সে উপহার—
দেবেই দেবে তোমার চরণ তলে,
সব অভিমান টুট্‌বে নয়ন জলে।
সেদিন লাগি, গাই সখা আজ গীতি,
অনাগত কালের লহ প্রীতি।

টাকা

শ্রীসঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

জানো ত টাকার জন্যে মানুষ সব কিছু করতে পারে? তোমরা হয়ত বল্‌বে যারা ঘোরতর সংসারী লোক তারাই শুধু টাকা টাকা করে। কিন্তু তা নয়। যেকালে আমাদের দেশে খুব বড় সব মুনি-ঋষি ছিলেন, আমরা যে সময়টাকে বলি ভারতবর্ষের সোনার দিন, তখনও একজন ঋষি টাকার জন্যে কি কাণ্ড করেছিলেন তারি একটা গল্প শোনো। তখন অবিশ্যি টাকা বল্‌তে এমন রূপোর চাকৃতি বোঝাত না। টাকার কাজ চালানো হ'ত গরু দিয়ে। অবাক হচ্ছ? গরু আবার টাকা হয় কি করে ভেবে? বুঝিয়ে দিচ্ছি। টাকা দিয়ে আমরা কি করি, ওটার বদলে আমরা নানারকম জিনিষ পেতে পারি—এইত? ঠিক তেমনি তখনকার দিনে লোকেরা গরুর বদলে তাদের দরকারী জিনিষপত্র সওদা করত। কাজেই গরুই ছিল তখন টাকা।

যাক্‌গে—এখন গল্পটাতে আসা যাক।

হরিশ্চন্দ্র রাজার আর ছেলে হয় না, মনে ভারি দুঃখ তাঁর। নারদ এসে বল্‌লেন,—বরুণদেবের পূজো কর, তাঁর বরে ছেলে পাবে। রাজার প্রার্থনায় বরুণদেব বল্‌লেন,—ছেলে তোমার হ'বে, কিন্তু জেনো, তাকে আমি বলি চাই। রাজা বল্‌লেন,—তাই দোব। হরিশ্চন্দ্রের ছেলে হল; বরুণদেব এসে ওকে বলি চাইলেন। রাজা হাতজোড় করে বল্‌লেন, আরেকটু বড় হয়ে নিক ও। 'বড় হয়ে নিক' এই ধূয়ো ধরে রাজা বরুণদেবকে অনেক দিন ভাড়িয়ে চল্‌লেন। ছেলের নাম হল রোহিত। তারপর রোহিত যখন সত্যিকারের বড় হল রাজা ভাবলেন এবার ওকে বলি দেবেন। তাই না বুঝতে পেরে রোহিত দিলে চম্পট।

বলি না পেয়ে চটেমটে বরুণদেব রাজাকে শাপ দিলেন, যার ফলে রাজার পেটে নামল জল। রোহিত বনে বনে ঘুরছিল, পেট-ফুলো রাজার দুঃখের কথা শুনে সে ভাবলে এবার গিয়ে হাজির হবে। কিন্তু ইন্দ্র এসে তাকে বাধা দিলেন, দশ পাঁচ কথা বলে তাকে ভাগিয়ে দিলেন আরো দূর বনে। ইন্দ্রের সঙ্গে বরুণের বোধ হয় আড়ি ছিল, কি বল?

পাঁচ বছর বনে ঘুরে ঋষি অজীগর্তে'র সঙ্গে হল রোহিতের দেখা। ক্ষিদের

জ্বালায় ঋষি বেচারী পাগলের মত বনে বনে ঘুরছিলেন। এক শ' গরু কবুল করে অজীগর্তের ছেলে শুনঃশেপকে রোহিত কিনে নিলে। ভাবলে, বরুণের বলি করে শুনঃশেপকে চালিয়ে দেবে কোনো রকমে। তাই শুনঃশেপকে সঙ্গে নিয়ে রোহিত বাপের কাছে গিয়ে হাজির হল।

রোহিতের বদলে শুনঃশেপকে বলি নিতে বরুণদেব রাজী হলেন। হরিশ্চন্দ্র রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন করলেন। বলির সব ঠিকঠাক। কিন্তু শুনঃশেপকে বাঁধবে কে? এমন নিষ্ঠুর কাজ করতে কেউ এগিয়ে এলো না। ফুটফুটে একটি কচি ছেলেকে মেরে তবে বুড়ো রাজার রোগ করতে হবে ভালো—কি দায় পড়েছে লোকের? রাজা ত অস্থির হয়ে উঠলেন। এমনি সময় অজীগর্ত এসে হাজির, বল্‌লে, দাও আমায় আরো একশ' গরু, আমিই বাঁধছি ছেলেকে। যূপ-কাঠে ছেলেকে বেঁধে বুড়ো ঋষি ঘাতকের মত বল্‌লে আবার, আরেক শ' গরু দিলে অবিশ্যি আমিই কাটতে পারি ওকে। সবাই ছিছি করতে লাগল লোকটার কথা শুনে। রাজা কবুল করলেন আরেক শ' গরু। ছুরী হাতে করে নিল অজীগর্ত।

শুনঃশেপ কাঁদতে লাগল—রাজা আর বাপ দুজনেই চাচ্ছেন তাকে মারতে—কার কাছে আর সে আশ্রয় নেবে? দেবতাদের সে ডাক্‌তে থাকল কেঁদে কেঁদে।

শুনঃশেপকে অবিশ্যি অজীগর্ত কাট্‌তে পারেনি, দেবী উষা এসে বাঁচিয়ে দিলেন ওকে—কিন্তু ভাবো দেখি অজীগর্তের কাণ্ডখানা! গল্পটা আমার তৈরী নয়, পুরোনো পুঁথিতে আছে—হাজার হাজার বছর আগেকার লেখা পুথি।

অজীগর্তকে তোমরা বল্‌ছ—লোকটা কী পাপিষ্ঠ—না? আমি কিন্তু তা বলিনে। হয় কি জানো, খেতে না পাওয়ার অবস্থাটা ভারি সাংঘাতিক। মায়া-দয়া-ভালোবাসা, সাধু হয়ে থাকা, এসব কোথায় উধাও হয়ে যায় না খেতে পেয়ে পেয়ে শুকিয়ে উঠলে! যাদের টাকা আছে তারাই ছেলেপিলেদের আদর করতে পারে, ভালো খেতে পরতে দিতে পারে, ভালোবাস্‌তে পারে! কিন্তু যারা গরীব, খেতে পায় না, আদরের বস্তুকেও তারা নিজহাতে কেটে ফেল্‌তে পারে। হাজার হাজার বছর পুরানো দিনের কাহিনীতে আমরা তাই দেখ ছি—এতদিন পরে আজও কিন্তু এরকম ব্যাপার হয়েই চলেছে—ভেবো না রাক্ষস খোক্কসদের দেশে—মানুষেরই দেশে, মানুষেরই মাঝে।

বঙ্গসাহিত্যে শরৎচন্দ্র

রায় বাহাদুর শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম. এ.

বঙ্গসাহিত্যে শরৎচন্দ্রের স্থান নির্দ্দেশ করিবার সময় হয়ত আসে নাই। আমরা অনেকে তাঁহার সমসাময়িক, তাঁহার প্রতিষ্ঠা ও জনপ্রিয়তার মধ্যাহ্ন ভাতি দেখিয়াছি; তাঁহার সম্বন্ধে আমাদের সমালোচনা একদেশদর্শী হওয়ারই সম্ভাবনা বেশী। সমালোচনার যে মুক্তচিত্ততা ও নিরাসক্তির প্রয়োজন, তাহা এ যুগের লেখকদের পক্ষে সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব যে আকস্মিক, সে কথা অনেকেই স্বীকার করিয়াছেন। কেহ কেহ তাঁহাকে ধূমকেতুর সঙ্গেও তুলনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার নূতনত্ব কোথায় এ সম্বন্ধে আমার বোধ হয় অনেকেরই মনে কোনও পরিস্ফুট ধারণা নাই।

রবীন্দ্র প্রভাপ্রদীপ্ত যুগে তিনি সহসা আবির্ভূত হইয়া যে নূতন সুরে বাঁশী বাজাইলেন, তাহাতে পাঠক সমাজ মুগ্ধ হইল। ইহাতে একদিকে যেমন তাঁহার প্রতিভাকে আমরা অভিনন্দিত করিলাম, অপর দিকে তাঁহার সৃষ্টির অভিনবতায় বিব্রত হইয়া পড়িলাম। কেহ কেহ প্রবল ধাক্কা খাইয়া ভাবিলেন, এ সকল সৃষ্টি অনাসৃষ্টি। সকলেই কিন্তু শরৎচন্দ্রের প্রভাব অন্তরে অন্তরে অনুভব করিলেন।

শরৎচন্দ্র কথাসাহিত্যে যে বাস্তবতার আমদানী করিলেন, তাহার সম্বন্ধেও যে দ্বিমত নাই, তাহা নহে। যাঁহারা বস্তুতান্ত্রিক সত্যের পক্ষপাতী, তাঁহারা মনে করিলেন শরৎচন্দ্র সত্যের নির্ভীক সাধক। আর যাঁহারা আদর্শনিষ্ঠ তাঁহারা মনে প্রাণে শরৎচন্দ্রের সৃষ্টিতে সায় দিতে পারিলেন না। তাঁহারা কবির ভাষায় ভাবিলেন,

সেই সত্য যা' রচিবে তুমি, ঘটে যা', তা' সব সত্য নহে।

মানুষ তাহার 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে' সত্যকে পুনরায় সৃষ্টি করিয়া লয়। বিধাতার সৃষ্টিকে সে নূতন রূপ দান করিয়া তাহাতেই মুগ্ধ হয়। সুতরাং বস্তুনিষ্ঠ আবর্জনা সাহিত্যের স্বর্ণপাত্রে পরিবেশন করার কোনও সার্থকতা থাকিতে

পারে না। কিন্তু এ সম্বন্ধেও আমাদের ধারণা সুপরিস্ফুট নহে। আদর্শ বলিতে কি বুঝায়, তাহা যতক্ষণ না স্থিরীকৃত হয়, ততক্ষণ যাঁহারা আদর্শবাদের নামে নীতিবাদের প্রশ্রয় দিতে চাহেন, তাঁহারা শরৎচন্দ্রের সঙ্গে অনেক স্থলে যে একমত হইতে পারিবেন না, ইহা বুঝা যায়। কিন্তু আদর্শবাদ কি নীতিবাদের নামান্তর? এ প্রশ্নের মীমাংসা না হইলে শরৎচন্দ্রের সাহিত্যসৃষ্টির প্রকৃত মর্য্যাদা আমরা কখনই দিতে পারিব না।

সাহিত্যে নীতিবাদের স্থান কোথায় ইহা ধীরভাবে নির্দেশ করিতে চেষ্টা করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে পদে পদে আমাদের বিচারবিভ্রাট হইবার সম্ভাবনা আছে। প্রকৃত কথা এই যে, আমরা যুগপৎ আদর্শবাদী এবং নীতিবাদী। আদর্শ ও নীতির মধ্যে, সুন্দর ও বিধিনিষেধের মধ্যে যখন সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, তখন আনরা নিজেরাই ঠিক করিয়া উঠিতে পারি না যে কোনটিকে সমর্থন করিব। সৌন্দর্য্যবর্জিত উপদেশসাহস্রীরও সমর্থন করিতে পারিয়া উঠি না, আবার সুন্দর দুর্নীতিকেও স্থান দিতে ইচ্ছা হয় না। মণিনাভূষিতঃ সর্পঃ কিমসৌ ন ভয়ঙ্করঃ? কিন্তু মানব মনের একটু রহস্য এই যে, আদর্শ ও নীতির মধ্যে এরূপ সংঘর্ষ বড় একটা ঘটে না। ঘটিলে যে বিপদ্, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, কবির মনোভূমিতে সৌন্দর্য্য যখন স্বর্গের আলোকের মত নামিয়া আসে, তখন তাহাতে আমরা শিবসুন্দরের মিলনই বেশীর ভাগে দেখিতে পাই। সৌন্দর্য্য সৃষ্টির সোপান পরম্পরায় মানবের চিরন্তন আদর্শই ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়। নীতি এবং আদর্শ উভয়ই সচল, বর্দ্ধমান এবং বিস্তারাপেক্ষী। মনের স্বাভাবিক গতিশীলতা উভয়ের মধ্যেই বিরাজিত। আমরা একটিকে চিরস্থির অচলায়তন মনে করিয়া আদর্শ ও নীতির সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে বিব্রত হইয়া পড়ি। সৌন্দর্য্য সৃষ্টি-প্রয়াসী শরৎচন্দ্রে আদর্শবাদ ও নীতিবাদ ঠেলাঠেলি করিয়াও ঠাঁই করিয়া লইয়াছে, ইহা বুঝিতে পারা যায়।

একটি কথা মনে রাখা আবশ্যক, আমরা যাহাকে সনাতন নীতি বলিয়া মনে করি, তাহার অনেকখানি যে সমাজ-ব্যবস্থার অবান্তর ফল, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। এক সমাজে যাহা নীতিসঙ্গত বলিয়া স্বীকৃত হয়, অন্য সমাজে তাহা নীতিবিরুদ্ধ বলিয়া নিন্দিত হয়। ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। সুতরাং

সমাজ-ব্যবস্থা ও তাহার কার্য্যকারণ-পরম্পরা ভাল করিয়া বুঝিতে না পারিলে নীতিবাদের মর্ম্ম উদ্‌ঘাটন করা যায় না। বর্ত্তমান শতাব্দীতে যে মানুষের সমাজ সংস্থিতি দারুণ ধাক্কা খাইয়াছে, সে বিষয়ে তাহারও সন্দেহ নাই। শরৎচন্দ্র তাঁহার আশ্চর্য্য অন্তর্দৃষ্টি-বলে দেখিতে পাইয়াছিলেন যে সমাজদেহের কোথায় কোথায় ভাঙ্গন ধরিয়াছে। তিনি কোনও নূতন সমাজ-প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা না করিলেও তাঁহার পল্লী-সমাজের ছবি যে বর্ত্তমান যুগের সম্পূর্ণ অনুমোদিত এ বিষয়ে কোনও মতভেদ হইবার সম্ভাবনা নাই। সমাজকে অচল অটল অপরিবর্ত্তনীয় মনে না করায় যদি অপরাধ হয়, তবে শরৎচন্দ্র অপরাধী। যাঁহারা এই দৃষ্টি লইয়া শরৎচন্দ্রের সাহিত্য আলোচনা করিবেন, তাঁহারা শরৎচন্দ্রকে বিদ্রোহী বিপ্লবী ইত্যাদি আখ্যায় অভিহিত করিবেন। কিন্তু কাল প্রমাণ করিবে যে সত্য কোন দিকে। কালের সাক্ষ্য এখনই শরৎচন্দ্রের অনুকূলেই গিয়াছে, তাই আমরা শরৎচন্দ্রকে 'অপরাজেয় কথাশিল্পী' বলিয়া মানিয়া লইয়াছি। তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গীকে সত্যের কোঠায় ফেলিতে আর কেহ দ্বিধা বোধ করে না।

প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, সমাজের এই যে পরিবর্ত্তন হইতেছে, ইহা কি মঙ্গলের দিকে, কল্যাণের দিকে, অথবা তাহার বিপরীত দিকে? যদি বিপরীত দিকে হয়, তাহা হইলে শরৎচন্দ্রের ন্যায় প্রথমশ্রেণীর ঔপন্যাসিক তাহার প্রশ্রয় দিয়া অন্যায় করিয়াছেন। কিন্তু সত্যই কি তিনি প্রশ্রয় দিয়াছেন? শরৎচন্দ্র সমাজ-সংস্কারক ছিলেন না, কাজেই তাঁহার নিকট হইতে আমরা সমাজের সংস্কার-মূলক চরিত্রনীতি আশা করিতে পারি না। তিনি অনেকস্থলে তাঁহার চরিত্রসৃষ্টির উপাদান গ্রহণ করিয়াছেন, সমাজের অখ্যাত, স্বল্প পরিচিত অবজ্ঞাত স্তর হইতে। কাজেই তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে সত্যের একটি সহজ পরিপূর্ণ বাস্তব রূপ দেখিতে পাই, যাহাকে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এই সত্যের স্বরূপ দেখাইতে গিয়া তিনি কখনও শাশ্বত নীতির প্রতি অনাদর প্রদর্শন করেন নাই। এই জন্যই শরৎচন্দ্র শুধু বাঙ্গালী পাঠক-সমাজে নহে, বিশ্বের বহু বিস্তৃত সাহিত্য সমাজেও আদৃত হইয়াছেন।

একটি কথা বলা আবশ্যক মনে হয় যে, আমরা শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে যে সত্যের সন্ধান পাই, তাহা তাঁহার স্বাভাবিক সৃষ্টি প্রতিভা হইতে জন্মলাভ

করিয়াছে। অনেকে মনে করেন যে শরৎচন্দ্র কতকগুলি গুরুতর সমাজ-সমস্যার সমাধান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমার কিন্তু তাহা মনে হয় না। তিনি কোনও রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়াছেন বলিয়া আমরা তাঁহার সম্মান বাড়াইতে চেষ্টা না করিলেই ভাল হয়। তাঁহার চরিত্রাঙ্কনে যে সকল প্যাটার্ণ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা সেই অঙ্কনী প্রতিভার স্বাভাবিক বিকাশ। তিনি যে মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহা মনোবিজ্ঞানের অধ্যায় বিশেষ নহে, তাহা তাঁহার সৌন্দর্য্য সৃষ্টির একাংশ মাত্র। তিনি মনোবিজ্ঞানের বিদ্যা ফলাইতে চাহেন নাই, অথচ তাঁহার মনস্তত্ত্ব এত সূক্ষ্মদৃষ্টি সমন্বিত! শ্রেষ্ঠ শিল্পীর কৃতিত্ব ত এখানেই।

বর্ত্তমান অনবস্থিত সমাজের প্রতি শরৎচন্দ্রের যে অনাস্থা সূচিত হইয়াছে, তাহার ন্যায় অন্যায়ের বিচার করিবে কাল। কালের কষ্টি পাথরেই প্রতিভার বিচার যুগে যুগে হইয়া থাকে। একবার প্রেসিডেন্সী কলেজের সাহিত্য সমিতি হইতে শরৎচন্দ্রকে অভিনন্দিত করা হয়। তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার ভার আমারই উপর পড়িয়াছিল। শরৎচন্দ্র তাঁহার অভিভাষণে সেদিন এই কথাটিই বিশেষভাবে বলিয়াছিলেন যে, পাঠক সমাজে কেহ কেহ তাঁহাকে গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করে। কিন্তু হয়ত "পঞ্চাশ বৎসর পরে" (তাঁহারই কথা) এমন একদিন আসিবে যে দিন তাঁহার প্রতি এই ঔদাসীন্য আর থাকিতে পারিবে না। আমারও বোধ হয় শরৎচন্দ্রের প্রকৃত সত্যনিষ্ঠ সমালোচনা করিবার সময় আসিতে এখনও কিছু বিলম্ব আছে।

অতীতের অতিকায়

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম. এস-সি

বায়স্কোপে "কিং কং"এর ছবি বোধ হয় তোমরা অনেকেই দেখেছ। বিখ্যাত ইংরেজ ঔপন্যাসিক কনান্ ডয়েলের "দি লষ্ট্ ওয়ার্লড্" বইখানার ছবি দেখবার সৌভাগ্যও হয়তো কারো কারো হয়েছে। সম্প্রতি "ওয়ান্ মিলিয়ন্ বি, সি." নামে এই ধরণের আরো একখানি ফিল্‌ম্ কলকাতায় এসেছিল। এর

সবগুলির মধ্যেই সেকালের কতকগুলি অতিকায় জীবজন্তুর জীবনযাত্রা-প্রণালী দেখান হয়েছে। এই জন্তুগুলি শুধু আকারেই অতিকায় নয়, কোনও দিক্ দিয়েই আজকালকার জগতে এদের তুলনা মেলে না—স্বভাব, চালচলন, খাওয়া-দাওয়া যেটাই ধর না কেন! সুখের বিষয় (দুঃখের বিষয় নয় নিশ্চয়ই) এদের কোনটাই আজ আর পৃথিবীতে টিকে নেই। হাজার হাজার—হাজারই বা বলি কেন, কোন কোনটা লক্ষ লক্ষ বছর আগেই পৃথিবী থেকে চিরকালের জন্য লোপ পেয়ে গেছে।

আধুনিক জগতে 'জাঁদরেল' চেহারার জানোয়ার হচ্ছে জলে তিমি, ডাঙ্গায় হাতী। তিমি অবশ্য নেহাৎ হেলাফেলার জীব নয়, কিন্তু হাতী যদি ঐ সব জানোয়ারের সঙ্গে চেহারার বহর নিয়ে পাল্লা দিতে চায় তা' হ'লে তাকে সবাই ঠাট্টা করবে। একটা হাতী লম্বায় কতটা হবে? দশ কি বড় জোর পনেরো ফুট? আর এই সব জন্তুর কোন কোনটা লম্বায় ছিল কতটা, শুনবে? প্রায় আশী ফুট। ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ ফুট তো হামেশাই হ'ত! বলা বাহুল্য উঁচুতেও হাতীর তুলনায় এরা ছিল বহু বহু গুণ বড়।

এই সব অতিকায় জানোয়ারের বেশীর ভাগই ছিল সরীসৃপ জাতীয়, অর্থাৎ টিকটিকি, গিরগিটি এদেরই জাতভাই। পণ্ডিতেরা এদের নাম দিয়েছেন ডাইনোসর। ডাইনোসররাই যে পৃথিবীর প্রথম যুগের "অধিবাসী" তা যেন মনে ক'র না। তাদের আগে আরও নানা জাতের জীব পৃথিবীতে বাস করে গেছে। শামুক, গুগলি, চিংড়ি—এদের জাতভাইরা বয়সে আরও প্রবীণ। এরাও আকারে নেহাৎ ছোট ছিল না। কোন কোন শামুক গরুর গাড়ীর চাকার মত বড় হ'ত; চিংড়ির এক পূর্ব্বপুরুষ লম্বায় ছিলেন প্রায় ছ' হাত।

তারপর এল মাছ। সেকালকার মাছেদের শরীর নাকি থাকৃত শক্ত খোলায় ঢাকা। ভাবতেও অবাক্ লাগে! মাছ থেকে ক্রমে কুমীর, গোসাপ ইত্যাদি জানোয়ার জন্মায়। প্রায় শ'খানেক বছর আগে একটি ইংরেজ মেয়ে পাথরের নীচে হঠাৎ একটা অদ্ভুত জন্তুর কঙ্কাল (প্রায় ত্রিশ ফুট লম্বা) দেখতে পায়। পণ্ডিতেরা পরীক্ষা করে দেখেন, জন্তুটার অর্দ্ধেকটা মাছের মত, মুখটা কুমীরের মত। তাঁরা এর নাম দেন "ইক্‌থিয়সরস্" অর্থাৎ

মেছো-কুমীর। এই জানোয়ারের মুখে যে ধারাল দাঁত দেখা গেছে তা থেকে মনে হয় এরা ভীষণ হিংস্র জীব ছিল।

মাছ, কুমীর এদের কেউ কেউ চেহারা বদ্‌লাতে বদ্‌লাতে ক্রমে ডাঙায় এসে বাস করতে সুরু করে। এরাই হ'ল আমাদের "রেপ টাইল" বা "সরীসৃপের" দল—যাদের নামকরণ করা হয়েছে ডাইনোসর। বায়স্কোপের ছবিতে এই ডাইনোসরদেরই বেশী ক'রে দেখান হয়েছে। ডাইনোসর অবশ্য এক রকম ছিল না—হরেক রকম জাতের হ'ত। কোন কোনটা নিরামিষ খেত, তবে মাংস-খোরেরও অভাব ছিল না। নিরামিষখোর ডাইনোসরগুলিই হ'ত আকারে বেশী বড়। আশী ফুট লম্বা চেহারা এদেরই মধ্যে পাওয়া গেছে। মাটীতে দাঁড়িয়ে লম্বা গলা বাড়িয়ে তালগাছের মত উঁচু গাছের আগডালের পাতা খেতে যাতে অসুবিধা না হয় তারই জন্য হয়তো ভগবান্ ঐ রকম চেহারার ব্যবস্থা করেছিলেন।

মাংসখোর ডাইনোসরগুলো আকারে ছোট হ'লেও (ছোট মানে হাতীর চেয়ে অনেক বড়) লাফালাফি, ছুটোছুটি, আঁচড়-কামড়ে ছিল ভীষণ পটু। উদাহরণ স্বরূপ ব্রণ্টোসরস্, সিটীওসরস্, মেগালোসরস্, ইগুয়ানোডন্ ইত্যাদির নাম করা যেতে পারে। কোন কোনটার গায়ে আবার থাকৃত বড় বড় খড়্গ; কোনটার বা থাকৃত মাথায় বড় বড় শিং, কোনটার বা থাকৃত সারা গায়ে সজারুর মত কাঁটা।

এই সব ডাইনোসরদের মধ্যে কতকগুলি আবার লাফাতে লাফাতে ক্রমে উড়তে শিখল। এইসব উড়ুক্কু সরীসৃপের নাম পণ্ডিতেরা দিয়েছেন "টেরোডাক্-টাইল্।" টেরোডাক্‌টাইল্‌রাও আকারে হ'ত অতিকায়—২৫।৩০ ফুট লম্বা পাখাওয়ালা টেরোড্যাক্‌টাইলেরও খবর পাওয়া গেছে। দাঁতওয়ালা, লেজ-ওয়ালা, শক্ত ঠোঁটওয়ালা নানা রকম টেরোডাক্‌টাইলের সন্ধান পাওয়া গেছে। এরাই নাকি আজকালকার পাখীদের পূর্ব্বপুরুষ।

স্তন্যপায়ী জন্তুরা হচ্ছে সকলকার শেষের স্তরের জীব। মানুষ আবার তাদের মধ্যে সব চেয়ে শেষের।

স্তন্যপায়ীদের মধ্যে অতিকায় জীব ছিল ম্যাষ্টোডন্, ম্যামথ প্রভৃতি হাতীর পূর্ব্বপুরুষেরা। অনেক ম্যাষ্টোডনের চারটে ক'রে দাঁত থাকৃত। ১০।১২ ফুট লম্বা দাঁতও পাওয়া গেছে। ম্যামথ হচ্ছে অতিকায় হাতী। সারা গা লোমে ঢাকা—উঁচুতে অন্ততঃ ২০ ফুটের কম যেত না। এরা ছাড়া সেকালকার

গুহা-ভালুক, খাঁড়া-দেঁতো বাঘ, লোমওয়ালা গণ্ডার, অতিকায় শ্লথ মাইলোডন্, মেগাথেরিয়াম্ ইত্যাদির নাম করা যেতে পারে।

মানুষ আর বানরের পূর্ব্বপুরুষ এক ছিল ডারউইন্ সাহেবের এই মতবাদ তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। সব চেয়ে পুরানো মানুষের যে খবর পাওয়া গেছে তাদের সঙ্গে বানরের চেহারার সাদৃশ্য খুবই বেশী। যবদ্বীপের খাড়া বানর-মানুষ—'পিথেক্যান্থ্রোপাস্ ইরেক্টাস্'ই বোধ হয় সব চেয়ে পুরানো মানুষ।

এই সব সেকালকার প্রাণীর কোনটাই প্রায় আজকাল জীবিত নেই। ইতি-মধ্যে পৃথিবীতে নানা রকম পরিবর্ত্তন হয়েছে। এই সব প্রাণীর বংশধরেরাও সেই সব পরিবর্ত্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিজের নিজের চেহারা বদলে নিয়েছে, এবং এখন সম্পূর্ণ নূতুন রূপ নিয়ে পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াচ্ছে! যারা তা পারে নি তারা পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। পাহাড়ের গুহায়, পাথরের স্তরে স্তরে সেই সব লুপ্ত জীবজন্তুর কঙ্কাল এবং অন্যান্য চিহ্ন ইতস্ততঃ ছড়ান রয়েছে। পণ্ডিতেরা মাটী খুঁড়ে সেই সব কঙ্কাল খুঁজে বার করেছেন, সে সব পরীক্ষা ক'রে প্রয়োজন মত জোড়াতালি দিয়ে দীর্ঘ দিনের গবেষণার পর ঐ সব জানোয়ারের আকৃতি প্রকৃতি, তাদের কোন্‌টা কোন্ সময়ে ছিল তারও একটা মোটামুটি হিসাব করা হয়েছে। তবে সে বয়স গুণতি ঠিক আমাদের বয়স গুণতির মত ক'রে করা হয় নি। পণ্ডিতেরা সৃষ্টিকে পর পর কয়েকটা বিভিন্ন যুগে ভাগ করে নিয়েছেন—তার পর কোন্‌টা কোন্ যুগের ব্যাপার তাই নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন। এক একটা যুগে হাজার হাজার বছর ধরা হয়েছে।

তোমাদের মধ্যে যারা কলকাতায় থাক বা গিয়েছ তারা সেখানকার মিউজিয়ামে এই সব আদিকালের অতিকায় জীবজন্তুর কঙ্কাল দেখে থাকবে। একটু ভাল করে সময় নিয়ে দেখলে দেখবে কত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য জিনিষ সেখানে রয়েছে! দেরাদূনের কাছে সিউয়ালিক পর্ব্বতমালায় এই ধরণের অনেক দুষ্প্রাপ্য জানোয়ারের কঙ্কাল পাওয়া গেছে—একটা ঘরে শুধু সেগুলিকেই রাখা হয়েছে। এই সব ঘরে ঘুরতে ঘুরতে কত কথাই না মনে আসে! মন যেন অতর্কিতে সেই আদিকালের তরুণ পৃথিবীতে চলে যায়, সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টির অনন্ত রহস্যের কথা মনে পড়ে বিস্ময়ের আর অন্ত থাকে না।

স্যাণ্ডো ও স্যাণ্ডেল

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

(এক)

স্যাণ্ডেল জোড়া আগে চলে যায়। পা চলে পিছে। কখনও হয় তো পা তার মাটীতেই পড়ে' থাকে, স্যাণ্ডেল যায় হাত খানেক এগিয়ে।

ওদিকে তবু তার দৃষ্টি না থাকলেও, হেঁটে তার সঙ্গে পারা শক্ত।

দৌড় এবং অঙ্ক ঠিক এক জিনিষ কিনা জানিনে। দৌড়েও এ পর্য্যন্ত কেউ তাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে নি। আর অঙ্কেও।

ক্লাস ফোর থেকে ক্লাস টেন পর্য্যন্ত অঙ্কের মাষ্টার তিন জন। সেকেণ্ড মাষ্টার মহাশয় তাঁদের প্রধান। নাম তার শ্রীযুক্ত প্রিয়শঙ্কর বসু। ও নাম তবু অপ্রিয় হয়ে রয়েছে ক্লাস ফোর থেকে সেভেন পর্য্যন্ত—যে রাজ্যে তাঁর সুবিখ্যাত নাম 'বাঘা বোস্'। ক্লাস নাইন ও টেন্এ তিনি বদ্লে গিয়ে হয়েছেন 'গৌরীশঙ্কর—দি সেকেণ্ড'।

এঁদের সবার কাছ থেকেই, ও যে-ক্লাসেই পরীক্ষা দিয়েছে, অঙ্কের এক শ' নম্বর আদায় করে নিয়েছে, আস্ত।

ক্লাস নাইনের এ্যানুয়ালে, মাষ্টার মহাশয়েরা তিন জনে পরামর্শ করেই কাগজ দেখেছিলেন। কিন্তু ও-র নম্বর দাঁড়াল সেই $\frac{100}{100}$.

ইস্কুলে এ রকম রেকর্ড আর নেই।

তবু পরীক্ষার ফল বেরুলে দেখা যায়, ফিফ্টীন্থ্ থেকে সুরু করে ফিফ্থ্এর উপরে কথনো উঠলে না অতীশ।

এতে ওর মনে কোন দুঃখ হয় কিনা, কেউ জানে না। সেভেন্থ্ হয়ে ও ক্লাস টেন্এ উঠেছে। কিন্তু পরদিন দেখা গেল, জোরে শিস্ দিয়ে তেম্নি স্যাণ্ডেল দুটোকে আগে পাঠাতে পাঠাতে চলেছে ও বলেনের বাড়ী। ভালো করে ভোর তথনো হয় নি।

যে পাখীরা গাইবার যোগাড় করছিল, স্যাণ্ডেলের সাড়া পেয়ে তাদের কতক অন্য গাছে গিয়ে, আবার গান সুরু করলে।

(দুই)

বাড়ী বলেছি বলেনের। মোটে একখানি ঘর। ঘর মানে ঘ এবং র। রোয়াকটা ইটের, উপরে খড়ের চাল ; এ দুটোই চোকে পড়ে। আর সব মাটীতে লেপা। রোয়াকটাও শুদ্ধ।

কী শ্রী সেই মাটীলেপা ইটের আর পাংলা বেড়াগুলোর! বলেন্ একা। নিজে রেঁধে খায়। কোন দিন শশা, নূণ আর মুড়ি খেয়েও কাটায়। কখনো ছাতু। ছোট্ট হলেও ওর B টাইমপীসটা যেমন Beeএর (মৌমাছির) মতই অশ্রান্ত কাজ করে চলছে, এই ছোট্ট ঘরে ওর পড়াও চলছে তেমনি। মাঠের শেষ পারের খালের স্রোতও বোধ হয় অত ছুটে' চলে না।

কেউ তার কুঁড়ের ভিতরে গেলে, চমকে যাবে। নেই বিশেষ কিছুই। একটা কেরোসিন কাঠের শেলফএ ও রকম চমৎকার তকতকে বইগুলো যে অত সুন্দর করে অমন ভাবে সাজানো থাকতে পারে, চোকে দেখেও তা বিশ্বেস করা শক্ত।

মনে হবে, জমিদার বাড়ীর গোটা লাইব্রেরিটা স্বপ্নেও যদি একবার এখানে আসে, সেটিও বোধ হয় কুঁচকে যাবে লজ্জায়।

তা না এলেও, জমিদারের ছোট ছেলেটিই এসে পড়ল। নিশ্চয়। মানুষের আগে আগে স্যাণ্ডেল কেন এসে দাওয়ায় উঠবে তা নৈলে?

"কে?"

বলেন্ কুয়ো থেকে জল তুলছিল ওধারে।

"স্যাণ্ডেল"

"ভাবছিলেম ঠিক। আজ যে রোদের আগেই!"

বলেন্ তখন প্রকাণ্ড ঘড়াটা কুয়ো থেকে তুলে ফেলে হাসছে দাঁড়িয়ে। অতীশ এসে বলছে, "ঘুমুতে দিচ্ছিস কি?—বাঃ স্যাণ্ডো, তোর মাস্‌লগুলো আজ ট্রিপ্‌ল্ হয়ে উঠেছে সত্যিই।"—গিয়ে আঙুলে দারুণ চাপ দিয়ে দিয়ে দেখে বললে, "ইস্, তুই কি লোহা খেতে সুরু করেছিস নাকি রে—"

বলেই থেমে গেল। বলেনের সে মাস্‌ল্ যেন নরম হয়ে আসছিল ; বললে

বলেন্, "একটু আজ একসারসাইজে দেরী হয়েছে ভাই, বেরিয়েই জলটা তুলে ফেলছিলেম—সেই মাস্‌ল্‌এ তোর আঙুল সুকামনার স্বর্গের ফুলের মত পড়ল। কিন্তু, কিছুই যে এখনো হয়নি ভাই!"

ফুটে ওঠা কৃতজ্ঞ চোখ নিয়েও, নুয়ে গেল বলেন্।

আঙুল আবার আরো শক্ত করে বিঁধিয়ে নিয়ে, বললে অতীশ, "ঠিক থেমেছি। থ্যাঙ্ক 'য়ু! দিলেম ফেলে তোর স্যাণ্ডো নাম, পাণ্ডব যুগের 'বৃকোদর' এবার তুই… …লোহার গদা যাঁর গায়ে লেগে চুরমার হয়েছে।"

মাথা নত করে উজ্জ্বল শান্ত চোকে বলেন্ প্রণাম করলে, "ধন্য করেছিস জগতের ভোর ও নাম করে'।" তা'পর বললে আস্তে আস্তে, "জানিস, আজকাল সব দেশেই এমন লোকেরা জন্মেন, ইঞ্চএর পর ইঞ্চ মোটা লোহাকে যাঁরা সত্যিই বেতের মত বেঁকিয়ে খেলা করেন। পাণ্ডবের এই দেশে তা আজ মিথ্যে হয়ে রয়েছে!"

"কিন্তু তোরা তা সত্যি করে তুলবিই ঠিক, বলছি আমি!"—সোজা উঁচু হতে হতে বললে অতীশ।

বলেন্ কুয়োর ধারের বেড়াটা ধরেই, দিলে হেসে! বললে, "তুই যে নাম করলি এই উঠন্ত রোদে, সে নাম নিজে সত্যি করেছিস যেমন করে, সবাই তেমনি করেই করবে বুঝি?"

হাততালি দিয়ে হো হো করে হেসে উঠলে অতীশ, "থ্যাঙ্ক'য়ু এগেইন্ সুপ্রিয় বৃকোদর! দুজনে যে মিতে হয়ে গেছি তা ভুলে গিয়েছিলেম!" দু হাত বাড়িয়ে অতীশ বলেনের হাত টেনে নিলে, "চল্, তুই যে বইয়ের কথা বলেছিলি, সে বই এসেছে।"

"এসেছে!"

ঘড়াটা চার আঙুলে তুলে নিলে বলেন্।

দুজনে গিয়ে ঢুকল ঘরে।

যেন একটি ঈগল আর একটি বক।

অথচ দুটিতেই বন্ধু।

(তিন)

বইয়ের সেই শেলফটার পাশে তক্তপোষে একটা লাল টুকটুকে বই নিয়ে দুজন। বোধ হয় পড়া হয়েছে খানিকটে। খোলা পড়ে'।

"কিন্তু তবু পারিনি ভাই!" হার স্বীকার করে অতীশ বললে, 'ভীম-বৃকোদর' সে তোরাই; আমার হচ্ছে বৃকের মানে বাঘের পেট, ও কথাই ঠিক। লোভের দিক দিয়ে জিভে আর পেটে—সমান। আর হজমের বেলায় বাঘ টাগ কিছুই নয়। ভাই, শরীরটে ভালো হল না আর আজো!"

"সত্যি বলছিস?"

শুনে আশ্চর্য্য অতীশ বলেনের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

"এ বই পঁড়েও?"

"ও! ঠিক বলেছিস। বই পড়ে মাথাটা ঘুরে গিয়েছে। পোয়াতেও দিলেম না তাই রাতটে!"

আবার হাতে উঠল বই। সোনালি তার নামটা এই ফাঁকে পড়া যাচ্ছিল, **শরীরে ও মনে।**

লিখেছেন?

পাড়াগাঁয়ের এক ভদ্রলোক। ছাপা হয়েছে মহকুমার এক ছাপাখানায়। বইয়ের মধ্যে কয়েকখানা ছবি আছে, বই যিনি লিখেছেন তাঁর ছবিও। কয়েকটি নিয়ম দেখাচ্ছেন তিনি, সে ছবি।

কী চমৎকার চেহারা তাঁর! মনে হয় যেন একটা আস্ত সিংহ হঠাৎ রূপ বদলে মানুষ হয়ে গেছে। অথচ তাঁর সমস্ত শরীরে এক দেবশিশুর লাবণ্য আঁকা!

মুগ্ধ হতে হতে দুজন বইয়ের মাঝখানের এক পাতায় এল।

"দামী দামী জিনিষ খেতে হবে শরীর ভাল করতে, তার মানে নেই। অনেক কিছু খেতে হবে, তাও নয়। প্রথমে সুনির্ম্মল বাতাস আর আলোই হচ্ছে সব। দ্বিতীয় খুশী মন ও পরিষ্কার থাকা। তারপর সহজ, সুলভ, পুষ্টিকর, সুপাচ্য সাধারণ খাদ্য।"

বই পড়া থামল। ঢোঁক গিলে টিলে অতীশ বললে, "এইখানে মাথা ঘোরে। এসব খাবার টাবার কি রকম ভাই?"

"জানিস নে?"

"না। বলছি সত্যি। কেউ-ই ঠিক মত বলতে পারলে না।"

"জানতে পারবি আস্তে।"

"তা হলে আজ থেকে আমি তোর সাকরেদ হলেম।" বলেন্‌কে খাঁটি একটি সেলাম করে, তা'পর পিঠে এক চাপড় মেরে অতীশ তার কাঁধের উপর দিয়ে হাত এনে তার গলা জড়িয়ে বসল।

(চার)

রেগে বলেন্ রক্ত চোকে বললে, "যা! তুই গুরু আমার, তোকে সাকরেদ করব?" সুর গেল মিষ্টি হয়ে। "অঙ্ক শেখালি তুই তাই পড়া চলছে এখনো—"

"বড়ো বাড়াচ্ছিস এক্স্‌-স্যাণ্ডো! ধরিয়ে দিয়েছিলেম, তুই আপনা থেকে তা'পর ফার্ষ্ট হয়ে চললি ক্লাসে!"

"ওরও গুরু তুই! কি করে পড়তে হয়, জানতো কেই বা? ঢু বগল পূরে পূরে এনে ঢেলেছিস বইগুলোও।"

প্রায় তার ভিজে চোকের উপরে চোক রেখে বললে অতীশ, "তোর গায়ের হাওয়া লেগে তবুও তাই একটু সবল হয়েছি।"

স্থির চোকে বলেন্ বললে, "তোকে কতবার বলেছি, তুই কি শুনলি? তোর কাঠামো আমার চেয়ে কত ভালো, আমার চারগুণ জোয়ান রয়েছে তোর ভিতরে, ডাকছিস তাকে তুই?" অতীশের চওড়া বুকের দিকে শক্ত চোকেও, সম্ভ্রমেও, চেয়ে থাকল বলেন্।

"আমি এলেম আজ তাকেই ডাকতে, বীর বৃকোদর! এক্‌সারসাইজের পাঠ কখন দিচ্ছিস বল্ তো?"

আনন্দে হা! হা! করে বলেন হেসে উঠল।—"দু বছর আগে তোকে সেধেছিলেম, আজ নিজে নিতে চাচ্ছিস! এ আমার ওস্তাদের জয় আর জয় তাঁর যিনি লিখেছেন এ বই। দুজনকে আমার নমস্কার।"

বলেন্ জোড় হাত ছোঁয়ালে মাথায়।

(পাঁচ)

লিখব তা'পর নতুন বছরের কথা ?

ম্যাট্রিক পরীক্ষা হয়ে গেছে। সেই কুয়োটার পাশে দুজনে বসে মাখছে তেল, স্নান করবার আগে।

দূর থেকে দেখে তোমার মনে হবে, খুব বিখ্যাত কোন ভাস্করের তয়েরি একটা ব্রোঞ্জের আর একটা পালিশ পিতলের মূর্ত্তি, বেলা দশটায় ঝক্‌ঝকে রোদের তলে, যেন কোনো স্প্রিংয়ের কলের জোরে খেলা করে চলেছে এক অপরূপ ধরণে।

কাছে গিয়ে যখন দেখবে, দুটিই মানুষ, তখন আনন্দ তোমার প্রাণে ধরবে না। তয়ের করা ছাড়া, এত সুন্দর, এত বলিষ্ঠ চেহারা মানুষের হয়, বাংলা দেশের কোন ছেলেই তা কখনো হয়তো ভাবতে পারে না। কিন্তু তা সজীব হয়ে রয়েছে চোকের সামনে !

তেল মাখা শেষ হল। এ তেল মাখার কৌশল তারা পেয়েছে নতুন বই থেকেই। সবুজ পাতা ভরা অশ্বত্থ গাছটা যেন হাসিতে শিউরে উঠল, যখন তারা চলল তার তল দিয়ে।

ডাকছে মাঠের পারের খালের স্রোতে আর গাঁয়ের পুকুরের জল দুজনকে।

তাদের ঝাঁপিয়ে পড়া শরীরের চারিদিকে নেচে ওঠে গভীর খাল আর পুকুরের কালো জল। ওদেরে তোলপাড় করে দিয়ে নেয়ে যখন দাঁড়ায় তারা পাড়ে এসে ভিজে গায়ে সোজা হয়ে, গামছা নিঙড়ে' গা মুছতে, মনে হয় তখন, বাংলা দেশের লক্ষ লক্ষ রোগা ছেলেমেয়ের দল ওদের নাওয়া এই মাতাল জলে স্নান করে উঠলে বোধ হয় তারাও এমনি সুন্দর হবে !

দুজনে চলে যায়। কেউ ফিরাতে পারল না চোক তাদের দিক থেকে।

নেয়ে এসে দুজনে কাপড় ছেড়ে আদা নূণ দিয়ে ছোলা ভেজানো নেয় খেয়ে। দু'কুন্‌কো আলো চাল ধুয়ে নিয়ে দুজনে দিলে রান্না চাপিয়ে।

কি কি রান্না ? উচ্ছে, কাঁচকলা, বরবটি, আলু এই সব দিলে কেটে কুটে তাতে, সিদ্ধ হবে শুধু।

শেল্‌ফ্ থেকে চমৎকার বাঁধানো নীল বড় বইখানা নিয়ে বসল সেই ব্রোঞ্জ আর পিতলের দুই জীবন্ত মানুষ পড়তে আর রাঁধতে।

তুই কিশোর সবুজ বীর।

যখন তাদের কলেজ যাওয়ার দিন আসছে, আর তা'পর আসবে কলেজ ছেড়ে আরেক নতুন জীবনের ভোর, তখন তারা কি করবে? নীল বইয়ের পাতাগুলোতেই বোধ হয় আঁকা রয়েছে তার আবছা আভাস!

অতীশ বললে, "বলেন্, আর দেশে অসুখ থাকবে না। কেউ তুর্ব্বল থাকবে না। মানুষ, পাখী, পশু, গাছপালা, সবকেই কি আমরা স্বাস্থ্যসুন্দর করতে পারব না?"

"আমাদের ওস্তাদদের জয় হোক! তোকে পেয়ে, কী যে সহজ হবে তা!"

বিস্ফোরক বোমা ও বিষাক্ত গ্যাস

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়

এ প্রবন্ধ পড়তে গিয়ে অনেকেরই হয়ত মনে হবে যে, একমাত্র বঁটি-কাটারি কাস্তে-কুড়ুল নিয়েই যাদের কারবার—গুলি-গোলা, কামান-বন্দুক যাদের কাছে নিতান্তই অস্পৃশ্য, তাদের আবার এ-সব গ্যাস-ট্যাস, বোমা-টোমা নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন কি? অবশ্য একথা ঠিক যে, অন্যান্য স্বাধীন জাতির মত সগর্ব্বে এ-সব ব্যবহার ক'রে গৌরব অর্জ্জনের জন্যে এ-সব নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার প্রয়োজন না থাক্‌লেও—আত্মরক্ষার দিক থেকে, আজকের দিনে, এ-সব সম্বন্ধে আলোচনার যে বিশেষ প্রয়োজন আছে তা আর অস্বীকার করবার উপায় নেই।

প্রথমে বোমার কথাই বলা যাক্। কারণ, এই বোমাই হচ্ছে এ-যুদ্ধের একমাত্র মারাত্মক অস্ত্র যার সাহায্যে জার্ম্মাণী প্রায় সারা ইউরোপকেই আজ শ্মশানে পরিণত করেছে এবং মানুষের অন্য সমস্ত শক্তিকেই এক রকম ক'রে ফেলেছে পঙ্গু। বর্ত্তমানের মত গত মহাযুদ্ধে (অর্থাৎ ১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধে) এত

হরেকরকম বোমা ও বোমারু-বিমানের বাহুল্য না থাকলেও, দু'চারটি অদ্ভুত ধরণের ছশো সাতশো পাউণ্ড ওজনের বোমাও জার্ম্মাণরা সে সময় ব্যবহার যে না করেছিল তা নয়, কিন্তু এই ধরণের ভারী বোমা ঘাড়ে নিয়ে বেপরোয়া ঘুরে বেড়াবার মতো বোমারু-বিমান তখন আবিষ্কার হয়নি বলেই বোধ হয় আকাশের চেয়ে মাটিতেই যুদ্ধের অবস্থা ছিল বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

বর্ত্তমান যুদ্ধে বহু প্রকার নতুন যুদ্ধাস্ত্রও যেমন দেখা দিয়েছে, তেমনি বোমার মাল-মসলা ও কার্য্যক্ষমতাও পরিবর্ত্তিত হয়েছে অদ্ভুতভাবে। এখনকার একটি একশো পাউণ্ডের অতি-বিস্ফোরক বোমার পক্ষে যে ক্ষেত্রে অনায়াসে একটি বৃহদাকার অট্টালিকার ছাদ বিদীর্ণ ক'রে সমস্ত বাড়িখানিকেই উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব; সে ক্ষেত্রে তখনকার সময় ঠিক এই ধরণের একটি বোমার পক্ষে তা সম্ভব ছিল না। তাছাড়া বর্ত্তমানে বোমারু-বিমান সমূহের ভার বহনের ক্ষমতা পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে,—একসঙ্গে বহু বোমাও যেমন তাদের পক্ষে বহন করা সম্ভব হয়েছে; তেমনি ভারী বোমা ফেলার অসুবিধাও গিয়েছে একেবারে কমে। সম্প্রতি গোয়েরিং পোল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে অতি-ভারের অতি-বিস্ফোরক কয়েক হাজার বোমা ফেলে, কয়েক দিনের মধ্যেই যে সমস্ত জাতিগুলির অস্তিত্বকে নির্মূল করতে বসেছিল,—তার পেছনে বোমাগুলির অসম্ভব ওজন ও বিষাক্ত বিস্ফোরক দ্রব্যের গুরুত্বও বড় কম ছিল না। অর্থাৎ তাদের ওজন ছিল যেমন পঁচিশ ত্রিশ মণ পর্য্যন্ত, তেমনি যে সব জায়গায় সেগুলি পড়েছিল, তার এক মাইলের মধ্যেও নাকি তার মারাত্মক প্রতিক্রিয়া দেখা গেছল; এবং একশো দেড়শো মাইল দূর থেকেও বিদীর্ণ হবার শব্দ শুনে স্থানীয় জনসাধারণ আতঙ্কগ্রস্ত হয়েছিল।

এই অতি-বিস্ফোরক (High Explosive) বৃহদাকার বোমাগুলির পর আসে আগ্নেয় বোমার (Incendiary) কথা। ইন্‌সিনডিয়ারি বোমাগুলি কিন্তু আকারে অতি-বিস্ফোরক বোমাগুলির মতো বৃহৎ ও ভারী নয়। কিন্তু তাবলে সেগুলিকেও কিছু কম মারাত্মক বলা যায় না। ওজনে এই আগ্নেয় বোমাগুলি দু'পাউণ্ড থেকে আট-দশ পাউণ্ড পর্য্যন্ত বা তদূর্দ্ধেও হয়ে থাকে। সাধারণত এদের কাজ হ'ল, কল-কারখানা, ক্ষেত-খামার, গুদামঘর ও কাঠ-কাঠরার কারবার প্রভৃতি স্থানে আগুন লাগানো। কন্‌ক্রিট বাড়ির ছাদে অথবা

অগ্নিদাহ্য নয় এরকম জিনিসের ওপর ছোট ধরণের আগ্নেয় বোমা বিশেষ কোন ক্ষতি করতে পারে না এবং মানুষের ভীড়ের মধ্যে অথবা একেবারে গায়ের ওপর এসে না পড়লে এর দ্বারা প্রাণনাশের কোন আশঙ্কা থাকে না।

আগ্নেয় বোমাগুলিকে সাধারণত দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়ে থাকে। এক নম্বর প্রথম শ্রেণী হচ্ছে: (Single effect bombs) একটু হাল্‌কা ধরণের—কেবল মাত্র এক স্থানেই আগুন ধরাতে সক্ষম। এবং দু'নম্বর অপর শ্রেণী হচ্ছে: (Multiple effect bombs) প্রথম শ্রেণীর চেয়ে অপেক্ষাকৃত ভারী ধরণের এবং অন্যান্য কিছু বিচিত্র কার্য্যকলাপে পারদর্শী। সিঙ্গেল্ এফেক্ট বোমাগুলি আকারে একটু ছোট হওয়ার ফলে, একটি ছোট বিমানপোতের পক্ষে এই ধরণের দু'হাজার আড়াই হাজার পর্য্যন্ত বোমা ব'য়ে নিয়ে যাওয়া কিছুই হাঙ্গামজনক হয় না। কিন্তু এদের ঠিক টিপ ক'রে ফেলাই হচ্ছে মুস্কিল! অর্থাৎ কখনই ঠিক প্রয়োজন মতো নির্দ্দিষ্ট বাড়ি ঘর বা সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে এদের ফেলা যায় না। তাই বহু সময় এই সব বোমারু-বিমানের পাইলটরা ম্যাপ দেখে শহরের বাইরে ছোট খাটো বস্তি বা গ্রামের মধ্যে, ডকইয়ার্ডে বা ফসল প্রভৃতির ক্ষেতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাবে এগুলিকে ফেলে অগ্নিকাণ্ড ঘটায় এবং তার দ্বারা শত্রুপক্ষের ধনসম্পত্তি বিনষ্ট করে।

দু'নম্বর বিচিত্র ক্রিয়াকলাপ বিশিষ্ট আগ্নেয় বোমাগুলি আকারে হাল্‌কা ধরণের আগ্নেয় বোমাগুলি অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত যে বড় তা পূর্ব্বেই বলেছি। সাধারণত এগুলির মধ্যে থাকে বিভিন্ন রকমের দাহিকাশক্তি বিশিষ্ট পদার্থে পূর্ণ কয়েকটি আলাদা খোপ। মাটিতে বা লক্ষ্যবস্তুর উপরে প'ড়ে, আগুন ধরাবার অব্যবহিত পরেই সেই আলাদা খোপগুলি একটির-পর-একটি ফাটতে থাকে এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই আগুন এমনভাবে চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে পড়ে যে, তাকে অতি সহজে করায়ত্ব করা আর মোটেই সম্ভব হয় না। সিঙ্গল্ এফেক্ট বোমাগুলি নির্দ্দিষ্ট স্থানে ফেলার যেমন অসুবিধা হয়, এগুলি কিন্তু ঠিক তেমন হয় না। কারণ অতি-বিস্ফোরক বড় বোমার মতই এগুলিরও আকার এমনভাবে তৈরী করা হয় যে, বিচক্ষণ পাইলটের সাহায্যে নিক্ষিপ্ত হ'লে, প্রায় ক্ষেত্রেই আর লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। তাছাড়া এদের মাথার দিকটা সাধারণত বৃহদাকার বোমার মতই ছুঁচালো হয় বলে, যে কোন কলকারখানা ও সরকারী মজবুত

বাড়ির ছাদও বিদীর্ণ ক'রে, এগুলি তার মধ্যে গিয়েও সহজে দাহন ক্রিয়া সুসমাধা করতে পারে।

অগ্নি উৎপাদক (Incendiary) এই বোমাগুলি প্রস্তুতের উপকরণ হচ্ছে: ম্যাগনেসিয়ম, থারমাইট ও থারম্যালয়। এই থারম্যালয় হচ্ছে সালফার ও থারমাইটের মিশ্রণ। এছাড়া খনিজ তৈল ও কার্বন বাই-সালফাইটে ফস্‌ফরাস দ্রবীভূত ক'রে এই কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তবে এদের মধ্যে প্রধানত ম্যাগনেসিয়াম ও খনিজ তৈলই সর্ব্বাপেক্ষা বেশি কার্য্যকরী। আপনাদের মধ্যে যাঁরা বিজ্ঞানের ছাত্র তাঁরা নিশ্চয়ই এ সকল রাসায়নিক দ্রব্যের গুরুত্ব সম্বন্ধে অল্পবিস্তর জ্ঞাত আছেন; অতএব এক্ষেত্রে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের মধ্যে, এ সম্বন্ধে আর বেশি আলোচনা না করাই শ্রেয়।

এর পর গ্যাসের কথায় আসা যাক। যুদ্ধে মারণাস্ত্র হিসাবে গ্যাস ব্যবহার অত্যন্ত বর্ব্বরজনোচিত হলেও, গত মহাযুদ্ধ থেকেই গ্যাসের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। গ্যাসের ঘনত্ব (density) সাধারণত বায়ু অপেক্ষা বেশি হওয়ার ফলে এবং বিভিন্ন গ্যাসের মধ্যে জীবনাস্তের অদ্ভুত কর্ম্মক্ষমতা নিহিত থাকায়, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিমান থেকে বোমার সাহায্যে অথবা তরল পদার্থ হিসাবে এগুলিকে নিচে বিপক্ষীয় সৈন্যশ্রেণী বা নিরীহ নগরবাসীদের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়। গ্যাস বোমাগুলি তার স্বধর্ম্ম অনুযায়ী নিচে এসে ফাটে, এবং তার মধ্যস্থিত গ্যাস লক্ষ্যবস্তুর চতুষ্পার্শ্বস্থ আবহাওয়ায় ধীরে ধীরে সংক্রামিত হ'তে থাকে। তরল পদার্থ হিসাবে যে গ্যাস নিচে ফেলা হয়, বহুক্ষেত্রেই তার খানিকটা অংশ মধ্যপথেই হাওয়ার সঙ্গে উবে গিয়ে তারপর ক্রমশ মাটিতে নামে, এবং বাকী অংশটা বৃষ্টিধারার মত মাটির উপরে প'ড়ে তার বিষক্রিয়া সম্পন্ন করে। এই সব গ্যাস ও বোমা প্রভৃতির জন্য ব্যবহৃত বর্ত্তমান যুদ্ধের বহু রাসায়নিক পদার্থই সাধারণত রঙ, ঔষুধ ও সার-জাতীয় দ্রব্যের ঝড়তি-পড়তি অংশ থেকে সহজে ও অল্প খরচে তৈরি হয়ে থাকে।

এই গ্যাসের আবার রকমারি প্রস্তুত প্রণালী আছে। এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যেও ঠিক এক ধরণের গ্যাস প্রচলিত নেই। কারণ, এই ব্যাপারটি নিয়ে প্রত্যেক দেশের রাসয়নিকরাই অত্যন্ত গোপনে দিনের-পর-দিন, কিভাবে এটিকে আরো মারাত্মক ক'রে প্রস্তুত করা যায় তার জন্য গবেষণা ক'রে চলেছেন।

গ্যাস বোমার কার্য্যে ব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থগুলিকে সাধারণত তাদের ভৌতধর্ম্ম (Physical property) অনুযায়ী তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়ে থাকে; যেমন: ঘন, দ্রব ও বাষ্পীয়। বোমায় ব্যবহৃত এই তিন অবস্থার রাসায়নিক পদার্থেরই প্রধানত শরীরের উপর প্রতিক্রিয়া হচ্ছে: ফুসফুস প্রদাহ, অশ্রুবর্ষণ, চক্ষু ও চর্ম্মদাহ এবং সর্ব্বদেহ বিষাক্তকরণ।

এই কাজে সাধারণত ক্লোরিণ, ক্লোরোপিক্‌রিণ, ফসোজিন, ক্লোর-এসিটো ফিনোন, ডাই ফিনিল ক্লোর-আরসাইন, লিউইসিট, ডাই ফিনিল সায়ান আরসাইন, ব্লিস্টার, হাইড্রোজেন, সালফাইড, নাইট্রাস ফিউমস্‌, ফস্‌ফরাস ও মাষ্টার্ড প্রভৃতি বহুপ্রকার রাসায়নিক পদার্থই ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ক্লোরিণ ও ফসোজিন (কারবোনাল ক্লোরাইড) মেঘাবৃত ধূম্রজালের ন্যায় বিষবাষ্প তৈরি ক'রে থাকে এবং এই দুটি গ্যাসের সমান মিশ্রণে যে ভীষণ ক্ষমতাশালী বিষাক্তবাষ্পের উদ্ভব হয়, তা বহুক্ষেত্রে একমাত্র বিশুদ্ধ ক্লোরিণ অপেক্ষা বিষক্রিয়ায় প্রায় চারগুণ বেশি কার্য্যকরী। ক্লোরিণ গ্যাস সাধারণত একটু বেশি ভারী হওয়ার ফলে খুব শিগ্‌গিরই নিম্নভাগের জমিতে নেমে প'ড়ে বিস্তৃতি লাভ করে এবং হাওয়ার সঙ্গে উবে যেতেও সময় নেয় বেশি. খোলা জায়গায় ফসোজিনের ক্রিয়া ক্লোরিণ অপেক্ষা দ্রুত প্রকাশ পেলেও এটি উবে যায় অত্যন্ত তাড়াতাড়ি। অর্থাৎ ১০ থেকে ৩০ মিনিটের পরই এর দ্বারা মানুষের আর কোন ক্ষতির কারণ থাকে না। ক্লোরিণ ও ফসোজিন ছাড়া ক্লেরোপিক্‌রিণ বা নাইট্রোকোলোফর্ম্ম গ্যাসও বোমার ক্ষেত্রে বহুস্থলে ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং জীবননাশের দিক থেকে এটিও খুব কম মারাত্মক নয়। নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে খুব অল্প পরিমাণেও এটি মানুষের দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করলে ভীষণভাবে কাশি ও বমনের উদ্রেক করায় এবং বেশি পরিমাণে গেলে ত' আর রক্ষাই থাকে না, অর্থাৎ ফুসফুসের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ঘটে। ক্লোরোপিক্‌রিণ গ্যাসের কাশি সে এক অসহ্য কষ্টদায়ক ব্যাপার! অবিশ্রাম কাশতে কাশতে প্রথমদিকে মানুষের মুখ দিয়ে থুতু ও পরে রক্ত-মেশান ফেনা উঠতে থাকে এবং সমস্ত দেহের মধ্যে একপ্রকার আকস্মিক প্রদাহ দেখা দেয়। ক্রমশ এই প্রদাহ ও রক্তমিশ্রিত ফেনা এত বেশি পরিমাণে উঠতে থাকে যে, শেষ পর্য্যন্ত গ্যাসদূষিত রোগীর পক্ষে নিশ্বাস-প্রশ্বাস

নেওয়াও আর সম্ভব হয় না এবং অক্সিজেনের অভাবে সমস্ত শরীর নীলাভ হয়ে আস্তে আস্তে দু তিন ঘণ্টার মধ্যেই তার জীবনের যবনিকা-পাত হয়।

এগুলি ছাড়া আর একটি ভীতিপ্রদ মারাত্মক গ্যাস হচ্ছে মাষ্টার্ড গ্যাস। বহু ক্ষেত্রে এর প্রভাব থেকে মানুষের আত্মরক্ষা অত্যন্ত শক্ত। অর্থাৎ বাষ্পীয় আকারে চোক, নাক, মুখ ও গাত্রত্বকের উপর এর প্রভাব যেমন খুব বেশি পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়, তেমনি আবার তরল অবস্থাতেও বর্ষিত এই গ্যাস শ্বাসনালীর প্রদাহ, রক্তবমন, রক্তভেদ ও বাক্‌রুদ্ধ প্রভৃতি ভীষণ সব কষ্টকর উপসর্গ উপস্থিত ক'রে মানুষের মৃত্যু ঘটায়। দ্রবীকৃত অবস্থায় এর ক্ষমতা এত বেশি যে, বহু সময় সৈনিকদের পুরু সাজপোষাকও ভেদ ক'রে গাত্রত্বকের উপর এর প্রদাহ দেখা দেয়। সাধারণত মাষ্টার্ড গ্যাসের নিজস্ব কোন রঙ থাকে না এবং এটি থেকে খুব ফিকে ধরণের কস্তুরীয় একটা গন্ধ বেরুতে থাকে। তরল অবস্থায় সূর্য্যকিরণে এই গ্যাস উবে যেতে যথেষ্ট সময় নেয় বলে, স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে এর প্রতি-ক্রিয়া চলে অনেক দিন এবং জনসাধারণের অজ্ঞতাজনিত মৃত্যুও ঘটায় অসংখ্য। মাষ্টার্ড গ্যাস যদি দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করতে না পেরে গাত্রচর্ম্মেও লাগে তাহলেও পরিত্রাণ নেই ; অর্থাৎ তার সেই বিষের প্রভাবে সর্ব্বদেহে একপ্রকার ফোস্কার উদ্ভব হবে এবং সেই ফোস্কা কোনপ্রকার ঔষধপত্রেই শিগ্‌গির উপশম হতে চাইবে না। সেই জন্য এই তরল মাষ্টার্ড গ্যাস কোন পক্ষ কোথাও ফেললে, বিপক্ষীয় দল তৎক্ষণাৎ সেই সমস্ত স্থানটিকে মাটির সাহায্যে ঢাকা দিয়ে ফেলতে চেষ্টা করে।

কোন একটি গ্যাস বোমা যখন কোন ক্ষেত্রে ফেটে পড়ে, তখন সাধারণত তার ভেতরকার খানিকটা তরলাংশ বিস্ফোরণজনিত উত্তাপের দরুণ হাওয়ায় মিশে যায় এবং কতকটা অংশ ঐ স্থানের চতুর্দ্দিকেই বৃষ্টিধারার মত ছড়িয়ে পড়ে। বাষ্পে পরিণত অংশটুকুও পরে বায়ুমণ্ডলের চাপে আবার তরলাংশে পরি-ণত হয়ে ফোঁটা ফোঁটা জলের মতো পড়তে থাকে শূন্য হ'তে! কোন বসতবাড়ির ছাদের উপর গ্যাস বোমা প'ড়ে বাড়ির কোন ক্ষতি করতে না পারলেও, বাটীস্থ লোকদের যথেষ্ট অনিষ্ট করতে পারে। কারণ, ছাদ থেকে ঐ বিষবাষ্প অল্পক্ষণের মধ্যেই বায়ু চালিত হয়ে বাড়ীর চতুষ্পার্শে বিস্তৃত হয়ে পড়ে এবং নিম্নতলায়

পর্য্যন্ত তার জীবনান্তকর ক্রিয়ার প্রকোপ দেখাতে কুণ্ঠিত হয় না। অবশ্য এ অবস্থায় উক্ত বাড়ির দরজা জানালা যদি সঙ্গে সঙ্গে ভালভাবে বন্ধ ক'রে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়, তাহ'লে ক্ষতির আশঙ্কা ততটা থাকে না।

মোটের উপর বর্ত্তমান বিজ্ঞান যুদ্ধে মানুষ মারার যে ভয়াবহ ও ভীষণ উপকরণ উদ্ভাবন করেছে, গ্যাস যে তাদের মধ্যে একটি প্রধান ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তাতে আর সন্দেহ নেই। কিন্তু তা হ'লেও বিজ্ঞান আবার তার হাত থেকে রেহাই পাবারও উপায় আবিষ্কার করেছে কম নয় এবং গ্যাস মুখোস হচ্ছে তাদের মধ্যে একটি প্রধান। এই মুখোসের সাহায্যে বহু ক্ষেত্রেই প্রভূত পরিমানে উপকার সাধিত হয়েছে এবং বর্ত্তমান যুদ্ধে প্রত্যেক স্বাধীন জাতিই তার জাতীয় জনসাধারণকে বিশেষভাবে এই গ্যাস মুখোস ব্যবহার করতে শিক্ষা দিয়েছে, এবং বোমা ও গ্যাসের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্যে উপায় উদ্ভাবন করেছে যথেষ্ট।

সদাচার শিক্ষা

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম. এ.

তোমরা সকলে ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের নাম শুনিয়াছ; তিনি সুবিখ্যাত কংগ্রেস নেতা ছিলেন; শেষ বয়সে তিনি লণ্ডনস্থ ইণ্ডিয়া কাউন্সিল নামক ভারতের শাসন সম্বন্ধীয় পরামর্শ সভার সদস্য হইয়া কিছুদিন লণ্ডনে বাসও করিয়াছিলেন। তিনি বাঙ্গালার গভর্ণরের শাসন পরিষদের সদস্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার প্রভৃতি পদেও কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। একবার তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতিও নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার মুখে একটি গল্প শুনিয়াছিলাম—সেই গল্পটি তোমাদের নিকট বলিব।

গত মহাযুদ্ধের শেষে ভূপেন্দ্রবাবু যখন বিলাত হইতে স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন, তখন তাঁহাকে তাঁহার বিলাতী-জীবনের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে একদিন

কলিকাতা ইউনিভার্সিটী ইন্‌স্টিটিউটে বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করা হয়। তিনি ঐ বক্তৃতায় অনেক কথাই বলিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে যে কথাটি আমার সদাসর্ব্বদা মনে হয়, সেইটির কথাই বলিব।

যুদ্ধ শেষ হইয়াছে—যুদ্ধ-বিরতির ঘোষণাপত্র স্বাক্ষরিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। লণ্ডনে দীর্ঘ পাঁচ বৎসর পরে লোকের মুখে আনন্দ ফুটিয়া উঠিয়াছে—লোকের মন পুলকে উল্লসিত হইয়াছে। সেদিন সকল লোক পথে আনন্দ করিতে বাহির হইয়াছে। ট্রেণ, ট্রাম, বাস প্রভৃতি লোকে পরিপূর্ণ—যাত্রীদের অতি কষ্টে যান বাহনাদিতে উঠানামা করিতে হইতেছে। ভূপেন্দ্রবাবুও সেদিন লণ্ডনের অবস্থা দেখিবার জন্য বাহির হইয়াছেন। কয়েকখানা ট্রাম বা বাসে উঠিবার বৃথা চেষ্টার পর অতি কষ্টে একখানি বাসে উঠিয়াছেন—তাহাতেও বহু লোক দাঁড়াইয়া বাদুড়-ঝোলার মত ঝুলিয়া চলিতেছে। ভূপেন্দ্রবাবুর বয়স তখন ষাট পার হইলেও তাঁহার স্বাস্থ্য বেশ ভাল ছিল। তিনিও কোনরকমে দাঁড়াইয়া যাইতেই প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু তিনি বাসে উঠিয়া দাঁড়াইবামাত্র একটি ইংরাজ যুবক নিজ আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ভূপেন্দ্রবাবুকে তাহার আসনে বসিতে বলিল। ভূপেনবাবু একজন ইংরাজ যুবকের নিকট এই ব্যবহার প্রত্যাশা করেন নাই। একে তিনি কৃষ্ণাঙ্গ ও ভারতীয়, তাহার উপর বৃদ্ধ—কাজেই তিনি যুবককে স্বস্থানে বসিতে বলিলেন এবং জানাইলেন —তাঁহার দাড়ি সাদা হইলেও তাঁহার গায়ে জোর আছে এবং তিনি অল্পদূর মাত্র যাইবেন, কাজেই দাঁড়াইয়া যাইতে তাঁহার কোন কষ্ট হইবে না। কিন্তু ইংরাজ যুবক তখনই তাঁহাকে জানাইল—আমাদের দেশে বয়সের প্রতি সম্মান দেখাইতে শিক্ষা দেওয়া হয়; আপনি একজন বয়স্ক ব্যক্তি—আপনি দাঁড়াইয়া থাকিতে আমার পক্ষে আসনে বসিয়া যাওয়া শোভন হইবে না। ভূপেন্দ্র বাবুকে আসন গ্রহণ করিতে হইল। কিন্তু তিনি ঐ ইংরাজ যুবকের ব্যবহারে এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে জীবনে কখনও ঐ কথা বিস্মৃত হ'ন নাই এবং বহু সভায় বহুবার নানাভাবে ঐ কথা ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

আমরা ইংরাজী চালচলনের নকল করি বটে, কিন্তু তাহাদের নিকট হইতে এই সকল গুণ শিক্ষা করি না। প্রত্যহ ট্রামে, বাসে ও ট্রেণে কি দেখিতে পাই? আমাদের তরুণগণ বৃদ্ধের প্রতি দূরের কথা, নারীজাতির

প্রতিও উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করেন না। প্রত্যহই যখন বহু বৃদ্ধকে দণ্ডায়মান দেখিয়াও বহু যুবককে উদাসীনভাবে আসনে বসিয়া থাকিতে দেখি, তখনই ভূপেন্দ্রবাবুর এই গল্পটীর কথা আমার মনে হয় এবং আমাদেরই পুত্র স্থানীয়দের ব্যবহারে শুধু লজ্জিত হই না—দুঃখে বিষণ্ণ হইয়া পড়ি। শুধু এই ব্যবহার কেন? আমাদের শিক্ষা এমনই বিকৃত ও অসম্পূর্ণ যে—ট্রেণে, বাসে, ট্রামে বসিয়া—পাশের লোকের সুবিধা অসুবিধার কথা না ভাবিয়া আমরা নির্ব্বিকার চিত্তে সিগারেট খাইয়া থাকি। একবারও আমাদের মনে হয় না যে—আমার চারিধারে যাঁহারা রহিয়াছেন, আমার মুখনিসৃত সিগারেটের ধোঁয়া তাঁহাদের পক্ষে বিরক্তিজনক হইতে পারে। এমনভাবে সম্মুখের আসনের উপর পা তুলিয়া দিয়া বসিয়া থাকি যে, তখন মনেই থাকে না—ঐ আসনে পর মুহূর্ত্তে আমারই মত একজন ভদ্রলোককে আসিয়া বসিতে হইবে—আমার জুতার ধুলা ঐ আসনে পড়িলে তাঁহার পক্ষে তাহা ক্ষতিকর হইতে পারে। দুই বন্ধুতে যখন ট্রামে বা বাসে চড়িয়া গল্প করি, তখন মনে থাকে না যে—আমাদের গল্প অপরের শ্রুতিগোচর হইলে তাহা দ্বারা আমাদের প্রতি শ্রোতার কিরূপ মনোভাব উদ্রেক করিবে। প্রকাশ্য যানবাহনে বসিয়া আমরা এমন সব বিষয়ের আলোচনা করি—যাহা বলিতে নিজের সকল সময়েই লজ্জানুভব করা উচিত—তাহা গুপ্ত স্থানই হউক—আর প্রকাশ্য স্থানই হউক। আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা নিজ নিজ পুত্র কন্যাদিগকে এ সকল বিষয়ে কোন শিক্ষা দান প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করি না।

বাড়ীতে মাতাপিতা ভ্রাতা ভগিনীর সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও সহপাঠীগণের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, পথে ঘাটে লোকজনের সহিত দেখা হইলে তাঁহাদিগের প্রতি কিরূপ আচরণ করা কর্ত্তব্য—এ সকল বিষয়ে আমরা কোন শিক্ষাই লাভ করি না। এখন আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে ধর্ম্ম শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে বটে, কিন্তু ঐ বিষয়ে অনেকগুলি বই পড়িয়া দেখিয়াছি—অতি দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে তাহার কোন খানিই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় নাই। কেহ যদি প্রাণ দিয়া না লেখেন—তাহা হইলে তাহার সম্পূর্ণতাও হয় না। অতি বাল্যকালে যে কবিতা পাঠ করিয়াছিলাম, তাহা আজিও মনে আছে—

সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি।
সারা দিন আমি যেন ভাল হয়ে চলি॥

সেইরূপ মনে লাগার মত কবিতা ত অধিক দেখা যায় না।

আমরা ব্যবহারে কিরূপ হইয়াছি, তাহার আর একটি গল্প বলিব। ট্রামে কালীঘাট যাইতেছিলাম। আমাদের অতি নিকটেই সিটি কলেজের একজন বয়োবৃদ্ধ অধ্যাপক বসিয়াছিলেন। তিনি বহুজন পরিচিত (নামটা না হয় নাই বলিলাম)। একটি শ্বেতাঙ্গিণী তরুণী মধ্যপথে ট্রামে উঠিল—মহিলাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট আসনগুলি মহিলাদের দ্বারাই পূর্ণ ছিল। কাজেই তরুণীটিকে দাঁড়াইতে হইল। দূর হইতে দেখিলাম—সেই বৃদ্ধ অধ্যাপক মহাশয় তখনই উঠিয়া দাঁড়াইয়া তরুণীকে বসিবার স্থান দিলেন। তাহা দেখিয়া যুবকগণ ত লজ্জিত হইলেনই না—দুইটী যুবক যে মন্তব্য প্রকাশ করিলেন তাহা শুনিয়া আমাদের লজ্জায় অধোবদন হইতে হইল। সমাজের অধঃপতনের কথা ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। যুবকগণ শুধু তরুণীর প্রতি বৃদ্ধের এইভাবকে কুদৃষ্টী দিয়া দেখিয়া ক্ষান্ত হইল না—অধ্যাপক মহাশয় ব্রাহ্ম বলিয়াও বিদ্রূপ করিল। ইহা এক দিনের ঘটনা—এরূপ ঘটনা আমাদের সদাসর্ব্বদা দেখিতে হইতেছে। বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে এ সকল জিনিষ বোধ হয় বেশী করিয়াই নজরে পড়ে। তাই আজ অতি দুঃখের সহিতই কথাগুলি লিখিতেছি। স্কুলের শিক্ষক মহাশয়গণ যদি পাঠ্য পুস্তক পড়াইয়াই তাঁহাদের কর্ত্তব্য শেষ না করিয়া আমাদের সুকুমারমতি বালক-বালিকাদিগকে এ বিষয়ে কিছু শিক্ষা দেন, তাহা হইলে হয় ত এ অবস্থার কিছু পরিবর্ত্তন হইতে পারে। সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়—এবিষয়ে গৃহে মাতাপিতার বা অভিভাবকগণের অবহিত হওয়া। আমরা পুত্রকন্যার প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য বিষয়ে উদাসীন বলিয়াই আজ দেশের এই দুরবস্থা উপস্থিত হইয়াছে।

একলব্যের গুরুদক্ষিণা

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(প্রথম খণ্ড)

[রাজবাটীর সম্মুখ—ভিতরে গান হইতেছিল—

জাগো, জাগো দেবতা

আঁধারের বুক চিরে আলো জাগে ধীরে ধীরে,

আনে বারতা।

শক্তি সাধনার হোক নব জাগরণ

জড় পৃথিবীর বুকে চেতনার শিহরণ

সে তোমারি চরণে নতা—

জাগো দেবতা !]

দ্রোণ— এস বৎসগণ,

ধনু লও করে তুলি', লহ তীক্ষ্ণ শর,

দেখিব কাহার শরে

খসে পড়ে বৃন্তচ্যুত হয়ে ফল।

আজি হবে পরীক্ষা বিস্তার।

(কুরু ও পাণ্ডবগণ তীর ছুঁড়িল)

দুর্য্যোধন— অগ্রে আমি—

অর্জ্জুন— নহ তুমি দুর্য্যোধন,

অগ্রে আমি ছুঁড়িব এ তীর।

দ্রোণ— থাম বৎসগণ,

সকলেই ব্যর্থ হইয়াছ,

পারে নাই কা'রো তীর স্পর্শ করিবারে,

বহু উর্দ্ধে রয়ে গেল ফল।

(অকস্মাৎ একলব্যের প্রবেশ)

একলব্য— প্রণমি হে গুরুদেব চরণে তোমার।
অনুমতি দাও,
আমি পাড়ি' দিব ফল এক শরাঘাতে।
দ্রোণ— দিনু অনুমতি।
(একলব্য তীর দিয়া ফল পাড়িল। সকলে কোলাহল করিল,-
পড়েছে, পড়েছে।)
দ্রোণ— কহ হে বালক,
কেবা তুমি, কিবা হেতু আগমন তব?
একলব্য— গুরুদেব, আমি চাহি শিষ্যত্ব তোমার।
দ্রোণ— শিষ্যত্ব আমার?
নাহি বুঝিলাম বৎস উদ্দেশ্য তোমার।
একলব্য— উদ্দেশ্য সহজ অতি
বুঝিবার নাহিকো কারণ।
কুরু-পাণ্ডবের গুরু বিখ্যাত জগতে,—
একলব্য চাহে শিষ্যত্বের অধিকার,
দাও আজ্ঞা গুরুদেব—
দ্রোণ— একলব্য,—বুঝিয়াছি আমি
উদ্দেশ্য তোমার।
কিন্তু কহ কোন্ জাতি তুমি,
অলঙ্কৃত করিয়াছ কোন্ বংশ?
সত্য পরিচয় দাও তব।
একলব্য— সত্য পরিচয় দিব প্রভু।
একলব্য মোর নাম—নিষাদ-তনয়,
অতি হীন বংশ দেব—
পরিচয় নাহিক দিবার—
(কুরু ও পাণ্ডবগণ হাসিয়া উঠিল।)
অর্জ্জুন— নিষাদ-তনয় চাহে
শিষ্যত্বের অধিকার আজ?

দুর্য্যোধন—দেহ আজ্ঞা দাসে গুরুদেব,
অস্পৃশ্যেরে দিয়ে আসি বহুদূর।
দ্রোণ— থামো বৎসগণ!
শোন একলব্য,—
জাতিতে ব্রাহ্মণ আমি,
অস্পৃশ্যের করি না যাজনা—
মন্ত্রদান করিনাক' নিষাদেরে কভু।
ফিরে যাও নিষাদ-তনয়,
ধনুর্ব্বিদ্যা না শিখাব অস্পৃশ্যজনেরে।
একলব্য— অস্পৃশ্য!—অস্পৃশ্য?
(ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া)
তা'ই হোক—
দূর হ'তে করি প্রণিপাত।
শুধু করো মনে—
শক্তি ও সাহস আছে অস্পৃশ্যের বুকে;
তোমারে বরিয়া নিয়া গুরুদেব পদে
সে শক্তির করিব সাধনা
যদি ভক্তি থাকে,
একদিন সিদ্ধিলাভ করি'
জানাব তোমারে প্রভু, মিটাব দক্ষিণা।
(প্রণামান্তে একলব্যের প্রস্থান।)
দুর্য্যোধন— উঃ, অস্পৃশ্যের অহঙ্কার সহেনাক' প্রভু।
অর্জ্জুন— আদেশ করুন গুরু—লই প্রতিশোধ।
দ্রোণ— আবশ্যক নাই বৎস!
অস্পৃশ্য গিয়াছে চলে বক্ষে ব্যথা বহি',
আর ওরে করো না লাঞ্ছনা।
এসো,—কর আর লক্ষ্য ভেদ,—
ভুলে যাও নিষাদের কথা।

(দ্বিতীয় খণ্ড)

[বন—একলব্য আসনে উপবিষ্ট। হঠাৎ তথায় একটা কুকুরের আগমন। কুকুরের চীৎকার—]

একলব্য— আরে, আরে পাপিষ্ঠ কুকুর
গুরুর মূরতি বুঝি অপবিত্র করে—
(একলব্য তীর নিক্ষেপ করিল। কুকুর নিঃশব্দ হইল। দূরে অর্জ্জুনের কণ্ঠস্বর—)

অর্জ্জুন—গুরুদেব কর দৃষ্টিপাত—
কুকুরের মুখে পঞ্চবাণ, শব্দ নাহি বার হয় মুখে।

ভীম— কে করেছে শরাঘাত এরে ?

অর্জ্জুন— আশ্চর্য্য !
আশ্চর্য্য শিক্ষা ! এ কী শর প্রভু ?
এ বিদ্যা ত' শিখি নাই মোরা !

দ্রোণ— আমিও বিস্মিত বৎস !
চল ওই তপস্বীর পাশে
হয় ত বা জানে সে সব।

(একলব্যের নিকটে সকলের গমন। একলব্য ধ্যানরত, পার্শ্বে তীর ধনুক, সম্মুখে দ্রোণের মৃন্ময় মূর্ত্তি।)

অর্জ্জুন— প্রভু, এ কি হেরি ?
এ তপস্বী বড় পরিচিত,
এ যে সেই নিষাদ-তনয় !

দ্রোণ— বড়ই বিস্মিত আমি !

দুর্য্যোধন— তোমার মূরতি গুরু ইহার সম্মুখে।
(একলব্যের ধ্যান ভাঙ্গিয়া গেল।)

একলব্য— গুরু, গুরু !
মূর্ত্তি ধরি' আসিয়াছ সম্মুখে আমার ?

আমার সাধনা
টলাতে পেরেছে তোমা' দেব ?
দ্রোণ— আসিয়াছি আমি বৎস।
কুকুরের মুখে বিঁধে তীর
শব্দহীন কে করিল তা'রে ?
সে কি তুমি ?
একলব্য— আমি,—আমি প্রভু,
একান্ত সেবক তব।
বৎসর এসেছে কত গিয়াছে কাটিয়া,-
অনশনে, অনিদ্রায়, অনাহারে
কাটিয়াছে রাত্রিদিন মম ;
করিয়াছি আরাধনা তব।
গুরু,—
তুমি দেহ অভীষ্ট আমায়,
ওই তীর—বীজমন্ত্র দানি'—
দ্রোণ— আমি ?
অর্জ্জুন— গুরু !
একদিন বলেছিলে তুমি
আমি তব প্রিয় শিষ্য।
আমাকে যা' শিখাইবে তুমি
জগতের কেহ না জানিবে।
জানিলাম এবে—
করেছ বঞ্চনা মোরে,
শ্রেষ্ঠ-বিদ্যা করিয়াছ দান
নিষাদ-তনয়ে।
দ্রোণ— মিথ্যা এই বাণী বৎস,—
মিথ্যা অভিমান।
তুমি মোর প্রিয় শিষ্য বিদিত জগতে,-

তোমা ছাড়া ধনুর্ব্বিদ্যা সব কিছু দিতে
পারি নাই কা'রে আমি।
তিষ্ঠ ক্ষণকাল,—
উপায় বিহিত আমি করিব এখনি।

একলব্য— ক্ষণকাল তিষ্ঠ দেব,—
দূর হতে লহ—
অস্পৃশ্য শিষ্যের অর্ঘ্য রাতুল চরণে।

দ্রোণ— সুখী আমি বৎস ;
কিন্তু তুমি দক্ষিণা ত' কর নাই দান
গুরুরে তোমার।
দক্ষিণা ব্যতীত
শিক্ষা তব হবে না সফল।

একলব্য— আদেশ করুন প্রভু,
যা' বলিবে দিব তা' এখনি।

দ্রোণ— বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দাও তবে দক্ষিণা আমায়।

একলব্য— বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ?—
(নীরব থাকিয়া)
তাই লহ গুরুদেব।
চিরকাল অকর্ম্মণ্য থাকি'
লভিব সান্ত্বনা মনে অঙ্গুষ্ঠ আমার
গুরুরে করেছি দান।
লহ গুরুদেব—
দীন সন্তানের তব ক্ষুদ্র উপহার।
(বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কাটিয়া দ্রোণের চরণে দান করিল)

দ্রোণ— ধন্য তুমি নিষাদ তনয়,
গুরুভক্তি থাক তব বিখ্যাত জগতে।
আমি দ্রোণ,—উগ্র বংশোদ্ভব,
তোমার মহত্ত্ব পাশে নোয়াইনু শির
জয় হোক তব।

গুরু-শিষ্য

শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

'চিক মারা গেছে!'

ফ্রান্সের সুপ্রসিদ্ধ শিল্পাচার্য ডেভিড এক মনে ছবি আঁকছিলেন। কথাটা শুনে চোখে মুখে অবিশ্বাস ফুটে উঠল।

'অসম্ভব!' অস্পষ্ট ভাঙা স্বরে বলে উঠলেন। কিন্তু যে ছেলেটি খবর নিয়ে এসেছে তার মুখচোখের করুণ বিষণ্ণতাই নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে তার দেওয়া খবর মিথ্যা নয়, সত্য।

আচার্য টলতে টলতে ঘরের আর এক কোণে গিয়ে উপস্থিত হলেন, সেখানে একখানি ছবি সমাপ্তির প্রতিক্ষায় ইজেলের উপর কাত হয়ে আছে। ছবির বর্ণ-সম্পদ আরও উজ্জ্বল হয়ে আচার্যের চোখে ধরা পড়ল। তিনি খানিকক্ষণ ছবিখানির দিকে সতৃষ্ণনয়নে চেয়ে রইলেন, পরে ছবিখানি ঢেকে রাখলেন।

'অসম্ভব!' আবার তিনি বলে উঠলেন। 'চিক কখনও মরতে পারে না········· তার অসম্পূর্ণ চিত্র সম্পূর্ণ করবার জন্যে সে নিশ্চয় বেঁচে থাকবে···'

ইতিমধ্যে ডেভিডের আরও কয়টি শিষ্য এসে ষ্টুডিওতে প্রবেশ করল। তাদের সকলকার মুখেই বিষাদের ছায়া ঘণিভূত। চিক এদের সকলকার চেয়ে বয়সে ছোট, কিন্তু যোগ্যতায় সকলের চেয়ে বড়। তারা তার শক্তিকে ঈর্ষা করে না; তার সহজ সরল হাসিখুশী ব্যবহারে সকলেই খুশী, সকলেই তাকে বন্ধু বলে গ্রহণ করেছিল। সেই সকলের প্রিয় চিক বসন্ত মহামারিতে মারা গেল।

আচার্য একখানি চেয়ারে বসে পড়লেন।

'ওর বয়স কত হয়েছিল ?' তাঁর স্বরে ক্লান্তিমাখা।

একজন বললে, 'সবে সতেরয় পা দিয়েছে। আমার চেয়ে দু বছরের ছোট ছিল।'

ছেলেটির নাম—আঁদ্রে চিক। তার বাবা ফলের ব্যবসা করতেন। শৈশবেই তার শিল্পানুরাগ ধরা পড়ে এবং শিল্পাচার্য ডেভিড তাকে শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করেন। ডেভিডের শিল্পাগার তখনকার দিনে ইউরোপের শিল্পরসিকদের কাছে সম্ভ্রমের বস্তু। এখানকার বর্ণসুষমা, রুচি ও গঠননৈপুণ্যের খ্যাতি সর্বত্র, আর চিক এখানকার সকল বৈশিষ্ট্যকেই আয়ত্ত করতে পেরেছিল। বয়স তার এতটুকু প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। আচার্য তাঁর এই কিশোর শিষ্যটিকে নিজের সমস্ত শক্তি সামর্থ্য দিয়ে তৈরি করছিলেন পরম আগ্রহে।

কিশোর শিল্পীর আঁকা ছোট ছোট তৈলচিত্রগুলির রুচি, বর্ণবিন্যাস ও সুষমা অতুলনীয়, নিখুঁত, সুসম্পূর্ণ। তার মৃত্যুর পর ডেভিড তার আঁকা চিত্রগুলিকে বর্ণসুষমা ও তুলির নৈপুণ্য হিসেবে সর্বত্র দেখিয়ে বেড়াতে লাগলেন।

যখন কোন ছাত্র তাঁকে কোন চিত্র দেখাবার জন্যে নিয়ে আসত তাতে রং ও রুচির অভাব দেখলেই তিনি মাথা নেড়ে বলে উঠতেন, 'না, এ চিক নয়।'

আবার যখন কোন চিত্র দেখে তিনি খুশী হতেন, চেঁচিয়ে উচ্ছ্বাসভরে বলে উঠতেন, 'হাঁ, হাঁ, এ চিক্ বটে, ঠিক চিক !'

এমনি করে তাদের কিশোর সঙ্গীর নামটা তাদের জীবনে চিত্রের উৎকর্ষতা বোধের মধ্যে মিশে গেল। তারা এ শব্দটি দিয়ে নিখুঁত উৎকৃষ্ট চিত্রকে বোঝাতে লাগল। সুদীর্ঘকাল শিল্পাচার্য ডেভিড শুধু ফ্রান্সে নয়—সমগ্র ইউরোপে রুচি-সম্পন্ন শিল্পী বলে শিল্পরসিকদের কাছে শ্রদ্ধা পেয়েছেন। সুতরাং চিক শব্দটি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল সেই অর্থে যে অর্থে স্বয়ং আচার্য তার প্রয়োগ করতেন।

দেখতে দেখতে 'চিক' (Chique) ডেভিডের শিল্পাগার থেকে সমগ্র জগতে ছড়িয়ে পড়ল। নরনারী এই শব্দটিকে চিত্রের উৎকর্ষতার প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করতে লাগল এবং একদিন ভাষায়ও শব্দটি গৃহীত হল, তবে শব্দটির বানান বদলে নিয়ে—Chiqueএর নতুন রূপ হল Chic, অর্থ হল—যা অনন্যসাধারণ।

ডেভিড ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন, সাঁইত্রিশ বছর আগে তাঁর প্রিয়তম শিষ্য চিক তার কাজ অসম্পূর্ণ রেখেই মারা যায়। ইতিমধ্যে ফ্রান্সের একটা বিরাট পরিবর্তন ঘটে—প্রসিদ্ধ ফরাসী বিপ্লব তখন ইউরোপকে ভেঙেচুরে গড়ে তুলছে। মৃত্যুর শেষ মুহূর্তে আচার্যের মুখ থেকে একটিমাত্র শব্দ উচ্চারিত হল—'চিক', কিন্তু এ যে তার পরমপ্রিয় শিষ্যের নাম, কেউ তা বুঝতে পারল না।

'চিক (Chique) মরে গেছে' কিন্তু 'চিক (Chic) অমর হয়ে আছে।'

"অরুণের মামার বাড়ী"

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

[অরুণের মামার বাড়ি পুরী। দুই রাজার প্রতাপ সেখনে। বড় রাজা জগন্নাথ দেব থাকেন আয়েস নিয়েই। যেই জন্যই বোধ হয় ছোট রাজা বরুণ দেব অর্থাৎ সমুদ্র·········যাক্, সব কথা বলাই হ'য়েচে নীচে]

১

অরুণ, তোমার মামার বাড়ি
বরুণ দেবের তম্বি ভারি
একলা ব'সে, স্থির নয়নে
দেখেচি তাঁরই জারিজুরি ॥

২

অনেক দূরের আরও পরে
আকাশ যেথা হুমড়ে পড়ে
সেখান থেকে রাজ্য তাঁহার
আমি যেথায় কলম ধ'রে ॥

৩

গর্জ্জনে যায় আকাশ ফেটে!
(মানতে হবে—রাজা বটে!)
আহার নিদ্রা ছেড়ে দিয়ে
অষ্ট প্রহর আছেন চটে !!

৪

ঢেউয়ের সেপাই দিগ বিদিকে
ছুটচে নিতুই বিষম রুখে
আছাড় খেয়েই মরচে নৈলে
যা'কেই হোক্‌না—নি তো দেখে!

সকাল বেলায় রাজার চক্ষু
রক্তবর্ণ, মেজাজ রুক্ষু !
দিনে—রেতে শান্ত কভু
দেখলাম না, রৈল দুঃখু !!

৬

বলব কত ?—আট প্রহরে
পবন ক'ষে ব্যজন করে
মেজাজ—"থামো" নামবে আশায়
হায়রে !—ততই ঊর্দ্ধে চড়ে !

৭

সেদিন কি যে হ'ল চিতে,
বেরস্পতির বার বেলাতে,
দিব্যি ছিলেন, হঠাৎ মেজাজ
একেবারে সপ্তমেতে !!

হুঙ্কারেতে আকাশ কাঁপে
ঊর্ম্মি জাগে ভীষণ দাপে,
দক্ষ যজ্ঞে শিবকে ঘিরে,
ভূত বুঝি সব মাতল' লাফে !

৯

লুটিয়ে কানন-কেশের রাশি
কান্দে ধরা ; বিশ্বত্রাণী
মূর্ত্তি হেরে সূর্য্যি ঠাকুর
মেঘের মধ্যে গেলেন পশি ॥

১০

উছলে মেঘের পাত্র তখন
বৃষ্টিধারা নামল সঘন্
ভাবা গেল "শাওয়ার-বাথে"
খুলি ঠাণ্ডা হবেই এখন ॥

১১

হায়রে ভ্রান্তি ! উনুন 'পরে
যে-কড়াটি আছে চ'ড়ে—
জল-আছড়ায় ঠাণ্ডা হবে,
এমন ভরসা মূর্খে করে ॥

১২

বৃষ্টি নামতে, শুনচ অরুণ ?—
সে যে মূর্ত্তি ধ'রল বরুণ
ভয় পাবে, তাই সাঁটেই বলি—
"জুজুর" চেয়ে আরও দারুণ !!

\+ + + + +

১৩

অরুন, তোমার মামার বাড়ি
দু'টি রাজার প্রতাপ হেরি,—
(১) সাগর—আছেন চোখ রাঙিয়েই
(২) জগন্নাথ—তাঁর আয়েস্ ভারি ।—

১৪

বিশ্ব-বোঝা মাথায় নিয়ে
তিনি কাটান খেয়েই শুয়ে
গয়না-গাঁটির শখও ভীষণ,
কাপড়-জামায় প্রাসাদ ছেয়ে !

১৫

সকাল বেলায় বৃথাই খোঁজা
বাল্য-ভোগে আছেন রাজা,
দুপুরে যাই, সাড়ম্বরে,
রাজার বেশে হ'চ্চে সাজা !

১৬

বিকাল বেলায় ধর্ণা দিলে
শয়নকক্ষ নাহি খোলে,
রাত্রে সাজেন রত্ন-সাজে
যেতেই সাহস নাহি মেলে।

১৭

দু'বার বুঝি সমারোহে
বসেন সভায় (লোকে কহে)
আমি তখন থাকি প'ড়ে
শ্রান্ত মনে, ক্লান্ত দেহে ॥

১৮

আশায় আশায় জীবন গেল,
অনেক কথাই বলার ছিল
সার হ'ল হায় দু'টি কথা,—
"দুয়ার খোলো, দুয়ার খোলো ॥"

* * *

১৯

অরুণ, তোমার মামার বাড়ি
আবার ফিরে আসতে পারি
দু'জন রাজাই কিছু কিছু
স্বভাব যদি দেন বা ছাড়ি'।—

২০

ইনি একটু মেজাজ কমান
অষ্ট প্রহর হল্লা থামান ;
আয়েস ছেড়ে, কথা শুনে,
উনি মনের বোঝা নামান ॥

চীনদেশের প্রাচীন যাত্রী

অধ্যাপক ডক্টর শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী

জাতীয় জীবন গঠনে ইতিহাস অনেক সময় আমোদের পথ প্রদর্শক হয়। অতীত আমাদের উদ্বুদ্ধ করে। মানুষের ব্যক্তিগত জীবন যেমন সমাজের বাইরে সম্পূর্ণ বিকাশ লাভ করে না, অন্যের সাহায্য যেমন তার নিতান্ত আবশ্যক হয় জাতীয় জীবনও তেমনি অন্যান্য জাতীর সংস্পর্শ ব্যতীত পল্লবিত হয় না।

অন্যান্য জাতীর সহিত আদান প্রদান তা'র গঠনে সহায় হয়। এ কথা আমাদের পূর্ব্বগামীরা বেশ উপলব্ধি করেছিলেন। তাই নিজেদের দেশকে একটা গণ্ডির ভিতর বদ্ধ করে না রেখে, শুধু এই ভারতের মধ্যে তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করে না রেখে, বাইরের জাতির সংস্পর্শে এসেছিলেন। পরকে যেমন তাঁরা নিজেদের রত্ন বিলিয়ে দিয়েছিলেন আবশ্যকমত পরকীয় বস্তুও তেমনি তাঁরা ধার করে নিয়েছিলেন। দুর্গম হিমালয় তাঁদের সে গতিতে বাধা দিতে পারে নাই, মহাসাগরও তাঁদের গতিবিধির অন্তরায় হয় নাই। এশিয়া খণ্ডের প্রাচ্যদেশ সমূহকে ভারতের মণীষিরা কি দিয়েছিলেন, কেমন করে বহু অজানাকে তাঁরা জানাবার চেষ্টা করেছিলেন, কেমন করে পরকে তাঁরা নিকট বন্ধু করে নিয়েছিলেন এবং কত ঘরে যে তাঁরা সমাদরে ঠাঁই পেয়েছিলেন সে কথার কিছু আভাস আজ তোমাদের দেবার চেষ্টা করবো।

পূর্ব্বগামীদের চরণচিহ্ন অনুসরণ করে এস আবার আমরা চীন যাত্রা করি। যে পথে তাঁরা গিয়েছিলেন, যে যান বাহনে তাঁরা দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছিলেন, ঐতিহাসিকের তুলিতে এস আমরা তাহা বিচিত্র করি। সমুদ্র পথে যদি যেতে চাও তবে যাত্রা অল্পসময়সাধ্য হ'বে। ভারতের যে কোন প্রাচীন পত্তন, তাম্রলিপ্তি, চরিত্রপুর, শ্রীকাকুলম্, স্থর্পারক বা ভরুকচ্ছ থেকে তোমরা যাত্রা করতে পারবে।

রূপণারাণের মোহানায় যে তাম্রলিপ্তি আজ ক্ষুদ্র গ্রামে পরিণত তাহা তখন বহুজনসমাকীর্ণ পত্তন। বহুদেশজাত পণ্যসম্ভারে তার বিপণী সুশোভিত। দেখ্‌বে নানাদেশের অর্ণবপোত সেখানে সফরে এসেছে। শ্রীবিজয়, মলয়, প্রভৃতি দেশের জঙ্গডিঙ্গা, চীন দেশের সাম্পান, এবং পারস্য দেশের জাহাজ। হয়ত ভারতীয় পোতের ভিতর চাঁদসদাগরের 'মধুকরের' সন্ধান পাবে। হয়ত দেখ্‌বে 'রণজয়া', 'মহাকায়া' প্রভৃতি যুদ্ধবাহিনী পোতও সে ঘাটে বাঁধা রয়েছে।

চীন দেশের সাম্পানেই তোমরা যাত্রা কর। তার বহু প্রকোষ্ঠের কোন একটীতে তোমাদের স্থান হ'বে। অর্থ বিনিময়ে আবশ্যক মত আহার ও পানীয় পাবে। সে জন্য চিন্তিত হ'ও না। এ যাত্রায় তোমরা একক নও। দেখবে বহু ভারতবাসী তোমাদের সহযাত্রী। উৎকলিঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশের বণিক

এসেছে। চম্পা ও মগধের সওদাগরও বাণিজ্যে চলেছে। স্বদেশবাসী কোন বৌদ্ধ শ্রমণকেও হয়ত কোন প্রকোষ্ঠে দেখতে পাবে। ফা-হিয়ান, বা হিউয়ান-চাং এর কোন আত্মীয়ও হয়ত সেই সাম্পানেই উঠেছেন। সারা ভারত পরিভ্রমণ করে ও বৌদ্ধ গ্রন্থের বহু পুঁথী সংগ্রহ করে দেশে ফিরে চলেছেন।

বঙ্গোপসাগরের উপকূল ভাগ বহিয়া তোমাদের সাম্পান চলেছে। ব্রহ্ম দেশের উপকূলে অবস্থিত রামণ্য দেশ, দ্বারাবতী, রমাবতী, হংসাবতী, সুবর্ণভূমি প্রভৃতি হিন্দু উপনিবেশ বামে করে চীনা সাম্পান সাগর পথ অতিক্রম করে চলেছে। প্রতিকূল বায়ুর প্রতিঘাতে কখনও মন্থর, অনুকূল বায়ুর প্রভাবে কখনও বা দ্রুত-বেগে সাম্পান চলেছে। বঙ্গসাগরের ঘূর্ণিবাত্যায় কখনও বা নাবিকেরা বিপদ আশঙ্কা করছে। কর্ণধার তখন গাবরদের উৎসাহিত করছে, দাঁড়ী বুক বেঁধে দাঁড়ে বসেছে, কর্ম্মকার তার যন্ত্রপাতি নিয়ে ছিদ্র সারবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। ডুবারীও প্রস্তুত হয়েছে। আবশ্যক হ'লে তা'কেও জলে নাবতে হ'বে ও বাইরের থেকে পোতের ছিদ্র বন্ধ করতে হ'বে।

সুবর্ণদ্বীপ অতিক্রম করে মলয় উপদ্বীপের দেশ বিশেষে এখন তোমরা উপস্থিত হয়েছ। এ দেশে হিন্দু উপনিবেশের প্রতিষ্ঠা এখনো হয় নাই। কারণ এ দেশের অধিবাসীরা অসভ্য অবস্থায় রয়েছে। এরা শুধু অসভ্য নয়, দুর্দ্ধর্ষ। সুবিধা মত রাত্রির অন্ধকারে নিজেদের ক্ষুদ্র ডিঙ্গীতে এসে বণিকদের পোত লুণ্ঠন করে থাকে। এ দেশ অতিক্রম করবার সময় তাই জলদস্যুর বিরুদ্ধে প্রতি পোতেই আয়োজন রাখতে হয়। মীরবহর তাঁর পাইকদের প্রস্তুত করে রাখেন। আরোহীদের হাতেও অস্ত্রশস্ত্র দেওয়া হয়। আবশ্যক হ'লে তাদেরও যুদ্ধ দিতে হয়। কিন্তু হয় ত এ যাত্রায় তোমাদের সে বিপদ উপস্থিত হ'বে না। তোমরা নির্ব্বিঘ্নে মলয় উপদ্বীপের কটাহ দেশে এসে পৌঁছিবে। এদেশের তক্কোল পত্তনে থামতেই হবে। কারণ এ দেশ তোমাদের অপরিচিত নহে। বহু ভারতীয় বণিক এখানে বাণিজ্য করে। এ দেশ জাত গন্ধ-দ্রব্য পাটলীপুত্র-নগরের বিলাসিনীদের অঙ্গ সুরভী করে। কৌশাম্বীর রাজকুমারগণের কক্ষ সে গন্ধে আমোদিত হয়। এবং উজ্জয়িনীর কুলকামিণীরা তা' দিয়ে তাঁদের সাটীকা সুবাসিত করেন।

এ দেশের অধিবাসীরা হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী। রাজাও হয়ত ভারতীয় কোন রাজবংশের সহিত সংশ্লিষ্ট। শ্যামদেশের যাত্রীরা এই পত্তনেই অবতরণ করবে এবং অন্য যানবাহনে নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌছিবে। কম্বুজ রাষ্ট্রের যাত্রীরাও এপথে যেতে পারে। এ রাষ্ট্রও তোমাদের অপরিচিত নহে। রাজা হিন্দু। বহু ভারতীয় সেখানে বাণিজ্য, ধর্ম্মপ্রচার, রাজ্যশাসন প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। সেখানে কেহই আমাদের বিধর্ম্মী নহে। কেহ শৈব, কেহ বৈষ্ণব, কেহ বা বৌদ্ধ। পণ্ডিতেরা সংস্কৃত আলোচনা করেন। তাঁরা সংস্কৃত সাহিত্য, দর্শন, ব্যাকারণ প্রভৃতিতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন।

কিন্তু কম্বুজরাষ্ট্র বর্ত্তমানে তোমাদের গন্তব্য স্থান নহে। কারণ তোমরা চীনদেশের যাত্রী। তক্কোল পত্তন থেকে পুনরায় যাত্রা করে, লঙ্কাশুক প্রভৃতি দেশ বামে রেখে মলয় উপদ্বীপ প্রদক্ষিণ করে শ্রীবিজয় দেশের শ্রীবিজয় পত্তনে পৌছিতে হয়। এ দেশও তোমাদের সুপরিচিত। শ্রীবিজয় হিন্দুরাজ্য। মলয় দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে শ্রীবিজয় পত্তন শিক্ষার সব চেয়ে বড় কেন্দ্র। এ স্থানের বৌদ্ধবিহার নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমকক্ষ। চম্পা, কম্বুজ, যবদ্বীপ, চীন প্রভৃতি দেশের থেকে পণ্ডিতেরা এখানে সংস্কৃত ভাষা ও বৌদ্ধসাহিত্য অধ্যয়ন করতে আসেন। বাঙ্গালার পণ্ডিতকুলতীলক দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান শ্রীবিজয় পত্তনেই আচার্য্য ধর্ম্মকীর্ত্তির নিকটে শাস্ত্রের বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করবার জন্য এসেছিলেন।

এখান থেকে পুনরায় যে কোন অর্ণবপোতে চীন যাত্রা করতে পারা যায়। কারণ পত্তন হিসাবে ইহা বাণিজ্যের খুব বড় কেন্দ্র।

সমুদ্র পথে শ্রীবিজয় থেকে চীনদেশ যাত্রা করবে? দক্ষিণ সমুদ্র অতিক্রম করে, চম্পাদেশ বামে রেখে অর্ণবপোত ক্যাণ্টন পত্তনাভিমুখে ব'য়ে চলেছে। চম্পার উপকূলেও ইচ্ছা করলে নামতে পারা যায়। চম্পা হিন্দুরাষ্ট্র। সে দেশের প্রসিদ্ধ পত্তন সমূহের ভিতর পাণ্ডুরাঙ্গ বিজয়ে চীনেদের বহু পোত বাণিজ্য করতে যায়। চম্পার উপকূল থেকে ক্যাণ্টন পত্তনে পৌছিতে তোমাদের দশ দিনের বেশী লাগবে না।

এবার যে দেশে তোমরা পৌছেছ সে দেশের কথা হয় ত পূর্ব্বেই শুনেছ। এ বিশাল দেশ ভারতের প্রত্যন্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এ দেশের সব চেয়ে বড় নদী

ইয়াং চে কিয়াং বা লোহিত গঙ্গার হিমালয় থেকে উৎপত্তি। এ দেশের জাতির সঙ্গে ভারতের উত্তর পূর্ব্বাংশের জাতি সমূহের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। কিন্তু এ দেশের সভ্যতার সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতা যে ওতপ্রোতভাবে জড়িত তাহা কি কখনও অনুমান করেছ?

এ দেশের প্রতি নগর ও প্রধান পল্লীতে বৌদ্ধ মন্দির আছে। মন্দির সংলগ্ন সংঘারাম। এই সংঘারামে ভিক্ষুরা তোমাদের আশ্রয় দেবে। শাক্যমুনির জন্মভূমি থেকে এসেছ শুনে এ দেশের কত পণ্ডিত তোমাদের কাছে ছুটে আসবে। তাঁদের সঙ্গে আলাপ করতে অসুবিধা হবে না। কারণ ভারতের দেবভাষা সংস্কৃতে অনেকে ব্যুৎপন্ন।

এ জাতির চিন্তার ধারা আমাদের চিন্তার ধারার চেয়ে পৃথক। এঁরা ভাব প্রবণ নয়। পরলোকের ভাবনা এঁদের মনে বড় স্থান পাইনি। ভারতের শিক্ষা প্রণালী এঁদের মনঃপূত। সেই জন্যই বৌদ্ধধর্ম্মকে এঁরা বরণ করে নিয়েছেন। নগরে, পল্লীতে বৌদ্ধবিহার নির্ম্মিত হয়েছে। সুধু ধর্ম্ম-প্রচারই তার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। শিক্ষা বিস্তারই লক্ষ্য। শিক্ষার্থী সেখানে জীবনের প্রথম যাপন করে ও শিক্ষালাভ করে। পণ্ডিত সেখানে শাস্ত্রালোচনার সুবিধা পান। ভারতের আচার ব্যবহার এঁদের আদর্শ ও শিক্ষার অঙ্গ। তাই ই-চিংএর মত পণ্ডিত ব্যক্তি নিজেদের দেশের আচার শাস্ত্রসম্মত মনে না করে ভারতীয় বৌদ্ধ ভিক্ষুদের আচার স্বদেশবাসীর জন্য লিপিবদ্ধ করেছেন।

এ জাতি ঐতিহাসিক। আমরা যেমন নিজের দেশের অতীত কাহিনী বিস্মৃতিরগর্ভে নিক্ষেপ করেছি, এঁরা তা করেন নি। প্রাচীনকাল থেকে আরম্ভ করে এঁদের জাতীয় কীর্ত্তিকলাপ এঁদের ইতিহাসের প্রতি ছত্রে ফুটে উঠেছে। এমন কি আমাদের যেসব পূর্ব্বগামীদের কোন খোঁজই আমরা রাখি না, তাঁদের খবরও এ জাতির ইতিবৃত্তে স্থান পেয়েছে। কুমারজীবের নাম কি কখনও তোমরা শুনেছ? কাশ্মীরের রাজকুমার গুণার্ম্মণের নালন্দার দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত প্রভাকর মিত্র প্রভৃতির নামের উল্লেখ আমাদের ইতিহাসের কোথাও নাই। কিন্তু যে দেশে এসেছ এ দেশের প্রতি শিক্ষিত ব্যক্তিই তাঁদের নাম জানেন।

বহু শাস্ত্রের খোঁজ এঁরা রাখেন। ন্যায় বৈশেষিক প্রভৃতি হিন্দুশাস্ত্রের আলোচনা ও চীনাভাষায় অনুবাদ এঁরা করেছেন। সাংখ্যকারিকার সহিতও

এদেশের পণ্ডিতেরা সুপরিচিত। ভারতীয় জ্যোতিষ ও গণিতের সহিত এঁদের পরিচয় আছে। চরক ও সুশ্রুত প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ এদেশের পণ্ডিতেরা পড়েছেন। এ সম্বন্ধে কেহ কেহ হয়ত তোমাদের প্রশ্ন করবেন। কারণ তাঁরা জ্ঞানার্থী।

আমাদের দেশে বৌদ্ধগ্রন্থের পুঁথী দুর্লভ। অনেক গ্রন্থ আমাদের দেশ থেকে নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু এ দেশের প্রতি সংঘারামে সে সব গ্রন্থ সুরক্ষিত হয়ে রয়েছে। বৌদ্ধধর্ম্মের সমস্ত সম্প্রদায়ের সাহিত্য এদেশের পণ্ডিতেরা সযত্নে অনুবাদ করেছেন। হীনযানের সমস্ত সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম্মের খোঁজ পাবে। মহাযানের প্রজ্ঞাপারমিতা প্রভৃতি গ্রন্থ, যোগাচার ও মাধ্যমিক দর্শনের গ্রন্থ ও তন্ত্রযানেরও বহু গ্রন্থ এঁরা সযত্নে রক্ষা করেছেন। কিন্তু এ রত্ন কে বিলিয়ে গিয়েছে? ভারতীয় পণ্ডিতেরাই এ দেশে দলে দলে এসে রত্ন বিলিয়েছেন।

তোমাদের সঙ্গে যদি কোন সংস্কৃত গ্রন্থ থাকে তবে এদেশের পণ্ডিতেরা নিশ্চয়ই অনুবাদ করতে অনুরোধ করবেন। তাঁদের ভাষা না জান্‌লেও তাতে চিন্তিত হবার কারণ নাই। কারণ পূর্ব্বগামী ভারতীয় পণ্ডিতেরাও অনেকে চীনাভাষা জান্‌তেন না। তবুও তাঁদের নাম অনুবাদকের হিসাবে উঠেছে। তোমরা স্বীকৃত হলে অনুবাদের দিন স্থির হবে। প্রতি সংঘারামে নিমন্ত্রণ পাঠান হবে। হয়ত নগরের রাজপ্রতিনিধি সদলে অনুবাদ সভায় উপস্থিত থাক্‌বেন। অনুবাদকের পাশে সংস্কৃতে ব্যুৎপন্ন চীনা পণ্ডিত বস্‌বেন। লিখবার জন্য লেখক বস্‌বেন। অনুবাদের যথার্থতা আলোচনা করবার জন্য পণ্ডিত উপস্থিত থাকবেন। তোমাদের যিনি অনুবাদক তাকে শুধু মূল গ্রন্থ পাঠ করতে হবে। মাঝে মাঝে সংস্কৃতে ব্যাখ্যা করলেই চল্‌বে। দোভাষী তাহা চীনাভাষায় অনুবাদ করবেন। সাহিত্যিক তাকে সাহিত্যের ভাষায় পরিবর্ত্তিত করবেন। লেখক লিখ বেন। সমালোচক অনুবাদের যথার্থতা আলোচনা করবেন। হয়ত রাজপ্রতিনিধি অনুবাদের ভূমিকা লিখবেন। তোমরা নানা-প্রকারে সম্মানিত হ'বে। এ সম্মান তোমাদের দেশবাসীর প্রতি নূতন নয়! ভারতের অনেক চিরস্মরণীয় মহাপুরুষ এদেশে তাঁদের চরণরেণু রেখে গেছেন!

আকাশ নীল

—"বনফুল"

[জমিদার জনার্দ্দন রায়ের বাড়ির সম্মুখস্থ বাগান। বাগানের একপ্রান্তে জনার্দ্দনবাবুর প্রকাণ্ড বাড়িখানা এবং অপরপ্রান্তে প্রকাণ্ড গেটটা দেখা যাইতেছে। গেটটা খোলা আছে। গেটের ভিতর দিয়া একটি 'বল্' সবেগে আসিয়া বাগানের ভিতর পড়িল এবং লাফাইতে লাফাইতে গিয়া একটা ঝোপে ঢুকিয়া গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অমল আসিয়া প্রবেশ করিল। অমলের বয়স বছর দশেক হইবে। চেহারায় তেমন কোন বিশেষত্ব নাই। শ্যামবর্ণ, রোগা গোছের। অমল এ প্রদেশে আগন্তুক, তাই নির্ভয়ে জনার্দ্দন রায়ের বাগানে প্রবেশ করিয়াছে। এ অঞ্চলের কোন বালক পাগল জনার্দ্দন রায়ের ত্রিসীমানায় ঘেঁসে না। অমল বাগানে ঢুকিয়া বলটি খুঁজিতে লাগিল। একটু পরেই অমলের খেলার সঙ্গী বিশু আসিয়া গেটের বাহিরে দাঁড়াইল। বিশু অমলের সহপাঠী এবং এইখানেই তাহার বাড়ি। অমল ছুটিতে বিশুর বাড়িতেই বেড়াইতে আসিয়াছে। বিশু গেটের বাহিরে দাঁড়াইয়া অমলকে ডাকিতে লাগিল।]

বিশু। অমল চলে এস তুমি—

অমল। বলটা খুঁজে নিয়ে যাচ্ছি।

বিশু। বল থাক, চলে এস তুমি—

অমল। [সবিস্ময়ে] কেন ?

বিশু। চলে এস, তারপরে বলছি।

অমল। বলটা নিয়ে আসি, থাম।

বিশু। আরে, আমি বলছি বল থাক, চলে এস তুমি। জনার্দ্দনবাবু বড় ভয়ানক লোক।

অমল। কেন, কি করবে ?

বিশু। ধরলে আর আস্ত রাখবে না।

অমল। ইস্।

বিশু। সত্যি বলছি, পালিয়ে আয়।

[অমল বিশুর কথা গ্রাহ্য না করিয়া বল খুঁজিতে লাগিল]

বিশু। এই অমল—

অমল। বলটা খুঁজে নিয়ে যাচ্ছি, দাঁড়া না।

বিশু। পাগলা যদি বেরিয়ে আসে ভয়ানক কাণ্ড করবে।

অমল। পাগলা না কি?

বিশু। মাথার ছিট আছে, তার ওপর দারুণ মাতাল, সর্ব্বদাই মদ খেয়ে থাকে। সব্বাই ভয় করে ওকে, আত্মীয় স্বজনরা পর্য্যন্ত ছেড়ে পালিয়েছে, ও একাই থাকে। পালিয়ে আয়—

অমল ঃ আমি কাউকে ভয় করি না। বল না খুজে নিয়ে আমি যাচ্ছি না।

[বল খুঁজিতে লাগিল]

বিশু। যদি বেরিয়ে আসে মজাটি বুঝবে।

অমল। তোর ভয় করে তো তুই পালা না—

বিশু। আচ্ছা, আমি তাহলে ততক্ষণ কানু, গোরা, জীবন, রবিকে ডেকে আনি গিয়ে। তুই বলটা যদি পাশ ভালই, সবাই মিলে বল খেলা যাবে, তা না হলে হাডুডুডু খেলব, কেমন? তুই বেশীক্ষণ কিন্তু থাকিস না ওখানে।

অমল। বলটা পেলেই আমি যাচ্ছি, তুই যা—

[বিশু চলিয়া গেল, অমল বল খুঁজিতে লাগিল। দূরে দেখা গেল জনার্দ্দন রায় বাহির হইয়াছেন এবং অমলের দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া আছেন। লোকটী সত্যই ভীষণ-দর্শন। গায়ের রঙ্ মিশ-কালো, মাথার চুল ছোট ছোট করিয়া ছাঁটা। ছোট ছোট চোখে হিংস্র দৃষ্টি। আজানুলম্বিত বাহু, ঝাঁকড়া ভুরু, বলিষ্ঠ গঠন। মনে হয় সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকিয়া আছেন। অনেকটা গরিলার মতো হাব ভাব। অমল প্রথমটা দেখিতে পায় নাই, হটাৎ ঘাড় ফিরাতেই চোখো চোখি হইয়া গেল। উভয়ে পরস্পরের দিকে চাহিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর জনার্দ্দন খানিকটা আগাইয়া আসিলেন এবং হাতছানি দিয়া অমলকে ডাকিলেন। অমল নির্ভয়ে আগাইয়া গেল।]

জনার্দ্দন। [কর্কশ কণ্ঠে] এখানে কি হচ্ছে?

অমল। আমাদের বলটা এখানে—

জনার্দ্দন। [দাঁত কড়মড় করিয়া] চোপ রও—

[অমল চুপ করিয়া গেল। তাহার পর ইতস্তত করিয়া আবার সুরু করিল]

অমল। আমাদের বলটা আপনার বাগানে ঢুকেছে তাই—

জনার্দ্দান। [সবিস্ময়ে] বল্! কিসের বল্, কার বল্? [দাঁত কড়মড় করিয়া] মিথ্যুক পাজি কোথাকার!

অমল। আমি মিথ্যে কথা কখনও বলি না

জনার্দ্দন। [চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া] ও!

[সহসা হাসিয়া উঠিলেন]

ক্যাহ ক্যাহ্ ক্যাহ্ ক্যাহ্ ক্যাহ্ ক্যাহ! তোমার নাম কি?

অমল। অমল।

জনার্দ্দন। যুধিষ্ঠির নয়? ক্যাহ ক্যাহ ক্যাহ ক্যাহ ক্যাহ—!

[এইরূপ অদ্ভুত শব্দ করিয়া হাসিতে হাসিতে সহসা জনার্দ্দন গম্ভীর হইয়া গেলেন, ক্রমশঃ ভ্রূ যুগল কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, হিংস্র চোখের দৃষ্টি অমলের মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত তিনি দাঁড়াইয়া রহিলেন।]

অমল। [নির্ভীকভাবে] কি দেখছেন?

জনার্দ্দন। যুধিষ্ঠিরকে! [সহসা উচ্চকণ্ঠে] যোগী সিং, যোগী সিং—

[ভিতর হইতে যোগী সিং নামক দারোয়ান বাহির হইয়া আসিল—]

যোগী সিং। জি হুজুর।

জনার্দ্দন। হামারা হান্টার লে আও।

[যোগী সিং ভিতরের দিকে যাইতে যাইতে অমলকে ইঙ্গিত করিয়া পলাইতে বলিল। অমল নড়িল না।]

অমল। আমি আমার বলটা খুঁজে নিয়ে এখুনি চলে যাচ্ছি!

জনার্দ্দন। চলে যাওয়াচ্ছি দাঁড়াও না, পাজি মিথ্যুক কোথাকার, বল্!

অমল। আমি কখনও মিথ্যে কথা বলি না।

জনার্দ্দন। কোথায় তোমার বল্?

অমল। এইখানে কোথাও ঢুকে আছে।

জনার্দ্দন। [চীৎকার করিয়া] দেখাও, কোথায় তোমার বল্। পাজি মিথ্যুক কোথাকার, এসেছেন ফুল ছিঁড়তে, বলছেন বল্।

অমল। ফুল ছিঁড়তে আসি নি আমি।

জনার্দ্দন। চোপরাও পাজি মিথ্যুক—

অমল। [দৃঢ়স্বরে] আমি মিথ্যে কথা কখনও বলি না।

জনার্দ্দন। কখনও বল না?

অমল। না।

জনার্দ্দন। [ভ্যাঙাইয়া] কিছুতে না?

অমল। না।

[জনার্দ্দনের মুখ ভ্রূকুটি-কুটিল হইয়া উঠিল। সহসা আগাইয়া গিয়া তিনি অমলের কান ধরিলেন]

জনার্দ্দন। [কানে মোচড় দিয়া] কিছুতে মিথ্যা বলবে না?

অমল। না।

জনার্দ্দন। [আকাশের দিকে আঙুল দেখাইয়া] আকাশের রঙ কি বল দেখি?—

অমল। নীল।

জনার্দ্দন। [কানে আর এক পাক দিয়া] নীল নয়, লাল। বল, আকাশের রঙ লাল!

অমল। না, আকাশের রঙ নীল।

[জনার্দ্দন অমলের কান ছাড়িয়া দিলেন এবং একটু তফাতে দাঁড়াইয়া বিস্মিত ক্রোধে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সহসা তাঁহার চক্ষু দুইটি হিংস্র হইয়া উঠিল—]

জনার্দ্দন। [ধমক দিয়া] বল, আকাশ লাল।

অমল। আকাশ নীল।

[জনার্দ্দন হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে আগাইয়া গিয়া অমলের গালে জোরে এক চড় মারিলেন।]

জনার্দ্দন। [চক্ষু দুইটি ছোট করিয়া ধীর কণ্ঠে] বল, আকাশ লাল।

অমল। আকাশ নীল।

[জনার্দ্দন পুনরায় চড় মারিলেন ; অমল পড়িয়া যাইতে যাইতে সামলাইয়া লইল]

জনার্দ্দন। বল, আকাশ লাল।

অমল। না, আকাশ নীল।

[জনার্দ্দন পুনরায় চড় মারিলেন, এবার এত জোরে যে অমল পড়িয়া গেল। পড়িয়া গিয়া পুনরায় উঠিয়া দাঁড়াইল।]

জনার্দ্দন। [কর্কশ কণ্ঠে] এখনও বল আকাশ লাল।

অমল। না, আকাশ নীল।

[জনার্দ্দন উপর্য্যুপরি তাহাকে আরও কয়েকটা চড় মারিয়া আবার ভূশায়ী করিয়া ফেলিলেন। অমল পুনরায় উঠিয়া দাঁড়াইল]

জনার্দ্দন। কিছুতে বলবে না তুমি ?

অমল। না।

জনার্দ্দন। [চীৎকার করিয়া] শিগ গির বল, আকাশ লাল।

অমল। না, আকাশ নীল।

জনার্দ্দন। [আরও চীৎকার করিয়া] খুন করে ফেলব তোমায় আমি, শিগ গির বল আকাশ লাল।

অমল। না, আকাশ নীল—

জনার্দ্দন। যোগী সিং, যোগী সিং—

[শঙ্কর মাছের হান্টার লইয়া যোগী সিং বাহির হইয়া আসিল। সে ইচ্ছা করিয়াই এতক্ষণ দেরি করিতেছিল।]

অমল। আমাকে বল্ খুঁজতে দিন।

জনার্দ্দন। তোমাকে নতুন বল্ কিনে দেব আমি, বল আকাশ লাল—

অমল। না, আকাশ নীল।

[সপাং করিয়া এক ঘা চাবুক পড়িল]

জনার্দ্দন। বল আকাশ লাল।

অমল। [আরও দৃঢ় কণ্ঠে] আকাশ নীল।

[সপাং সপাং করিয়া আরও ঘা কয়েক চাবুক পড়িল। দুই এক জায়গা কাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। অমল অবিচলিত]

জনার্দ্দন। না বলিয়ে ছাড়চি না তোমায় আমি। বল, আ-কা-শ লা-ল।

অমল। আকাশ নীল।

জনার্দ্দন। যোগী সিং, ইস্‌কো কুর্ত্তা খোল দেও! দেখি কত বড় ত্যাঁদড় ছেলে তুমি।

যোগী সিং। বোলিয়ে না বাবু আকাশ লাল, ইসমে ক্যা হ্যায়!

[অমল নিরুত্তর]

জনার্দ্দন। [ধমক দিয়া] জলদি কুর্ত্তা খোলো তুম উল্লু—

[যোগী সিং অমলের জামা খুলিয়া ফেলিল]

জনার্দ্দন। বল, আকাশ লাল।

অমল। [অকম্পিত কণ্ঠে] আকাশ নীল।

[জনার্দ্দন মরিয়া হইয়া হাণ্টার চালাইতে লাগিলেন। অমল মাটিতে পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল]

জনার্দ্দন। [হাঁপাইতে হাঁপাইতে] এখনও বল, আকাশ লাল।

অমল। [মাটিতে শুইয়া শুইয়া] আকাশ নীল।

[জনার্দ্দন পুনরায় চাবকাইতে লাগিলেন]

জনার্দ্দন। [পাগলের মত চীৎকার করিয়া] আকাশ লাল, আকাশ লাল, আকাশ লাল, শিগগির বল—আকাশ লাল।

অমল। আকাশ নীল!

[জনার্দ্দন উন্মাদের হাসি হাসিয়া উঠিলেন, ক্যহ ক্যহ ক্যহ ক্যহ এবং পুনরায় নিষ্ঠুরভাবে হাণ্টার চালাইতে লাগিলেন। খানিকক্ষণ চাবকাইয়া থামিলেন এবং বাম হাত দিয়া কপালের ঘাম মুছিয়া ফেলিলেন]

জনার্দ্দন। বল, আকাশ লাল—

[কোন উত্তর আসিল না]

যোগী সিং। ছোড় দিজিয়ে হুজুর, ছোকরা বেহোঁস্ হো গয়া।

জনার্দন। [বিস্মিত কণ্ঠে] বেহোঁস হো গিয়া!

[হাণ্টারটা ফেলিয়া দিয়া মূঢ়ের মত চাহিয়া রহিলেন। গেটের বাহিরে দেখা গেল বিশু, কানু, গোরা, জীবন, রবি সভয়ে বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে চাহিয়া আছে] যবনিকা

মায়ের খোকা

শ্রীঅজয় ভট্টাচার্য

আমার খোকন নয় রে শিশু নয়,
নীল চোখে তার তবে কেন
চন্দ্র সুরুজ জ্বলে হেন
আধো কথায় কথার সাগর বয়—
খোকন যাদু নয় রে শিশু নয়।
একটুখানি হাসলে পরে
লক্ষ মাণিক কেন ঝরে
ছোট্ট চুমোয় করলো ভুবন জয়।
মিছিল করা কাজের মাঝে
তার অকাজের ছন্দ বাজে
বুঝে তারে বুঝি না যে
অবুঝ তবু নয়
কোমল হাতে কেমন ক'রে
সাত জোয়ানের শক্তি ধরে
আঁচলখানি ধরলে পরে

তাই ছাড়াতে হার মানিতে হয়
আমার খোকা নয় রে শিশু নয়।
খোকনমণি ঘুমায় যখন
মায়ের ভুবন ঘুমায় তখন
মিষ্টিমাখা দুষ্টুমি তার কেবল পড়ে মনে,
ভোরের আলোর প্রথম ছোঁওয়ায়
যখন যাদু চোখ মেলে চায়
মায়ের জগৎ জাগে তখন খোকার জাগার সনে
ঘরে ঘরে এমন কত
খোকন বাড়ে চাঁদের মত
বাড়ে তবু বড় নাহি হয়,
চির-কালের ছোট্ট সে যে
তবু ছোট মানি নে যে
খোকনরা সব নয় রে শিশু নয়

আয় বিদায়—

শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী

পথ বলে বিদায়, বিদায়!
বন বলে আয়, আয়, আয়।
সঙ্গিনারা কহিছে ডাকিয়া
কেন করে আঁখি ছল্ ছল্—
কচা বেড়া দেয় হাতছানি
বেলগাছ করে টানাটানি
বেণুশাখা কহিছে বিদায়
বন বলে,—আয়, আয়, আয়।

তীরে তীরে করে ছল্ ছল্
টলমল্ ভাগীরথী জল
নত হয় অশথের ছায়া
সারাবেলা পাতাগুলি কাঁপে,
দূর বনে কা'র আঁখিজল
করে টলমল্!
কা'রা যেন ডাকে বলে কবি
ফুরায়েছে এদিনের ছবি—

কা'রা যেন বলে শুন কবি
ফুরায়েছে সেদিনেরও ছবি—
আছে শুধু বন আর নদী
টলমল্ চলে নিরবধি—
মহাজনী তরণী যে যায়
চূর্ণী নদীর কিনারায়
গুণ টানে মাল্লার দল
টলমল্ করে নদীজল।
লিচুবনে ছায়া নেচে যায়
ছায়া নাচে বন কিনারায়
ছায়া নাচে ঘন দীঘিজলে
রক্ত কমল ফোটে জলে
নাচে ছায়া ঘন দীঘিজলে।
কা'রা যেন যায় শুধু যায়
কা'রা যেন ফিরে ফিরে চায়—
লতা ডাকে,—আয়, আয়, আয়,
বাঁকা-পথ কহিছে বিদায়।
তমাল, শিমুল ডাকে আয়—
পথ বলে—বিদায়, বিদায়।

দুঃসাহসিক যদু মধু রাম শ্যাম—

শ্রীপরিমল গোস্বামী

দুঃসাহসিক কাজ করিয়া যদু মধু রাম শ্যাম হরি এবং অনন্ত অল্পদিনের মধ্যেই বিখ্যাত হইয়া পড়িয়াছে।

যদুর বয়স চব্বিশ, মধুর বাইস, রামের কুড়ি, শ্যামের আঠারো, হরির ষোল এবং অনন্তের চৌদ্দ।

যদু হাঁটিয়া কলিকাতা হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত গিয়াছে এবং হাঁটিয়া কলিকাতা ফিরিয়া আসিয়াছে।

মধু সাঁতার কাটিয়া পদ্মা নদী পার হইয়াছে।

রাম শ্যাম হরি এবং অনন্ত একসঙ্গে নৌকা বাহিয়া গঙ্গানদীর পথে মুর্শিদাবাদ ঘুরিয়া আসিয়াছে।

দেশের সবাই এই যুবকদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সমস্ত সংবাদপত্রে ইহাদের ছবি এবং ভ্রমণকাহিনী ছাপা হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে আরও হইবে বলিয়া

সম্পাদকেরা আশ্বাস দিয়াছেন। ইহারা বাঙালীর ভীরুতা-অপবাদ ঘুচাইয়াছে বলিয়া বাংলাদেশের জনসাধারণ, দেশের আশা ও ভরসা হিসাবে, কৌতূহলের সঙ্গে ইহাদের চালচলন লক্ষ্য করিয়া যাইতেছে।

কিন্তু এই পৃথিবীতে একটানা সুখভোগ কাহারও অদৃষ্টে নাই। যদু মধু রাম শ্যাম হরি ও অনন্তেরও নাই। তারা যে ভাবে এখানে-সেখানে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া বেড়াইতেছিল তাহা বেশীদিন স্থায়ী হইল না। কোথা হইতে একটি অশান্তিকর লোকের আবির্ভাব হইল, সে প্রকাশ্য স্থানে ইহাদের দুঃসাহসিকতায় ঘোর সন্দেহ করিয়া বসিল। সে বলিল তাহারা যে সত্যই দুঃসাহসিক, নূতন করিয়া তাহার প্রমাণ দিতে হইবে। অর্থাৎ তাহার মতে যে দুঃসাহসিক, একমাত্র তাহাকেই সে প্রশংসা করিবে। আর এই প্রশংসা শুধু মুখের কথায় নয়, ইহার জন্য সে একটি মেডেলও পুরস্কার দিবে বলিয়া ঘোষণা করিল।

যদু মধু রাম শ্যাম হরি ও অনন্ত ইহা শুনিয়া বিশেষ চঞ্চল হইয়া উঠিল। ইহাই তো তাহারা চায়। তাহারা যে সত্যই দুঃসাহসিক তাহা প্রমাণ করিতে তাহাদের কিছুমাত্র আপত্তি নাই। তাহারা সমস্বরে বলিল, "আমরা প্রস্তুত।"

কেবল যদুর বয়স সকলের অপেক্ষা বেশি বলিয়া তাহার মনের মধ্যে একটু সন্দেহ জাগিয়া উঠিল।

লোকটি বলিল, "তোমরা প্রত্যেকে পৃথকভাবে এক একটি দুঃসাহসিক কাজ কর—যে আমার মতে সব চেয়ে সাহস দেখাইবে তাহাকেই আমি একটি সোনার মেডেল দিব। ইহার জন্য সময় দিলাম পনের দিন।"

যদু মধু রাম শ্যাম হরি ও অনন্ত সমস্বরে বলিল, পনের দিনের মধ্যেই তাহারা মেডেল লইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিবে।—বলিয়া চলিয়া গেল।

যদু মধু রাম শ্যাম হরি ও অনন্ত কে কি করিবে নিজের নিজের বাড়িতে বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

মধু ভাবিল, খালি গায়ে মৌচাক হইতে মধু সংগ্রহ করিয়া আনিবে।

রাম ভাবিল, সুন্দরবনে গিয়া বাঘ মারিয়া আনিবে।

হরি ভাবিল, দার্জিলিং মেল হইতে লাফাইয়া পড়িবে।

শ্যাম ভাবিল, রাত্রে একা শ্মশানে বসিয়া থাকিবে।

অনন্ত ভাবিল, দুর্দান্ত সত্যবাবুর বাগান হইতে ফুল চুরি করিবে।

কেবল যদু কিছুই ভাবিতে পারিল না।

একদিন দুইদিন করিয়া চৌদ্দ দিন কাটিয়া গেল, কাহারও মনে কোনও নূতন বুদ্ধি আসিল না।

সুতরাং—

মধু খালি গায়ে মৌচাক হইতে মধু সংগ্রহ করিল।

রাম সুন্দরবনে গিয়া বাঘের পরিবর্তে একটি ছোট কুমীরের বাচ্ছা ধরিয়া আনিল।

হরি দার্জিলিং মেলের পরিবর্তে ট্রাম গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িল।

শ্যাম একা শ্মশানে রাত্রি কাটাইল।

অনন্ত দুর্দান্ত সত্যবাবুর প্রাচীর ডিঙাইয়া ফুল চুরি করিল।

কেবল যদু কিছু ভাবিয়া না পাইয়া লজ্জায়, দুঃখে, অনাহারে, অনিদ্রায়, পনের দিন ঘরে বসিয়া কাটাইল। মুখে তাহার দুই ইঞ্চি দাড়ি গজাইয়া গেল।

নির্দিষ্ট দিনে একে একে সবাই আসিতে লাগিল সেই লোকটির কাছে।

মধু আসিল ট্যাক্সিতে। তাহার সর্বাঙ্গে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। তাহার মুখ ফুলিয়া ঢাক হইয়াছে।

রাম এক কুলির মাথায় কুমীর ছানা চাপাইয়া হাঁটিয়া আসিল।

হরি আসিল রিকশায়। তাহার দুই পায়ে প্ল্যাষ্টার ব্যাণ্ডেজ।

শ্যাম আসিল ঘোড়া গাড়িতে। তাহার প্রবল জ্বর, সর্বাঙ্গ বালাপোষে ঢাকা।

অনন্ত ফুল হাতে হাঁটিয়া আসিল।

শীর্ণ যদু রিকশায় আসিল ক্ষমা চাহিতে।

সকলেই সগর্বে নিজ নিজ কৃতিত্বের কথা বলিল। কেবল যদু কিছুই বলিতে পারিল না।

লোকটী সবারই মুখের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে যদুর দিকে আগাইয়া আসিল এবং বলিল, "একমাত্র যদুই আমার মতে সব চেয়ে বেশি সাহস দেখাইয়াছে।"

এ কথায় মধু রাম শ্যাম হরি ও অনন্ত গোলমাল আরম্ভ করিয়া দিল। সকলেই বলিল, যদু কিছুই করে নাই।

লোকটি গোলমাল থামাইয়া বলিল, "যদু কি করিয়াছে উহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখ। যদু দাড়ি রাখিয়াছে। এবং ইহাই আমার মতে এযুগে সব চেয়ে দুঃসাহসিক কাজ।"

মধু রাম শ্যাম প্রভৃতি—"ঘোর অন্যায়, ঘোর অন্যায়" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে যে যেমন আসিয়াছিল তেমনি ফিরিয়া গেল।

কেবল যদু উত্থানশক্তি রহিত হইয়া ঐ খানেই বসিয়া পড়িল এবং বলিল, "কিছু না খাইয়া আমি নড়িতে পারিব না।"

ভোরের আলো

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

রাত্রি পোহায় দূরে দেখা যায়, স্নিগ্ধ ভোরের আলো
আঁধার ভেদিয়া পূর্ব্ব গগনে নবীন সূর্য্যোদয়,
যে আলো আনিল প্রাণের বার্ত্তা সেইত মোদের ভালো
সারা দিনমান গাহিব যে গান কর তারি সঞ্চয়।
ভোরের আলোয় চোক মেলে দেখ সুন্দর পৃথিবীরে
ঘুমভাঙ্গা চোকে ভোরের আলোতে সবারেই ভাল লাগে,
সোনার বরণ মিঠে রোদ্দুর উঠিতেছে ধীরে ধীরে,
শিউলি ফুলের প্রাণে প্রাণে আজ কতনা কামনা জাগে।
ভোরের আলোয় সুন্দর ধরা হোক সুন্দরতর
তরুণ মনের রঙীন-স্বপন সফল করিতে তারে।
শরতে ভোরের হালকা হাওয়ায় সুগন্ধ ভর ভর
ভোরের আলোরে ডেকে বলে দিই, এসো তুমি বারে বারে।
মোদের কামনা ফুলের কামনা ফুটিবার আশা নিয়া
ফুলেরি মতন চোক মেলে থাক আলোক সন্ধানীয়া।

রাজা সলোমনের রত্নখনি

শ্রীসুধাংশু কুমার গুপ্ত, এম. এ.

রাইডার হ্যাগার্ডের উপন্যাসের মারফৎ রাজা সলোমনের রত্নখনির কাহিনী আমরা সবাই জানি। ঐ কাহিনী অবলম্বন করে সম্প্রতি যে ছায়াচিত্র তৈরী হয়েছে তাও আমরা দেখেছি। খৃষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেলেও আমরা পড়েছি রাজা সলোমনের অতুল ঐশ্বর্য্যের কথা। কিন্তু আমাদের মধ্যে ক'জন জানে যে রাজা সলোমনের রত্নখনি কল্পনা নয়, বাস্তব—আজও পৃথিবীর বুকে তার অস্তিত্ব লুপ্ত হয় নি?

বিজ্ঞানের প্রসারের ফলে আমাদের মনের আজ পরিবর্ত্তন ঘটেছে। কাব্যে বা উপন্যাসে যা পড়ি তার অনেক কিছুই বিশ্বাস করতে চাই না। তাই রাইডার হ্যাগার্ডের উপন্যাস পড়ে মনে হয়, রাজা সলোমনের রত্নখনির কল্পনা অলীক—তার মূলে কোন সত্য নেই। উপন্যাসে পড়ি সলোমনের রত্নখনির সন্ধানে গিয়েছিল যারা তাদের বিপদের অন্ত ছিল না। —কত ভীষণ বন জঙ্গল তাদের পার হতে হয়েছে, খাদ্য ও পানীয়ের অভাবে দিনের পর দিন কত কষ্ট তারা পেয়েছে, কতবার তাদের জীবন বিপন্ন হয়েছে হিংস্র পশু ও ততোধিক হিংস্র আদিম অধিবাসীদের হাতে —পড়তে পড়তে আমরা রোমাঞ্চিত হই, কিন্তু আমরা কি ভাবতে পারি সত্যি যারা ঐ রত্নখনির সন্ধানে যায় তাদের অদৃষ্টে ঘটে ঢের বেশী কষ্ট ও দুর্ভোগ?

যদি কেউ সলোমনের রত্নখনির সন্ধান করতে চায় তবে তাকে যেতে হবে ইথিওপিয়ার গভীর অরণ্যের মধ্যে। এই দেশ সম্প্রতি ইটালী জয় করেছে বটে, কিন্তু এখনো ইটালীয়ানরা ওখানে আধিপত্য বিস্তার করতে পারেনি।

রাজনৈতিক ব্যাপার নিয়ে যাঁরা মাথা ঘামান তাঁদের মধ্যে এমন দু'চারজন লোক আছেন যাঁদের ধারণা, ইটালীর আবিসিনিয়া আক্রমণের

উদ্দেশ্য শুধু রাজ্য বিস্তার নয়, রাজা সলোমনের রত্নখনি সন্ধান করে ওখানকার সমস্ত ধনরত্ন অধিকার করা।

কিন্তু রত্নখনির সন্ধান বড় সহজ হবে না। বর্ত্তমান যুগের সুশিক্ষিত সৈন্যসামন্ত, বিমানপোত এবং বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি এ কাজে বিশেষ কোন সাহায্য করবে না।

এ কাজে সাফল্য লাভ করতে হলে আবিসিনিয়ার দূরতম অজ্ঞাত প্রদেশগুলিও জয় করতে হবে। ওখানে জঙ্গলভরা এমন অনেক গিরিখাত (canyon) আছে যাদের গভীরতা আজও কেউ নির্ণয় করতে পারেনি।

তা ছাড়া ওখানকার উত্তাপ অত্যন্ত ভয়ানক। মাঝে মাঝে উত্তাপ ওঠে ১৬৭ ডিগ্রী পর্য্যন্ত—অর্থাৎ ফুটন্ত জলের উত্তাপের প্রায় কাছাকাছি। উত্তাপটা এমনি ভয়ানক—মানুষের দেহের উত্তাপের চেয়ে তা এত বেশী যে হাত বগলের নীচে রেখেও কতকটা ঠাণ্ডা করা যেতে পারে। এমন কি, যেখানে রৌদ্র নেই, ছায়া—সেখানকার উত্তাপ ১৪০ ডিগ্রী ফারেন হিট।

এই উত্তাপের ভিতর দিয়ে বিশাল মরুভূমি পার হয়ে দুরারোহ পর্ব্বতমালা অতিক্রম করতে হবে। পাহাড়ে কোন পথ নেই—সূর্য্যের তাপ থেকে আত্মরক্ষার কোন আশ্রয়ও নেই। নদী থেকে দূরে পার্ব্বত্য অঞ্চলে পানীয় জলও দুর্লভ—নদী যেখানে আছে সেখানেও সব সময় জল মেলে না, সূর্য্যের উত্তাপে নদী গেছে শুকিয়ে।

ও অঞ্চলে যাতায়াতের একমাত্র উপায় হচ্ছে গাধার পিঠে চড়া—পুরাকালেও ছিল তাই, আজও সে ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হয়নি।

ধনরত্নের সন্ধানে মানুষ পৃথিবীর নানা দেশে যায়, কিন্তু এখানে যারা আসে তাদের কষ্টের অবধি নেই। তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাবে, কিন্তু তৃষ্ণা নিবারণের উপায় নেই। মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা প্রতি মুহূর্ত্তে। এক রকম দূষিত জ্বরের জীবাণু বহন ক'রে মশা ও মাছি মানুষের জীবনকে করে বিপন্ন। এই জীবাণু দেহে প্রবেশ করলে রোগীর জীবনের আশা দুরাশা।

এর উপর আছে আবার আর এক বিপদ। ইথিওপিয়ার অসভ্য

অধিবাসীরা বিদেশীকে দেখে সন্দেহের চোখে। রাজা সলোমনের রত্নখনি তারা পাহারা দেয় খুব সতর্কভাবে—কেউ যদি নিকটে আসে তাকে তারা জীবন্ত ফিরে যেতে দেয় না।

কোথায় ঐ প্রহরীবেষ্টিত রত্নখনি—যা রাজা সলোমনের ভাণ্ডারকে অপূর্ব্ব সম্পদে ভরে দিয়েছিল? পুরাকালে আফ্রিকায় সার্থবাহের দল যে পথে কার্থেজ থেকে উটিকায় যাতায়াত করত সেই পথেরই মাঝে ঐ রত্নখনি অবস্থিত। স্থানটীর প্রাচীন নাম 'ওফির'—বর্ত্তমানে 'বেনি শাঙ্গুল' নামে পরিচিত।

ওখানে যাবার পথটা তোমরা যদি জানতে চাও তবে একখানি মানচিত্র নিয়ে বসো। ধরো, আমরা যাত্রা সুরু করলাম নীল নদীর সেতুর দক্ষিণ দিক থেকে। ইয়াবুস নদী যেখানে নীল নদী থেকে বেরিয়েছে আমরা উপস্থিত হলাম সেইখানে। পূর্ব্বদিকে দূরে আদ্দিস আবাবা—কতদূরে তার হিসাব করার দরকার নেই, কারণ এ এমন একটা দেশ যখানে দূরত্বের পরিমাপ করা হয় ঘামে আর রক্তে, মাইলে নয়। ওখান থেকে পশ্চিম দিকে এগিয়ে আমরা অবশেষে পেঁছে গেলাম বেনি শাঙ্গুলে—রাজা সলোমনের রত্নখনি আছে যেখানে।

এ রাজ্যের রাজা রাস ঘোগোলি। জগতে মাত্র একজনের আনুগত্য তিনি স্বীকার করেন। তিনি হচ্ছেন ইথিওপিয়ার নির্ব্বাসিত সম্রাট হাইলে সেলাসি। ইটালীয়ানরা আদ্দিস আবাবা জয় করার পূর্ব্বে, হাইলে সেলাসির কাছ থেকে ছাড়পত্র বা সশস্ত্র প্রহরী নিয়ে ঘোগোলির রাজ্যে নির্ভয়ে প্রবেশ করা যেত।

অবশ্য পথভ্রমণের কষ্টটা সহ্য করে যারা শেষ পর্য্যন্ত বেনি শাঙ্গুলে পেঁছুতে পারবে তাদেরই পক্ষে সম্ভব হবে ঐ অজ্ঞাত দেশে প্রবেশ করা। অনেক সময় আবার ঘোগোলির সতর্ক সৈনিকদের ঢাকের আওয়াজ শুনে বাহকের দল ভয়ে পালিয়ে যায় অভিযাত্রীদের ফেলে।

কাউন্ট বাইরণ দ্য প্রোরক নামে একজন ইউরোপীয় অভিযাত্রী বেনি শাঙ্গুল থেকে নির্ব্বিঘ্নে ফিরে আসেন ইটালীর আবিসিনিয়া আক্রমণের কিছু পূর্ব্বেই। রাজা সলোমনের রত্নখনি সম্বন্ধে তাঁর কথাই সব চেয়ে বিশ্বাস-যোগ্য।

তিনিই সর্ব্বপ্রথম সন্দেহ করেন যে সলোমনের রত্নখনি অধিকার করা মুসোলিনীর আবিসিনিয়া আক্রমণের অন্যতম উদ্দেশ্য। তা ছাড়া প্রোরক রত্নখনির এত কাছে গিয়েছিলেন যে তিনি জায়গাটার ম্যাপ আঁকতে পেরেছিলেন এবং আশপাশের দৃশ্যের ছবিও তুলেছিলেন ক্যামেরার সাহায্যে।

ঘোগোলির সৈনিকরা তাঁকে বন্দী করেছিল, কিন্তু হাইলে সেলাসির কাছ থেকে ছাড়পত্র এসে পড়ায় তাঁর জীবন রক্ষা হয়। প্রোরকের বর্ণনা থেকেই খানিকটা উদ্ধৃত করে দিচ্ছি :

"সারা রাত অসভ্য অধিবাসীদের প্রকাণ্ড ঢাক ভীষণ শব্দে বেজেছে। আমাদের মৃত্যু নিশ্চিত বলেই মনে হল। বাহকেরা ভয়ে অভিভূত হয়ে পড়ল।

কিন্তু পরের দিন, দূরবীণের সাহায্যে আমরা এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখলাম হাজার ফিট নীচে। হাজার হাজার মেয়ে পুরুষ ঘর্ম্মাক্ত দেহে নীচে নদীর গর্ভে কাজ করছে। আমাদের গাইড দিরেশা বললে, ওরা ঘোগোলির ক্রীতদাস—সোনা পরিষ্কার করছে। যারা অবিশ্বাসী তাদের সন্দেহ নিরসনের জন্য এ কথা বলা দরকার যে আমাদের ক্যামেরায় এই অদ্ভুত দৃশ্য নিখুঁত ভাবে তোলা হয়েছে।

আমাদের বিস্ময় ও আনন্দের সীমা রইল না। আমরা নেমে গেলাম নীচে—যে জায়গা থেকে রাজা সলোমনের অতুল ঐশ্বর্য্য ও বিলাসের উপকরণ সংগৃহীত হত সেই জায়গাটা আমাদের চোখের সম্মুখে!

ক্যামেরায় যখন ছবি তোলা হচ্ছে তখন আমি আমার সঙ্গীদের নিয়ে নিকটবর্ত্তী পাহাড়গুলি পরীক্ষা করতে লাগলাম, লক্ষ্য করলাম রত্নখনির অনেক পরিত্যক্ত সুড়ঙ্গের প্রবেশ পথে প্রাচীন চিত্রলিখন রয়েছে।

রত্নখনির প্রহরীদের ঘুস দিয়ে বশীভূত করে আমরা কয়েকটি প্রাচীন কবর দেখলাম। কথাটা হয়তো অদ্ভুত শোনাতে পারে, কারণ যারা বড় বড় সোনার তাল নিয়ে নাড়াচাড়া করছে তারা কি করে প্রলুব্ধ হবে সামান্য মুদ্রায়? ব্যাপারটা বুঝতে পারা যায় ওখানকার রীতি জানলে। যদি কোন প্রহরী সোনার তাল সমেত ধরা পড়ে তবে তার মৃত্যু নিশ্চিত—যদিও সোনার মুদ্রা কাছে রাখা বিপজ্জনক নয়।

আবার আমরা ঢাকের আওয়াজ শুনতে পেলাম—ঘোগোলির অনুচরেরা রাজাকে খবর দিচ্ছে আমাদের উপস্থিতি সম্বন্ধে। যা দু'চারটে জিনিস আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম তাড়াতাড়ি সেগুলো বাক্সে ভরে আমরা ইয়াবুস নদীর দিকে রওনা হলাম এবং তিন দিন পরে ক্লান্তদেহে উপস্থিত হলাম নিকটবর্ত্তী ইথিওপীয় গ্রাম আল্‌বি মোতিতে।"

রাস (সুলতান) ঘোগোলি বর্ত্তমানে রাজা সলোমনের রত্নখনির অধিকারী। বয়স তাঁর একশো বছরের উপর, কিন্তু এখনো তিনি বেশ সবল ও কার্য্যক্ষম। কাউণ্ট বাইরণ দ্য প্রোরক এবং তাঁর দলের আটজন ইউরোপীয়ান ও পঞ্চাশজন বাহককে তিনি বন্দী করেন এবং তাদের জানিয়ে দেন যে তাঁর রাজ্যে যারা অনধিকার প্রবেশ করে তাদের তিনি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন। শুধু হাইলে সেলাসির একজন অনুচরের ছাড়পত্র নিয়ে সময়মত হাজির হওয়ার জন্যই প্রোরক আর তাঁর অনুচরেরা মুক্তি পান।

সেই যে রাজা—

(শিশুদের জন্য যুক্তাক্ষর বর্জ্জিত গল্প)

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

সেই যে রাজা,—যা'র দেশে যত মানুষ তা'র চেয়ে বেশী বাড়ী, যত বাড়ী তা'র চেয়ে বেশী দরজা আর যত দরজা তা'র চেয়ে বেশী খিল,—সেই রাজা একদিন মৃগয়ায় বেরুলেন। মৃগয়ায় জানোয়ার শীকার করতে হয়। তাই রাজামশাই সাথে নিলেন অনেক তীর ধনুক, আর যত তীর ধনুক নিলেন তার চেয়ে বেশী নিলেন শীকারী, যত শীকারী নিলেন তা'র চেয়ে অনেক অনেক বেশী নিলেন খাবার। বনে গিয়ে শীকার করতে করতে ত খিদে পাবে, তখন খাবেন কি খাবার না নিলে? রাজামশাই কি কি খাবার নিলেন তা তোমরা

জানতে চাও?—রাজামশাই নিলেন লুচি,—ঝুড়ি ঝুড়ি লুচি,—আর যত লুচি নিলেন তার চেয়ে বেশী নিলেন মিঠাই, যত মিঠাই নিলেন তার চেয়ে বেশী নিলেন কলাপাতা,—নইলে বনে গিয়ে কি পেতে খাবেন?

তারপর রাজামশাই বেরুলেন। রাজামশাই শীকারে চলেছেন। যত চলেন তার বেশী দাঁড়ান, যত দাঁড়ান তার বেশী বসেন, যত বসেন তার বেশী শুয়ে পড়ে জিরিয়ে নেন। এমনি করে খানিক দূর গিয়েই হায়রাণ হয়ে রাজামশাইএর খিদে পেল; তখন রাজামশাই খেতে বসলেন। খেয়ে-দেয়ে জোর না করে নিলে কি শীকার করা যায়!—তা বলে রাজামশাই বেশী কিছু খেলেন না,—এই শুধু ষাটখানি লুচি আর আশীটি মিঠাই। খেয়ে-দেয়ে রাজামশাইএর একটু ঘুম পেল। তখন আর কি করা যায়, রাজামশাই শুয়ে পড়লেন। শুয়েই পড়লেন ঘুমিয়ে। ঘুম থেকে উঠতে উঠতে রাত কেটে গিয়ে সকাল হয়ে গেল। লোকজনকে তখন ডেকে রাজামশাই খুব বকলেন। দোষ ত তা'দের; কেন তারা আগে রাজামশাইকে ডেকে দেয় নি? তা' হলে রাজমশাই একবার দেখিয়ে দিতেন শীকার করা কা'কে বলে! বাঘ, ভালুক, হাতী, বনে আর থাকত না! যাই হোক, লোকজন যখন ভুল করেই ফেলেছে তখন আর কি করা যায়! রাজামশাই তাদের মাফ্ করে দেশে ফিরলেন। তারপর দেশে সে কী ধুমধাম। রাজামশাই মৃগয়া থেকে দেশে ফিরেছেন, একটা তীর খরচ হয় নি, একটা জানোয়ারও মরে নি! দেশের লোক খুশী হয়ে খুব বড় এক ভোজ দিলে। সে ভোজে যত হল লুচি তার চেয়ে বেশী হল পটলভাজা, যত পটলভাজা হ'ল তার বেশী হল কুমড়োর তরকারী, যত কুমড়োর তরকারী হল তা'র বেশী হ'ল মাছের কালীয়া আর যত মাছের কালীয়া হ'ল তা'র বেশী…

কত আর বলব। তা'র বেশী যা যা হয়েছিল তোমরা সে সব দাদাদের কাছে জেনে নিও।

এক যে ছিল রাজা,
সামনে যা'রে পেত তা'রেই ধরে দিত সাজা;
এমনি ছিল জমকালো সে রাজা!
হ'ল কি তা'র শোনা,

একদিন তার পুলিশগুলো ধরলে ডাকাত কোনো,
হ'ল কি তার শোনো।
রাজা তখন রেগে—
সেপাইগুলোর টিকি ধরে মারলে ঘুষি বেগে।

গাছের কথা

অধ্যাপক ডক্টর **শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার**

যখনই আমি দেখি কারণে অকারণে লোকে গাছপালার ডাল পাতা ফুল ভাঙ্গিতেছে বা ছিঁড়িতেছে তখনই আমার মনে হয় এদের বলি, তোমরা এটা করো না। কিন্তু সাহস পাইনা তাই মনে মনে বলি, হে ভগবান এদের মনে সুবুদ্ধি দাও, এরা জানে না কত বড় অন্যায় বা অনিষ্ট এরা করিতেছে। আমরা কি ভাবিয়া দেখি গাছপালার সঙ্গে আমাদের কতখানি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। আমরা গরুর দুধ খাই, উপকারের তুলনা করে গরুকে মায়ের মত ভক্তি করি, ভালবাসি; আর তাই নিয়ে পাড়া প্রতিবেশীর সহিত ঝগড়া মারামারি এমন কি রক্তারক্তি পর্য্যন্ত করে পৃথিবীর লোকের কাছে হেয় প্রতিপন্ন হই, বিশেষ করে যে দেশে মাংস দৈনন্দিন খাবারের তালিকাভুক্ত নয়, মাংস খাবার তেমন প্রয়োজনও নাই আর থাকলেও অন্য প্রকারের সহজ প্রাপ্য সুখাদ্য মাংস প্রচুর আছে। আমরা প্রতিবেশীকে বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করি না গো-জাতির উপর আমাদের শরীর ধারণ পোষণ এবং পালনের জন্য আমরা জাতিধর্মনির্বিশেষে কতখানি নির্ভর করি। আমরা যদি এইভাবে জিনিসটাকে দেখতে বা দেখাতে চেষ্টা করি তবে আমার বিশ্বাস আমাদের অতি ছোট ছোট ব্যাপার নিয়ে হিংসা বিদ্বেষের অনেকখানি ঘুচে যায়, কারণ মানুষকে বুঝিয়ে বললে, তার বিবেক বুদ্ধির কাছে আবেদন করলে সে আমার কথা শুনবে না বা বুঝতে চাইবে না সেটা আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না যখন তার প্রতিবেশী আমিও এবং আমাকে বাদ দিয়ে তার চলে না বা চলতে পারে না।

যদি প্রশ্ন ওঠে গাছ মানুষের কি প্রয়োজনে লাগে যে গাছের কথা আমাদের ভাবতে হবে? গাছের কি প্রাণ আছে? বোধ শক্তি আছে যে তার জন্য দুঃখ দেখাতে হবে? আমাদেরই মত গাছেরও প্রাণ আছে, কিয়ৎ পরিমানে বোধ শক্তিও আছে। বহু কোটি বৎসর আগে গাছপালার পূর্বপুরুষ ও আমাদের পূর্বপুরুষ যে একই বংশের সন্তান ছিল, এ কথা আজকাল অবিশ্বাস করিবার উপায় নাই। কিন্তু যাদের প্রাণ আছে, বোধশক্তি আছে বলে আমরা নিঃসন্দেহে জানি, তাদের জন্যও কি আমাদের দরদ আছে? নিরপরাধ, প্রতিকারে অশক্ত জীবকে যখন আমরা হত্যা করি আমাদের ক্ষণিক আনন্দের (?) জন্য তখনও তো আমরা তাদের কথা ভাবি না এমনই নির্মম স্বার্থপর আমরা! কিন্তু তাহলেও মহামানবের প্রাণ এদের জন্য যুগে যুগে কাঁদিয়াছে। 'অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ' সেই দরদের উপরই গড়ে উঠেছে। উপকারের তুলনা করে গাছপালার উপরেই বা আমাদের দরদ হবে না কেন? গাছের মত উপকারী বন্ধু আমাদের কে আছে? আমাদের অন্ন যোগায় গাছ, রোগের ঔষধপথ্য, সভ্যতার সরঞ্জাম, ব্যবসা বাণিজ্যের পণ্যসম্ভার, বাসের ঘরবাড়ী, আসবাবপত্র, লজ্জা নিবারণের কাপড় জামা, আনন্দ উৎসব প্রভৃতির উপাদান, লিখিবার পড়িবার কাগজপত্র তো আমরা গাছের নিকট হইতেই পাইয়া থাকি। গাছের কাছ থেকে আমরা যা পাই তাহার সঙ্গে তুলনা করলে অন্যের উপকার ম্লান হয়ে যায়, অথচ এত উপকারের প্রতিদানে আমরা গাছপালার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভেঙ্গে দিয়ে, ছিঁড়ে ফেলে কত অপকার অত্যাচারই না করে থাকি! এ বিষয়ে পর্ত্তুগালে বাগানে, পার্কে, তরুবীথির স্থানে স্থানে গাছের পক্ষ থেকে পথের মানুষকে উদ্দেশ্য করে যে বিজ্ঞাপনটি দেওয়া থাকে তার অনুরূপ কল্পনা কোন সাহিত্যে পড়েছি বলে আমার মনে পড়ে না। তাই সেই বিজ্ঞাপনটির ভাব প্রকাশ করার নিতান্ত অক্ষম চেষ্টা করে প্রবন্ধটি শেষ করিলাম।

পথিককে উদ্দেশ্য করে ফলকে লেখা থাকে—

ওগো পথিক, তুমি চলার পথে নির্বিকার নির্মম—
ভাবে আমার ডালপালা
ভাঙ্গার আগে দয়া করে আমার একটা কথা শোন :—
তোমার শীতের রাত্রে আগুনের কয়লা যোগাই আমি;

নিদাঘের অসহ্য সূর্য্যতাপ থেকে রক্ষা করতে
আমিই ডালপালা বিস্তার
করে তোমার কষ্ট দূর করতে ছায়াদান করি ;
তোমার পথ যাত্রায় আমার সুস্বাদু ফল তোমার
ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর করে ;
তোমার মাথা গোঁজার স্থান দাঁড় করিয়ে রাখি আমি ;
তোমার খাবার টেবিল, বিছানার খাট পালঙ্ক,
তোমার পারাপারের নৌকা আমারই দেহ দিয়ে গড়িয়ে থাক ;

তোমার ফসল উৎপাদনের লাঙ্গলের হাতল আমি, আমি তোমার ঘরের দরজা জানালার আগড় ; তোমার শৈশবের দোলনা আমি, আবার যখন তুমি মহাপ্রস্থান করবে তখন তোমার দেহকে ধারণ আমিই করবো ; তোমার অতিথি সেবার উপকরণ আমিই জুগিয়ে থাকি ;

তোমার ঘর দোর, প্রিয়জনকে, তুমি সাজাও আমাকে দিয়েই ;
আমার মত উপকারী বন্ধু তোমার আর কে আছে ?
হে পান্থ, আমাকে ব্যথা দেবার আগে আমার এই নিবেদনটি শোন।

মুষ্টিযুদ্ধ

শ্রীবলাইদাস চট্টোপাধ্যায় (B. D. Chatterjee.)

বাঙ্গালীর বহুমুখী প্রতিভার কথা চির প্রসিদ্ধ। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাঙ্গালীকে তার যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে অগ্রণী হোতে হয়েছে। মুষ্টি-যুদ্ধের বেলায়ও তার ব্যতিক্রম হয় নি। শক্তি সাধনার এই অনাস্বাদিত পূর্ব বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভের জন্য তাকে যে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছিল, তা আজকালকার অনেকের কাছেই অতিরঞ্জন বোলে মনে হবে, কিন্তু ঘটনা বাস্তব।

সে আজ প্রায় বিশ বৎসরের আগের কথা। ফুটবল মাঠে গোরা অথবা সাহেবদের কাৎ করা সহজসাধ্য হোলেও ঘুষোঘুসির ব্যাপারে তাদের প্রাধান্ত স্বীকার করতেই হ'ত। একটু অনুধাবন করতেই বোঝা গেল তাদের সাফল্যের সূত্র কোথায়। ছেলেবেলা থেকেই এরা এ বিষয়ের অনুশীলন কোরে থাকে। স্কুলে ও কলেজে এই মুষ্টিযুদ্ধ চর্চার বিশেষ উৎসাহ দেওয়া হোয়ে থাকে এবং পেশা হিসাবে যারা এই বৃত্তি গ্রহণ করে তাদের সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়। বাঙ্গালীর ছেলের জীবনে মুষ্টিযুদ্ধ শেখবার কোনও সুযোগই আসেনি। কাজেই আমি যখন প্রথম মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতা দেখে এ বিষয়ে শিক্ষানবিশ হোতে ইচ্ছুক হলেম, তখন উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে আমাকে দারুণ বাধার সঁম্মুখীন হোতে হোলো। ওয়াই এম সি এ-র কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে আমাকে যথেষ্ট সহায়তা করেন। তাঁরা একজন শিক্ষক জোগাড় করে আনেন, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য—যে সেই শিক্ষকটী তাঁর এই নূতন ছাত্রটীকে বিশেষ সুনজরে দেখতে পারেন নি। তিনি আমাকে তাঁর সমকক্ষ ভেবে নিয়ে লড়াই সুরু করেন। মুষ্টিযুদ্ধ কলা-কৌশল-শিক্ষায় হাতেখড়ি হোলেও বহুদিন ধোরে পেশাদারী লড়াই দেখে দেখে এ বিত্থায় নিতান্ত আনাড়ী ছিলুম না। ফলে শিক্ষক মহাশয় তাঁহার সম্ভ্রমহানির আশঙ্কায় স্বেচ্ছায় তাঁর ছাত্রদের সান্নিধ্য ত্যাগ কোরে গেলেন। বহু অনুসন্ধানেও তাঁকে ফিরিয়ে আনতে পারা গেল না। যাহা হউক, গুরুলাভ না হোলেও মহা উৎসাহে মুষ্টিযুদ্ধ চর্চায় লেগে গেলুম। বন্ধু-বান্ধবদের মনেও উৎসাহ জাগালুম। তাদের নিয়ে নানা জায়গায় মুষ্টিযুদ্ধ প্রদর্শনী দেখাতে সুরু কলু'ম। মুষ্টিযুদ্ধ শিক্ষার সে কি বিপুল আগ্রহ! দৌড়ঝাঁপের জন্য নিয়মিত অভ্যাস করার সময় ছিল সকালবেলা। বৈকালে অফিসের পর ময়দানে গিয়ে ফুটবল খেল্‌তে হোতো। কাজেই মুষ্টিযুদ্ধ চর্চার একমাত্র সময় ছিল সন্ধ্যার পর ময়দান হোতে ফেরবার সময়। দৌড়ঝাঁপ (sports) এবং ফুটবল, দুইই আমার অতি প্রিয়—সুতরাং মুষ্টিযুদ্ধ চর্চার জন্য রাত্রিকালই নির্বাচন করতে বাধ্য হোতে হোল।

এ সময়ে আকস্মিকরূপে আমার প্রকৃত গুরুলাভ ঘটে গেল। ভারতের মিডল্‌ওয়েট চ্যাম্পিয়ান মিলটন কিউবস্ সেই সময়ে কলিকাতায় এলেন।

মিলিটারী চ্যাম্পিয়ন গানার মেলভিনের সঙ্গে তাঁর লড়াই সব ঠিক হোলো। আমাদের ব্যায়ামাগারে ট্রেনিং করবার জন্য কিউব সাহেবকে বিশেষ অনুরোধ কর্লুম। আমাদের ব্যবস্থা দেখে বিশেষ প্রীত হোয়ে কিউব সাহেব নিজেই আমাদের এখানে আসতে রাজী হোলেন। অতবড় একজন মুষ্টিযোদ্ধার শিক্ষা প্রণালীর সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়ে আমরা ধন্য হোয়ে গেলাম। তাঁর সঙ্গে লড়বার সুযোগও তিনি দিতে লাগলেন। তাঁর সাহচর্যে আমাদের শিক্ষা এত উচ্চস্তরের হোয়ে উঠলো যে সে সময়ে যে কয়টী প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হোয়েছিল, তার সবগুলিতেই বাঙ্গালীর ছেলেরা অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলো। বলাবাহুল্য বাঙ্গালীর ছেলেদের সবাই আমার বন্ধু অথবা ছাত্রস্থানীয় ছিলো।

মুষ্টিযুদ্ধ ব্যাপারে সাধারণ বাঙ্গালীর ছেলের যোগদান এই প্রথম। ইহার পূর্বে দু'চারজন ধনীর সন্তান পেশাদার মুষ্টিযোদ্ধা বেতন দিয়ে রেখে নিজেরা অভ্যাস করতেন শোনা গেছে। এ সম্বন্ধে স্বর্গগত ক্যাপ্টেন জিতেন বাড়ুজ্যে ও সুবেদার মেজর শৈলেন বসুর নাম শোনা যেত। কিন্তু এঁরা কেহই সাধারণ প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন নি কিংবা বাঙ্গালী ছাত্রমহলে মুষ্টিযুদ্ধ প্রচারের চেষ্টা করেন নি। সর্বপ্রথম আমাদের এই নূতন প্রচেষ্টায় ছাত্রসমাজ যেমন সাড়া দিয়ে উঠলো, তেমনি এগিয়ে এলেন আর একজন তাঁর সর্বসাকুল্য সহযোগিতা নিয়ে। এঁর নাম মিঃ পি, এল, রায়। রেলওয়ের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী হোয়ে বাঙ্গালীর ছেলেকে মুষ্টিযোদ্ধা করবার জন্য তিনি যে ভাবে চেষ্টা করতেন তা বাস্তবিকই প্রশংসার যোগ্য। তাঁর সাহায্য না পেলে বাঙ্গালীর ছেলেরা মুষ্টিযুদ্ধ বিষয়ে এতটা অগ্রগামী হোতে পারতো কিনা সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে।

ক্রমশঃ আমরা অনেক নামজাদা মুষ্টিযোদ্ধাদের সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য লাভ করলুম। অনেকের সঙ্গেই লড়বার সুযোগ পেলুম। কত বড় বড় লড়াই দেখলুম। তখনকার দিনের ভারত-বিজয়ী মুষ্টিযোদ্ধার ভেতর গানবোট জ্যাক, মিলটন কিউবস, গানার মেলভিন, জো এ্যাট্রিজ, কিড ডি মিলভা, হ্যারী ড্রিস্কল, ডিক্সি কিড, আর্থার সোয়ারেজ প্রভৃতির কথা আজও অনেকের মনে আছে। ইদানীং কালে সে কয়টী মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হোয়েছে, তাতে স্মরণীয় লড়াই হয়নি বললে অত্যুক্তি হবে না। তার প্রমাণ সেই সেকালের গানবোট

জ্যাক্ আজও অপরাজেয় হয়ে আছেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সে সজীবতা ও মারের প্রচণ্ডতা ক্ষীয়মান হোলেও তাঁর যশোগৌরব ম্লান কোরে দেবার মত উদীয়মান মুষ্টিযোদ্ধার আবির্ভাব আজও হোয়ে উঠলো না।

সহনশীলতা, অফুরন্ত দম্, এবং মারের প্রচণ্ডতা গানবোটের বৈশিষ্ট হোলেও কিউব সাহেবের লড়াইয়ের মধ্যে যে সাবলীলতা ও স্বচ্ছন্দতা দেখেছি, তা অন্যত্র দৃষ্টিগোচর হয়নি। এ প্রসঙ্গে ইংলণ্ডের দুজন শ্রেষ্ঠ মুষ্টিবীরের কথা বোললে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। লর্ড লিটন তখন বাংলার লাটসাহেব। মার্কুইস অফ্ ক্লাইডেস্‌ডেল এবং তাঁর ব্যারিষ্টার বন্ধু ইগান্ সাহেব কোলকাতায় বেড়াতে এলেন। এঁরা দুজনেই পৃথিবীর সখের মুষ্টিযোদ্ধাদের মধ্যে সর্ব্বজয়ী। ইগান সাহেব হেভীওয়েট আর মার্কুইস মিড্‌ল ওয়েট। স্বয়ং লাটসাহেব তাঁদের মুষ্টিযুদ্ধ দেখবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় বাছাই জন কতক মুষ্টিযোদ্ধা নিয়ে একটা প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান করা হোল। ইগান সাহেবের সঙ্গে লড়বার জুড়ী খুঁজে না পাওয়ায় শেষ অবধি মিলটন কিউব্‌স্‌কেই খাড়া করা হোল। মুষ্টিযুদ্ধ যে কতবড় উচ্চাঙ্গের হোতে পারে তা সেদিনকার দর্শকরা বুঝেছিলেন। আক্র-মণের নবতর প্রয়াস ব্যর্থ করবার জন্য আত্ম-রক্ষার যে অসামান্য কৌশল প্রদর্শিত হোয়েছিল তা এক কথায় বলা চলে অপূর্ব্ব। স্বয়ং ইগান সাহেবও কিউবসের ভূয়সী প্রশংসা কোরেছিলেন। মার্কুইসের অসামান্য প্রতিভার পরিচয় পেয়ে আমরা মুগ্ধ হোয়ে গেলাম। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল সৈনিকদের মধ্যে সেরা মুষ্টি-যোদ্ধা। বিলাতেও নাকি তিনি লব্ধ প্রতিষ্ঠ ছিলেন। কিন্তু অতবড় জঙ্গী যোয়ানকে মার্কুইস যেন ইচ্ছামত খেলাচ্ছিলেন। অতবড় উচ্চাঙ্গের মুষ্টিযুদ্ধ আমি আর দেখিনি।

বাঙ্গালীর তরুণ-সমাজে মুষ্টিযুদ্ধ শেখবার যে স্রোত উজান বয়ে ছিলো আজ তাতে একটু ভাঁটা পড়ে এলেও নিরাশ হবার কারণ নেই। উত্থান ও পতন নিয়েই জগৎ। আজ একটু সাময়িক শৈথিল্যের পরিচয় পেলেও সেটাকেই—অনড় বোলে ধরবো না। এই যে উৎকর্ষতার অভাব, এ শুধু আমাদের ছেলেদের বেলাই নয়—খাঁটী গোরা অথবা সাহেবদের পক্ষেও এই কথা খাটে। এর কারণ অবশ্য বহুবিধ। তবে একটা কারণ এই যে পৃষ্ঠপোষকের অভাব। এই দারুণ অর্থকৃচ্ছতার দিনে মুষ্টিবীরদের ক্রীড়া কৌশল দেখতে আশানুরূপ জনসমাগম হয়

না। ফলে কোনও পরিচালকই অর্থ দায়িত্ব নিতে সাহসী হয় না। প্রতিযোগিতার অভাবে মুষ্টিবীরেরা ট্রেনিংএ অমনোযোগী হোতে বাধ্য হন এবং উপার্জনের জন্য অন্য পন্থা গ্রহণ করেন। সখের মুষ্টিবীরদের সম্বন্ধে অবশ্য একথা বলা চলে না। তাদের চাই প্রাণে অফুরন্ত সাহস এবং বড় হবার অদম্য আকাঙ্ক্ষা। ক্রীড়া জগতের এই অংশে নাম করতে গেলে সহনশীলতার বিশেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হোতে হয়। তার জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকা দরকার। বিনা সাধনায় সিদ্ধিলাভ অসম্ভব। দুঃখের বিষয় আজকাল ছেলেদের ভেতর এক মনোবৃত্তির আবির্ভাব হোয়েছে যাকে চলতি কথায় বলা চলতে পারে—"অল্প আয়াসে মেরে দেবো।" সাময়িক অবনতির জন্য এই মনোবৃত্তিই দায়ী।

নামকরা মুষ্টিবীর অথবা কুস্তিগীর হোতে গেলে পেষাদার না হোলে চলে না। তাতে পৃষ্ঠপোষকের প্রয়োজন। আমাদের দেশের অজেয় মল্লবীরেরা সকলেই দেশীয় নৃপতিবর্গ অথবা ভূস্বামীগণ কর্তৃক প্রভূত সাহায্য প্রাপ্ত হন। মুষ্টিযুদ্ধের প্রচলন আমাদের দেশে ছিল না। সুতরাং জনসাধারণ এ বিষয়ে এখনও অজ্ঞ। এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী খেলার আমদানীর মত এই উচ্চস্তরের আত্ম-রক্ষা-কৌশল-প্রণালী ছাত্রসমাজে ঢুকে পড়েছে। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা একটু উন্নত হোলে এর অনুরাগীদের সংখ্যা কম হবে না নিশ্চয়ই। তখন সারা বিশ্বে পরিচয় দেবার জন্য বাঙ্গালী মুষ্টিবীর এগিয়ে আসবে এই কামনাই আমি নিরন্তর করি। "জগতের হাটে বাঙ্গালীর নাম ধ্বনিত হোক্" এই যেন হয় সবার সাধনা।

বাজপাখী

শ্রীসুধাংশুশেখর সেনগুপ্ত

পাহাড় চূড়ায় অস্ত মেঘের বুকে,
বাজপাখী ওড়ে নীল সাগরের পারে,
শিকারী বাজেরা ডানা ঝট্‌পট্‌ করি'
উড়ে যায় ঐ সন্ধ্যা অন্ধকারে।
ধূ-ধূ সাহারার বালু বহ্নির বুকে
চলে উটপাখী, চলিছে বাচ্ছা ছানা,
আকাশে বাজের নখরে হিংসা জাগে,
চঞ্চল হ'য়ে ওঠে বুঝি তার ডানা।
কত নীলাকাশ রাঙা হ'য়ে গেল জানি
শিকারী বাজের নখের আঘাতে ভাই
কত ক্যানারির কত বিহঙ্গ প্রাণ
নীরব হয়েছে কত মূক সন্ধ্যায়।
দল-বেঁধে-যাওয়া সাগর পাখীর ঝাঁকে
বাজের তীক্ষ্ণ চোখেতে জেগেছে লোভ
দেখিতে যদি সে ভরা দুপুরের বুকে
কিচিমিচি ভাষে পাখীদের সেকি ক্ষোভ;
দূরে কালো মেঘে প্রবল ঝঞ্ঝা জাগে,
বাজপাখী ওড়ে নাই তার অবসাদ,
গাংয়ের কিনারে পাখীদের মেলা হ'তে
আকাশে বাজিছে বুকের আর্ত্তনাদ।
সবুজ মাঠের সাদা সারসের হাট
মরাইয়ের পাশে চড়াইএর দঙ্গলে,
বাজের তীক্ষ্ণ লোলুপ দৃষ্টি হেরি'
ঝট্‌পট্‌ করি' লুকাইল জঙ্গলে।
কত নদনদী গ্রাম বনপথ, দেশ,
পাখার আড়ালে পিছনে পড়িয়া থাকে,

যোদ্ধা পাখীর বিশ্রাম নাই মোটে,
উড়িয়া চলেছে সুদূরের কোন ডাকে।
চলে বাজপাখী, ওড়ে বাজপাখী সন্ধ্যা আকাশে ভাই
থামেনাক তার পাখা
ক্ষুদ্র পাখীরা কালো কালো চোখে চায়,
সেই দৃষ্টিতে কাতর মিনতি মাখা।

গান

ডাঃ **শ্রীবিভাসচন্দ্র রায়**

আমরা চাষা ভাই,
রোগে দুখে দুস্থ মোরা, বল্‌রে কোথা' যাই?—
সারা দিনে খেটে মোরা ফির্‌ছি ঘরে হায়,
দিনের শেষে পশ্চিমেতে সুর্য্যি ডুবে যায়।
বিশ্ব মাঝে নিঃস্ব মোরা, নাইরে কিছু নাই,—
আমরা চাষা ভাই।
আমাদের এই চোখের জলে বুন্‌তেছি ভাই ধান,
রক্ত দিয়ে গড়া এ যে, তাই ত এত টান;
তিলে তিলে মোর্‌ছি যে ভাই দেখ্‌বি তোরা কবে?
বাঙলাতে আর সোনার ফসল কেমন করে হ'বে!
একটুখানি মুক্তি মোরা আজকে পেতে চাই,—
আমরা চাষা ভাই।
আমাদেরই রক্তটুকু শুষতে যে সব চায়
ক্ষুধা সবে মিটাবারে খাদ্য নাহি পায়!—
সত্যকারের প্রাণ যে মোরা আজকে পেতে চাই,—
আমরা চাষা ভাই॥

গান

ডাঃ শ্রীবিভাসচন্দ্র রায়

(একি) চাঁদের ভাষা দেখি আকাশে লেখা
এতদিন হেথা থেকে গেল না শেখা ;
(যেন) পৃথিবীকে ভালবেসে
চেয়ে আছে অনিমেষে,
পৃথিবী পাগল তা'রে যেমন দেখা।
চাঁদ, তারা আকাশেতে
খেলাতে রয়েছে মেতে,
উতলা পরাণে ধরা ভাবিছে একা।
ধরার মানুষ সবি
আঁকিছে স্বপন ছবি,
অবোধ মানুষ আঁকে শূণ্য-রেখা ॥

দাদুর স্বপ্ন

শ্রীসুধাংশু রায় চৌধুরী

কাটফাটা গ্রীষ্মে হঠাৎ সেদিন বর্ষার আবির্ভাবে আমাদের প্ল্যান্ সব ওলট পালট হ'য়ে গেল। মামাতো ভাই পটল দেওয়াল ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে একটি বড় রকম দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ব'লে—ঘোর কলিকাল! ভগবান কিছুতেই থাকতে পারে না, বুঝলি নন্তু? আমি বাজি রেখে বলতে পারি বর্ত্তমান যুদ্ধের ভয়ে নিশ্চয়ই তিনি স্বর্গ রাজ্য ছেড়ে পালিয়েছেন। কত ক'রে ব'লাম, ভগবান তোমার ইন্দ্রের ঐরাবতটিকে একটু থামাও, অন্তত ঘণ্টা পাঁচেকের মত সে যেন

শুঁড় নেড়ে নেড়ে ফুটো আকাশেতে জল ঢালা বন্ধ রাখে। আমি ব'ল্লাম,—পটল, বৃষ্টি বোধ হয় এইবার থামতে সুরু ক'রেছে। পটল বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে ব'ল্লো,—কচু, কাঁচকলা ; আরও জোরে বৃষ্টি নেমে আসছে। ঝড়ও উঠতে পারে। পুব আকাশে ঈশান কোনটায় কিরকম কালো কালো মেঘের ঘটা দেখছিস্ না ? ব'ল্লাম,—তাহ'লে এখানে এভাবে চুপচাপ ব'সে কি লাভ বল্। পটল বল্লে,—কি করতে চাস ? আমি ব'ল্লাম,—চল না দাদুর কাছে যাই তবু গল্প শোনা যাবে'খন। পটল আকাশের দিকে তাকিয়ে আর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ব'ল্লে,—তাই চল্। মানুষ আশা করে এক আর হয় আর এক। ঝড় উঠলো। কালো মেঘের কোলে বিদ্যুৎয়ের চোখ ঝল্সানো আলো সশব্দে নৃত্য সুরু ক'রল। কানে আঙ্গুল দিয়ে আমরা দু'জনে এক ছুটে দাদুর ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। চেয়ে দেখি জানালা গুলো বন্ধ ক'রে দাদু দিব্যি আরাম ক'রে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছেন। পটল ব'ল্লে,—চল্, দাদু ঘুমুচ্ছেন, বুড়ো মানুষকে আর জাগিয়ে কাজ নেই। ঘাড় নেড়ে ব'ল্লাম—আচ্ছা চল্। এমন সময় হঠাৎ দাদু ব'লে উঠলেন, কে ? পটলা ব'ল্লে,—দাদু আমরা। দাদু ব'ল্লেন,—আয় ভাই, আয়, আমি একটু···

পটলা হেঁসে ব'ল্লে,—বুঝেছি দাদু, চোখ বুজিয়ে একটু ধ্যান করছিলেন। দাদু ব'ল্লেন—চোখ মিনিট পাঁচেক বুজিয়ে ছিলাম ভাই, কিন্তু ধ্যান করিনি ত। দেখছিলাম সে এক মজার স্বপ্ন। বল্লাম,—কি স্বপ্ন দেখছিলেন দাদু ? দাদু ব'ল্লেন—শুনবি ভাই ? আচ্ছা খাটের ওপর উঠে চুপটি করে বোস্। আমরা দুজনে উঠে দাদুর কোল ঘেঁসে বোসলাম্। দাদু শুয়ে শুয়ে স্বপ্নের কথা ব'লতে আরম্ভ ক'রলেন—আমি যেন আমার মামার বাল্যবন্ধু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের বাড়ীতে গিয়েছি ;—তিনি আমাকে প্রচুর খাবার খেতে দিয়ে মামার সংবাদ, বাড়ীর সংবাদ জিজ্ঞাসা ক'রছেন······। পটলা মাঝখান থেকে ব'লে উঠলো—কি কি খাবার দাদু বলুন না ! দাদু হেঁসে ব'ল্লেন, ভাইয়ের মুখে জল এল নাকি ?

পটল লজ্জিত হ'য়ে ব'ল্লে—খাবারের নাম ব'লছি না দাদু, বলছি তাঁর বাড়ী কোথায় ? আমি আর চুপ ক'রে ব'সে থাকতে পারলাম না। পটলকে ব'ল্লাম, শুনছো স্বপ্ন, তবু বারে বারে অসভ্যের মত কথায় বাধা দেবে। দাদু আমার

পিঠে আস্তে একটি চড় মেরে ব'ল্লেন—আজ যা দেখেছি তা হ'য়ত স্বপ্ন, তিনিও আজ স্বপ্নের অতীত, কিন্তু তাঁর কীর্ত্তি সে তো স্বপ্ন নয় ভাই? কীর্ত্তিই যে মানুষকে অমর ক'রে রাখে। আমি ব'ল্লাম—আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না। তাঁর কথা আমরা কিছুই জানি না। তিনি আপনার মামার বন্ধু এই কি তাঁর সবখানি পরিচয় দাদু? দাদু ব'ল্লেন, আচ্ছা তাঁর সম্বন্ধে ছোট্ট ক'রে তোমাদের কাছে আগে কিছু বলে নি। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের নাম নিশ্চয়ই তোমরা শুনেছ? রজনীকান্ত, হেমচন্দ্রের নামও শুনেছ; এঁদেরই মত ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন শত বর্ষ অতীতের একজন স্বভাব কবি। দাদুকে আমি ব'ল্লাম—আচ্ছা দাদু, এই স্বভাব কবির বাড়ী কোথায়? এনার পিতার নাম, কিছুই ত ব'ল্লেন না? দাদু ব'ল্লেন—অধৈর্য্য হ'লে চ'লবে না ভাই। পটল দাদুকে ব'ল্লো—শুধু আমিই অসভ্য নই দাদু। নন্তু যে ভীষণ অসভ্য সে নিজে তার প্রমাণ নিজেই হাতে হাতে দিলো। আমার দিকে ফিরে হাঁসতে হাঁসতে ব'ল্লো, রাগ করিস্‌নি ভাই! প্রতিশোধের বদলে শোধ বোধ। দাদু ব'ল্লেন—শুনতে চাও ত চুপ কর। চুপ করলাম। দাদু ব'লে চ'ল্লেন—বাড়ী কাঁচড়াপাড়ায়—পিতার নাম হরিনারায়ণ গুপ্ত। ছোট বেলায় ঠিক তোমাদের দু'টির মত অসম্ভব দুরন্ত ছিলেন। কিন্তু তোমাদের চেয়ে ঢের ভালো ছিলেন লেখা পড়ায়। স্মরণ শক্তি ও কবিত্ব শক্তি ছিল অপূর্ব্ব রকমের। মুখে মুখে চমৎকার কবিতা তৈরী ক'রে বলতে পারতেন। দশ বৎসর বয়সে তিনি মাতৃহারা হ'য়ে চ'লে আসেন মামার আশ্রয়ে কলকাতায়। বাংলার সংবাদ পত্র প্রতিদিন সকালে খুলে খেলার সংবাদ, বর্ত্তমান যুদ্ধের সংবাদ যে পড় অথচ কে প্রথম প্রকাশ ক'রেছেন কিংবা সৃষ্টি ক'রেছেন তাঁর নাম এতদিন পর্য্যন্ত তোমরা শোননি—জান না। পটল রেগে গিয়ে ব'ল্ল—দোষ ত আপনাদের। আপনারা শেখাবেন, জানাবেন তবে ত আমরা জানবো শিখবো। আমি ব'ল্লাম—চুপ কর পটল, বড় বড় কথা ছোটদের মুখে সাজে না। দাদু আবার সুরু করলেন। এই বাংলায় সংবাদ পত্র প্রকাশ করেন ও সৃষ্টি করেন ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। পটল জিজ্ঞাসা করল—দাদু, গুপ্ত মশাই বুঝি খুব বড় লোক ছিলেন? দাদু ব'ল্লেন,—তাঁর অবস্থা প্রথমদিকে মোটেই ভালো ছিল না। যাদের ভিতরে ইচ্ছা শক্তি আছে, মানুষের মত মানুষ হবার যাদের চেষ্টা আছে, তারা আজ না হয় কাল একদিন জগতের

সামনে মানুষ ব'লে পরিচয় নিশ্চয়ই দেবে। সাহায্য ভগবান করেন, বুঝলে ভাই? জিজ্ঞাসা করলাম—সে কাগজখানার কি নাম ছিলো দাদু? সংবাদ প্রভাকর—উত্তর দিলেন দাদু। পটল ব'ল্লে, তিনি আর কি ক'রেছেন দাদু ব'লুন না? দাদু ব'ল্লেন—দশটি বছর নানাস্থানে ঘুরে কঠোর পরিশ্রমের পর ভারতচন্দ্র, রাম বসু, রামপ্রসাদ সেন প্রভৃতি বহু পুরাতন কবিগণের জীবন চরিত, লুপ্ত কবিতা তিনিই প্রথমে প্রকাশ করেন। তিনি ছিলেন বাংলা সাহিত্যিকের সম্পাদকের আকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্র। আমি ব'ল্লাম—কতদিন তিনি মারা গেছেন দাদু? দাদু ব'ল্লেন—সে আজ প্রায় বিরাশি-তিরাশি বছর হবে। পটল একটা জানালা খুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে ব'ল্লো—স্বপ্ন ছেড়ে বহু দূরে এসে পড়েছেন দাদু, এবার ফিরুন—সন্ধ্যাও হ'য়ে এল, বৃষ্টিও থেমেছে। আমি বল্লাম—খাবার ত তিনি খেতে দিলেন। তারপর কি হ'ল দাদু? দাদু হেঁসে বল্লেন—খাবার খেতে যাবো সেই সময়ই ত ভাই তোমরা গোলমাল ক'রে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়ে দিলে। যেখানকার খাবার সেইখানেই পড়ে রইলো, আমি বাস্তবে ফিরে এলাম!

"বঙ্গ বন্দনা"

শ্রীগিরীধারী রায় চৌধুরী

ত্বমসি মহীয়সি জননি বঙ্গে
কীর্ত্তিপালিনি, সুপ্রসঙ্গে!
উদেতি ভানু পুরব প্রান্তরে
ঝল-মল, ঝল-মল, তূর্য্য নাদভরে,
বিহগ কলরবে—কানন-কান্তারে
করুণ মন্দ্রা জাগ শ্যামাঙ্গে
জননি বঙ্গে!

সুখতঃ রাজসে সিংহ বাহনে
হাস্ত মুকুলিত বিধুর আননে
বাদ্য বহুবিধ নিয়ত বাদনে
ভক্ত বন্দনা গাহিছে রঙ্গে
ত্বমসি মহীয়সি জননি বঙ্গে !

নম, শান্তি সুখময়ী রমণীয়াং
নম, ললিত কান্তিময়ী কমণীয়াং
অমৃত বিকশিতাং রুদ্র তরঙ্গে,
জননি বঙ্গে।

ধান্য ধাম্নি ত্বং হি গৌরী
ধ্বংস তিমিরে ত্বংহি সৌরী
গগন চুম্বিত কীরিট মৌরি
দিগন্ত মুখরিত মঙ্গল শঙ্খে।
ত্বমসি মহীয়সি জননি বঙ্গে।

মুক্তবেণী তব দুকুল বন্দরে
পণ্যবাহী পোত অকূল সন্তরে
আশার দীপ তুমি বণিক অন্তরে
সাগর দুস্তর লহর ভঙ্গে।
ত্বমসি মহীয়সি জননি বঙ্গে।

বিদ্যাপীঠ তলে তুমি গায়ত্রী
গৃহে লক্ষ্মীরূপা সতী-সাবিত্রী
কুঞ্জর পিঠে সমর কর্ত্রী
কোষমুক্ত করি উদ্যত অসি
শত্রু সংহারে ধেয়ে চল রোষি
বীর সন্তানদল উধাও সঙ্গে
জননি বঙ্গে।

আমাদের রবীন্দ্রনাথ

শ্রীদীনেন্দুসুন্দর দাস, বি. এ.

বাঙলার যে-সব মনীষী জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনা কোরে বিশ্বের দরবারে খুব সম্মানিত আসনের অধিকারী হয়েছেন, যাঁদের গরিমার জ্যোতিতে ভারতের আকাশ উদ্ভাসিত, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁদের অগ্রগণ্য। বাণী ও কমলার কৃপাদৃষ্টি সমভাবে সুপতিত এমন একটি সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ব্রাহ্মণ পরিবারে রবীন্দ্রনাথের জন্ম। শিক্ষা দীক্ষা, মান-সম্ভ্রম, পশার প্রতিপত্তিতে এই বংশ বাঙ্‌লা দেশে সুপরিচিত। বাঙ্‌লা ১২৬৮ সালের ২৫শে বৈশাখ ছিল অক্ষয় তৃতীয়া। এই পুণ্যতিথিতে (ইং ১৮৬১, ৬ইমে) মহাপুরুষ রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা দেবেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ সন্তান রবীন্দ্রনাথ। বংশের সব সদ্‌গুনের অধিকারী কোরেই বিধাতা বুঝি তাঁকে গড়েছেন। রবীন্দ্রনাথের পিতামহ দ্বারকানাথ "প্রিন্স দ্বারকানাথ" নামে বিলাতের সমাজে সুপরিচিত ছিলেন। বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ নিজ চরিত্রগুণে "মহর্ষি" আখ্যা প্রাপ্ত হন। মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ প্রথম বাঙালী সিভিলিয়ান। কর্ম্মস্থান আমেদাবাদে তাঁর একটি বিরাট লাইব্রেরী ছিল। বালক রবীন্দ্রনাথ এই অপার গ্রন্থসাগরে ডুব দিয়া যে অমৃতের আস্বাদ পেয়েছিলেন পরবর্ত্তী জীবনের সাধনায় তা'রি নব নব রূপ রূপায়িত হয়েছে।

সকল দিকের অতুল ও অমিত সৌভাগ্যে রবীন্দ্রনাথ ভাগ্যবান। বিদ্যায় বুদ্ধিতে মান-সম্ভ্রম ও ঐশ্বর্য্যে তাঁর নাম জগৎজোড়া। কিন্তু মাতৃহীনতার করাল কৃষ্ণছায়া তাঁর জীবন-প্রভাতের দীপ্তি ও ঔজ্জ্বল্যকে অনেকখানি ম্লান করেছিল। কবিতায় তাঁর হাতে-খড়ি হয় প্রায় আট বৎসর বয়সে। বালক রবীন্দ্রনাথের কবিতা শুনিবার শ্রোতার মধ্যে বাড়ীর পাচক, সহিস ও গোমস্তা সরকাররাই ছিল প্রধান। দাদারা তেমন আমল দিতেন না বলে উৎসাহের আগুন এতটুকু নিভে নাই। রবীন্দ্রনাথের বাল্যশিক্ষা সাধারণ ছেলেদের ধরণে হয় নাই। স্কুলের বাঁধাধরা নিয়ম কানুনের গণ্ডীতে আটক থাকায় ভাবী কবির বাড়ন্ত

মন সায় দেয় নাই। তাই গতানুগতিক কেতাবী বিদ্যা অর্জ্জনের দিকে না ঝুঁকিয়া গৃহে ব্যাপক অধ্যয়নের প্রতি কবির দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। এই সাধনার একনিষ্ঠা তাঁকে শুধু জ্ঞানী কোরে ক্ষান্ত হয় নি, যশের দীপ্ত মুকুট তাঁর মাথায় পরিয়ে দিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি নন, তাঁর আরও পরিচয় আছে। তিনি একজন শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও শ্রেষ্ঠ ভাবুক। গান আর কবিতার ভেতর দিয়ে এই বিশ্বজগতের মিলনের কথা তিনি এত সুন্দর কোরে বলেছেন যা' আর কেউ বলেন নি। গান, গাথা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, কাব্য, প্রবন্ধ ইত্যাদি সাহিত্যের সব বিভাগেই তিনি সিদ্ধহস্ত। আট বৎসর বয়সে সাহিত্য সাধনা সুরু কোরে আজ ৭০।৭২ বৎসর কাল সমানে অক্লান্তভাবে তিনি বঙ্গবাণীর সেবা কোরে এসেছেন। এ সাধনার দৃষ্টান্ত জগতে দুর্লভ। যুগে যুগে বহু কবি জগতে বক্তব্য বহু বাণী বহন ও প্রচার কোরে এসেছেন কিন্তু রবীন্দ্র-সাহিত্যের বাণী অপূর্ব্ব। এ সাহিত্যে পাখীর গান, চাঁদের আলো, মলয় পবনের সঙ্গে জমিদারের অত্যাচার, নায়েব গোমস্তার অবিচার, কৃষকের অনাহার ও সর্ব্বহারার রিক্ততা ফুটে উঠেছে। মুমূর্ষু, পঙ্গু জাতির জীবনবেদরূপে এ সাহিত্যের একটা দিক যেমন জাতীয় জীবনে নব জাগরণের বন্যা এনে দিয়েছে, তেমনি স্নেহ-মমতা প্রেম ও প্রীতির অনন্ত আকর রূপে রবীন্দ্র-সাহিত্যের আর একটা দিক আমাদের সমাজকে সরস ও সঞ্জীবিত কোরে রেখেছে। রবীন্দ্র-সাহিত্য এত বিরাট, এত প্রচুর ও এত মহান্ যে, বিশ্বের সুধীসমাজ তাকে একযোগে সসম্মানে স্বীকার করে নিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ একজন মস্ত বড় ভাবুক ও ভ্রমনকারী। ইংলাণ্ড, চীন, জাপান, পারস্য, আমেরিকা, ফ্রান্স, আরব, ইরাণ প্রভৃতি নানা দেশ ঘুরে জীবনে তিনি বহু ও বিচিত্র অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করেছেন। যেখানে যখন গেছেন সেখানেই তিনি সম্মানের মুকুট ও সুযশের রত্নহার মাথায় ও গলায় পরেছেন। জগতের কোন রাজা বা আমীর এত মান খাতির পান নি।

রবীন্দ্র-সাহিত্যে শিশু মনের সারল্য ও উদারতা, আনন্দ ও বেদনা সহজ ও সুস্পষ্টরূপে ফুটে উঠেছে। তাঁর শিশু ভোলানাথ, ছুটির পড়া, পাঠপ্রচয়, ছড়া ও গান ইত্যাদি শিশুমনের উত্তম আহার্য্য। আকাশ-ছোঁওয়া রঙীন কল্পনার নূতন নূতন ফানুষ, রামধনু ও ইন্দ্রধনুর বর্ণসমারোহ, প্রকৃতির সহিত মানুষের

অন্তরঙ্গতা এ সবই রবীন্দ্রনাথ শিশুসাহিত্যে সুন্দরভাবে পরিবেশন করেছেন। বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে আমাদের মন যাতে বুড়ো হয়ে না পড়ে, সংসারের নানা সংঘাতে আমরা যাতে দিশাহারা হয়ে না পড়ি, জগতের শ্রেষ্ঠ কবিরা যুগে যুগে তাই প্রচার করেছেন। তারুণ্য, মানবতা, বিশ্বপ্রেম, সহজ ও সরল জীবনযাত্রা রবীন্দ্র-সাহিত্যের মর্ম্মবাণী।

রবীন্দ্রনাথ ১৯১৩ অব্দে সাহিত্যিকের শ্রেষ্ঠ সম্মান "নোবেল প্রাইজ" পেয়েছেন। এই পুরস্কারের পরিমান একলক্ষ বিশ হাজার টাকা। এই বিশাল অর্থের প্রায় সবটাই বিশ্বকবি বিশ্ব-ভারতীর সংগঠন ও প্রসারে নিযুক্ত করেছেন। বোলপুরের বিশ্ব-ভারতী একটি আধুনিক তপোবন। বিশ্বের নানা দেশের নানা জাতীয় লোক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চ্চার উপলক্ষে এখানে সমবেত হয়েছেন। অধ্যাপক ও ছাত্রের মধ্যে একটি প্রীতিকর ও মধুর সম্পর্ক স্থাপন শান্তিনিকেতনের শিক্ষার একটা অঙ্গ। দেশবিদেশের জ্ঞানভাণ্ডার থেকে রত্নরাজি আহরণ কোরে সুলিখিত পুস্তকের সাহায্যে সে-সব বস্তু শিক্ষার্থী সকলের মধ্যে বিতরণ করাই এই আশ্রমের একটি লক্ষ্য। মৈত্রী ও মানবপ্রেমের সূত্রে দেশবাসীর মিলনসাধনের ব্রত যাঁরা গ্রহণ করেছেন, তাঁরা আমাদের নমস্য ও

বর্ষে বর্ষে অক্ষয় তৃতীয়া আসে। হিন্দুর চোখে এটি একটা বড় শুভদিন। বাঙলার কৃষ্টি ও সাহিত্য সাধনার ইতিহাসে এদিনের একটি নব সার্থকতা আছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন বলে ২৫শে বৈশাখ বা অক্ষয় তৃতীয়া আমাদের এত প্রিয় ও স্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথ আজ অশীতিবর্ষ পার হতে চলেছেন। বয়সোচিত জরা ও দৈহিক দুর্ব্বলতা তাঁকেও কবলিত করেছে। কিন্তু তাঁর মনের চির-তারুণ্য আজও অটুট আছে। আজও তিনি নতুন কবিতা লিখে, নতুন ছবি এঁকে অপার আনন্দ লাভ করেন। জীবনের প্রতিটি সূর্য্যোদয়কে তিনি সমান অভিনন্দিত করেছেন। মানুষ হিসাবে তিনি অতুলনীয়। তাঁর ভদ্রতা, রসবোধ ও সহৃদয়তার তুলনা নাই। এক জীবনে এত প্রচুর সম্মানের অধিকারী খুব কম লোকই হতে পেরেছেন। রবীন্দ্রনাথ বাঙলার গৌরব, বাঙ্গালীর গৌরব। বাঙ্‌লার আকাশের এই উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের দ্যুতি চিরকাল উজ্জ্বল থাকুক্ ইহাই প্রার্থনা। সমগ্র দেশবাসীর মিলিত শুভকামনায়, বিশ্বের

অগণিত অনুরক্ত নরনারীর আকুল আগ্রহে বিশ্বকবি শতায়ু জীবন লাভ করুন দেশের লোক তাহাই চায়। সর্ব্বনিয়ন্তা এই বাসনার চিরপূর্ণতা দান করিবেন।

এসো বাঙ্‌লার ভাইবোন! আজ "হালখাতা"র আনন্দ উৎসবে আমরা আনন্দময় সচ্চিদানন্দের কাছে অমিত আনন্দের প্রেরনা চেয়ে নি; এসো আমরা সমস্বরে বলি—সহস্র বিভেদ সত্বেও আমরা অখণ্ড, এক। বলি, আমাদের রবীন্দ্রনাথ বাঙলার গৌরব, ভারতের গৌরব, বিশ্বের গৌরব। বাঙ্‌লার মানস-সরোবরে যে অম্লান শতদল রঙে রসে রূপে এতবড় হয়ে ফুটে উঠেছে সে কুসুমের সৌরভে জগৎ আজ সুরভিত, তার রূপে বিশ্ব বিমুগ্ধ। এই অম্লান অরবিন্দের আরাধনায় আজ আমরা আনন্দে আত্মহারা। আমাদের এ আনন্দ অটুট থাক্, আমাদের রবীন্দ্রনাথ শতবর্ষাধিক নীরোগ সুস্থ জীবনের অধিকারী হইয়া উঠুন, ইহাই কামনা।

শিশুদের মনের গতি ও শিক্ষা—

শ্রীমতী গৌরীরাণী দেবী

অবিশ্রান্ত ঝ'রে ঝ'রে পড়ছে শ্রাবণের ধারা; মেঘের নিবিড় সমারোহ আকাশের বুকে। সেই সময়ে পথের ধারে একটা ছোট্ট ঘরে বসেছিল একটা ছোট ছেলে; সম্মুখে তা'র উন্মুক্ত জানালা। টেবিলের ওপর তার বিক্ষিপ্ত পাঠ্যপুস্তকগুলি,—ইতিহাস, পাটিগণিত, ইংরাজী, ইত্যাদি।

সে চেয়ে থাকে দূর পথের পানে। অমনোযোগী মন বিদ্রোহ ক'রে ওঠে। পড়্‌তে তার ভাল লাগে না। ঘর-ছাড়ান সুরে বাদল ধারা তাকে তখন ডাকে, "আয় আয়, ওরে চপল শিশু ছেড়ে আয় তোর সকল ভাবনা।" তবুও তা'র অন্তরে কোথায় যেন একটা ভাবনার রেশ ঘুরে বেড়ায়। মনে পড়ে যায়—পড়াশুনা না করলে পিতা ভৎর্সনা করবেন, শিক্ষক মহাশয় শাস্তি দিবেন।

আবার গুরু গুরু রবে মেঘের মাদল বেজে ওঠে। মন তার চঞ্চল হ'য়ে ওঠে। সে জানালা দিয়ে দেখতে পায় বুড়ো বটগাছের তলায় তার সব খেলার সাথীরা জুটেছে। গ্রামের দীঘিতে কেউ আবার শালুক ফুল তুলছে, বাঁশের কঞ্চী দিয়ে টেনে টেনে। তার মনটাকেও টানে সেই দিকে। হঠাৎ তার কানটাতে টান পড়ে। ফিরে দেখে যে স্বয়ং পিতা দাঁড়িয়ে। নির্ব্বাক হয়ে চেয়ে থাকে পিতার মুখের পানে। পিতার কণ্ঠস্বরে ক্রোধের সুর বেজে ওঠে, "এই বুঝি তোর পড়া হচ্ছে? জানালার ধারে বসে হাঁ করে দেখছিস্ কি অমন করে? অঙ্কগুলো কষেছিস্?"—এই বলে তিনি টেবিলের ওপর থেকে শ্লেটখানা নিতে যাচ্ছেন এমন সময় শ্লেটখানির পার্শ্বস্থিত একখানি কবিতার বই তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কবিতার বইটা খোলা অবস্থায় দেখে তিনি তা তুলে ধরেন চোখের সামনে। তাতে বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে :—

"ঐ দেখ মা বৃষ্টি এল ঘন ঘটায় ঘিরে
বিজুলী ধায় এঁকে-বেঁকে আকাশ চিরে চিরে।
দেবতা যখন ডেকে ওঠে থর্‌থরিয়ে কেঁপে
ভয় করতেই ভালবাসি তোমায় বুকে চেপে।
আজকে আমার ছুটী মা'গো, শনিবারের ছুটী;
কাজ যা' আছে সব ফেলে আয়, মা তোর পায়ে লুটি।"

কবিতা পাঠ করে তিনি সন্তুষ্ট হ'তে পারেন না। তিরস্কার করে চলে গেলেন গোটা দশেক অঙ্ক কষবার আদেশ দিয়ে। ছেলের মুখখানি বিবর্ণ হয়ে যায় আশঙ্কায়।

এই যে পিতার শাসন এর কোন মূল্য নেই! ছোটো ছেলেদের প্রতি সহানুভূতি চাই। তাঁরা যেন শিশু মনের ধারা শিশুমন নিয়েই বিচার করেন। নিজেদের বিজ্ঞ, কর্ত্তব্যপরায়ণ চিত্ত নিয়ে তাদের মনের ধারা বিচার না করেন। শিশুদের মনের গতি বুঝতে হলে তাঁদের ফিরে যেতে হবে তাঁদের অতীত জীবনের শৈশবকালের পথে। হাসিখেলা আনন্দের ভিতর দিয়ে দিতে হবে তাদের শিক্ষা। শিশুদের আনন্দের ভিতর দিয়ে যা-কিছু শেখানো যায়—সেটা তারা কখনো ভুলে যায় না, চিরদিন মনে রাখে। আর

তিরস্কার শাসন দ্বারা যা-কিছু শিক্ষা দেওয়া যায় সে শিক্ষার কোনো মূল্য থাকে না। অভিভাবকরা যেন তাদের আনন্দের সঙ্গে শিক্ষা দান করেন।

শিশুরাই দেশের আশা ভরসা। বালক বিশেষের শক্তি মেধা প্রভৃতির স্বতন্ত্র বিচার না করে সব্বাইকেই যেন এক ছাঁচে ফেলে মানুষ করা না হয়।০ শিক্ষা দিবার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে, বালকদের কোন্ বিষয়ে স্বাভাবিক অনুরক্তি আছে। যে বালকের কাছে যে বিষয় প্রিয়—তাকে সেই বিষয়েই শিক্ষা দেওয়া উচিত মনে করি। এই উপায় অবলম্বন করলে তাদের বুদ্ধির বিকাশ হবে এবং অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া সহজ সাধ্য হয়ে উঠবে। শরীরের সম্পূর্ণ গঠনের জন্য যেমন ভক্ষ্যদ্রব্যের বৈচিত্র্য আবশ্যক তেমনি মস্তিষ্কের গঠনের জন্যও নানা বিষয়ের অনুশীলন প্রয়োজন।

শিশু-সাহিত্যের দ্বারা শিশুমনের অনেক উন্নতি সাধিত হয়। তাদের অনুসন্ধিৎসু চিত্তের সঠিক উত্তর, তারা যেন খুঁজে পায় শিশু-সাহিত্যের ভিতরেই। শিশুরা যেন লেখাপড়াকে ভয় না করে। তারা যেন লেখাপড়াকে ভালোবাসতে পারে খেলার মতন। ভালোবাসতে পারে, যদি না শুধু লেখা পড়াই তাদের ঘাড়ে ভূতের মতন চেপে না বসে। এমন অনেক আত্মাভিমানী ছেলে দেখা যায়, তারা শাসনকে মেনে নেবার পূর্ব্বে কৈফিয়ৎ চায়। জীবনের উন্নতির পক্ষে এটা নাকি ভালো লক্ষণ নয়। অভিভাবকগণ তাই মনে করেন। ছেলেকে কঠোর শাসন দ্বারা নিষ্পেষণ করে আদর্শ ছেলে গড়বার আ-প্রাণ চেষ্টা চলতে থাকে। ছেলে যদি নীরবে গুরুজনের আদেশ পালন করে যায়—অর্থাৎ তার অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রশ্ন ও যুক্তিকে অবজ্ঞায় উড়িয়ে দিতে পারে তা হলেই সে ভালো ছেলে হয়ে উঠবে। এই ধারণা।

তাই ভাবছি, নিজের খেয়াল মত গড়ে তুলতে পারলেই কি শিক্ষার চরম আদর্শ এবং লক্ষ্য সার্থক হয়ে উঠতে পারে? জীবনকে ফুটিয়ে তুলবার একটা অনায়াস পন্থা কি নেই? অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে তাদের মনের কথা বুঝতে পারলে সবদিক দিয়ে তাদের কল্যাণ হতে পারে। সব ছেলেই তো আর সমান নয়; কাজেই ছেলে ভালো করবার দরুণ ব্যবস্থাটাও সকলকার সমান হতে পারে না। শিশুকাল হতেই তাদের অন্তরে জাগিয়ে তুলতে হবে স্বদেশী ভাব। বিলাসীতার আবহাওয়া থেকে তাদের দূরে রাখতে হবে। শিশুরা যখন শিশু থাকে, তখন

তাদের মনের ধারা, মনোভাব প্রত্যেকের এক রকম থাকে। বাইরের সাজ সজ্জায় প্রকাশ পায় কে ধনী আর কেইবা দরিদ্র। কিন্তু মনের কাছে ধনী ও দরিদ্রের প্রশ্ন খাটে না। শিশুচিত্তের বিচিত্র ধারা। শিশুদের মনের ক্ষুধা মিটাতে অভিভাবকগণ পারেন না। শিশুদের কখনো সাধ যায় ঐ নৌকার মাঝি হতে। কখনো সাধ যায় 'দইওয়ালা হয়ে দই বিক্রী করে বেড়াতে। আবার কখনো সাধ যায় রাখালবালক হয়ে মাঠে গরু চরাতে। আবার কখনো সাধ হয় মূর্খ ছেলে হয়ে থাকতে মায়ের কোলের কাছে। পণ্ডিতমশাই হতে চায় না।

শিশুদের অন্তরে জাগিয়ে তুলতে হবে আনন্দ। তাদের লেখাপড়া শেখাতে হবে খেলার ছলে, আনন্দের মধ্য দিয়ে। তবেই তারা লেখাপড়ায় মনোযোগী হবে। তাদের অন্তরে আনন্দের উৎস বয়ে যাবে। যা কিছু শিক্ষা দেওয়া যাবে, আনন্দ ও খুসির বন্যায় তা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবে হৃদয়ের কানায় কানায়।

"জগৎ পারাবারের তীরে শিশুরা করে খেলা
জানেনা তারা সাঁতার দেওয়া জানেনা জাল ফেলা।
ডুবারি ডুবে মুকুতা চেয়ে
বণিক ধায় তরণী বেয়ে
ছেলেরা নুড়ি কুড়ায়ে পেয়ে
সাজায় বসি ঢেলা।
রতন ধন খোঁজেনা তারা
জানেনা জাল ফেলা।"

কণা

শ্রীমতী রেণুকণা রায়

কাল কোকিল তা'র মিষ্ট স্বরে সুধা ঢালে সবার প্রাণে;
সাদা হাঁসের প্যাঁক-প্যাঁকানি গরল হানে সবার কানে!

"ওঁ —হরি নাম সত্য !"

শ্রীদ্বিজেন্দ্রসুন্দর দাস

এক ছিল পোদ্দার নাম রাধানাথ
শ্যামধন নামে তার ছিল এক ছেলে।
ব্যবসায় দু'জনার বেশ পাকা হাত
খদ্দেরে ঠকাইতে জোড়া নাহি মেলে॥
সোনা-রূপা-কারবার ছিল তাহাদের
ছোটো-খাটো সহরেতে বড় ব্যবসায়।
সারাদিন দোকানেতে লোক আসে ঢের
কলরব করি' সবে কত কি যে চায়॥
গহনার বেচা-কেনা, ভাঙ্গা-গড়া চলে
বাপ্-ছেলে হরদম্ খাটে মুখ বুজে।
খদ্দেরে যত পারে বাজে কথা বলে
রাধা শ্যাম ইসারাতে কাজ নেয় বুঝে॥
"হর-হর", "হরি-হরি", এই দুটি নাম
লেগে আছে মুখে মুখে সদা দু'জনার।
"হর-হর" বলে রাধা, "হরি-হরি" শ্যাম
লোকে ভাবে, স্মরে ওরা ভব-পারাবার॥
বোঝে না তো খদ্দেরে কী মজার সাঁট্
লুকাইয়া আছে ঐ "হর-হরি" বোলে।
কত জুয়াচুরি-মাঝে দাঁড়ায়েছে ঠাট্
হরদম্ আসে টাকা কত চালে চলে॥
"হর-হর" মানে হোল, "করো হে হরণ"
"হরি-হরি" মানে "এই করলাম চুরি।"
তিল-তিল করে সোনা-রূপা-আহরণ
খদ্দের সম্মুখে চলে ভুরি ভরি॥
অবশেষে তাহাদের এই ফাঁকি-বাজি
ধরা পড়ে হাতে-নাতে, ঘটে বিভ্রাট

ফাঁস হোয়ে গিয়ে ক্রমে যত কারসাজি
কারবারে ঘুন ধরে, ভেঙ্গে যায় ঠাট্ ॥
শুন্‌বে কি সেই কথা, শোনো তবে বলি,
আমি নিজে ধরেছিনু এই জুয়াচুরি ;
মুখ খুলে দিয়েছিনু ফাঁকি-বাজি থলি
সত্যের নদী মাঝে মিথ্যার ঝুড়ি ॥
ডুবে যায় চির তরে, হয় দফা-রফা
রাধা-শ্যাম দুজনার, দোকানটি শেষ !
রটে যায় সহরেতে এ মজার কথা
কেহ হাসে, কেহ রাগে, আমি বলি "বেশ" ॥

টু লেট

শ্রীকাশীনাথ চন্দ্র

শেষ পর্য্যন্ত শান্তিনাথ জুতোর বাক্স ছেঁড়া একখানা পিজবোর্ড যোগাড় করে তার ওপর "টু লেট, প্লীজ এনকোয়ার উইদিন্" লিখে দরজার বাইরে একটা পেরেক পুঁতে টাঙ্গিয়ে দিল, মানে দিতে বাধ্য হ'ল। শান্তিনাথ বড়লোকের ছেলে···তার বাবা বর্ত্তমান না থাকলেও তাঁর ব্যাঙ্কের পাশ বইখানা বর্ত্তমান এবং সেই বইতে যে সংখ্যাটা সঞ্চিত টাকার পরিমান নির্দ্দেশ করচে সেটা বেশ হৃষ্টপুষ্ট। সুতরাং শান্তিনাথের বাড়ী 'সাবলেট্' করবার কোন দরকারই ছিল না, এবং সেরকম চিন্তাও সে কোনদিন করেনি ; কিন্তু গোলমাল বাধাল শান্তিনাথের বাল্যবন্ধু সত্যচরণ। সত্যচরণ ইকনমিক্সে এম, এ, পড়ে··· সুতরাং কথায় কথায় অর্থনৈতিক সঙ্কট সম্বন্ধে 'লেক্‌চার' ঝাড়ে এবং কারও মাথায় বড় বড় চুল দেখলেই খাতা-পেন্সিল নিয়ে হিসাব করতে সুরু করে দেয় যে, যদি মাথার চুল এক ইঞ্চি বড় হয় তবে সেই চুলের পিছনে দৈনিক এক পাইএর তেল বেশী খরচ হয়, তাহলে বছরে বছরে একটা পরিবারের সেই চুলের জন্য কত ক্ষতি হচ্ছে,—আর যদি এক ইঞ্চি ছোট হয়, তাহলে সেই অনুপাতে কত লাভ হচ্ছে। সেই বাধাল গণ্ডগোল।

শান্তিনাথও এম, এ, পড়ে—তবে ইতিহাসে। সেদিন সকালবেলা সে যখন হর্ষবর্দ্ধন কত কোটি লোকের হর্ষবর্দ্ধন করে তবে 'হর্ষবর্দ্ধন' নাম পেয়েছিলেন এই গবেষণায় ব্যস্ত, সেই সময় এল সত্যচরণ। ঝুপ করে একখানা চেয়ারে বসে পড়ে বল্‌ল, "বুঝলে শান্তি, আমার কথা শোন · এত বড় বাড়ী, ওপরে চারখানা ঘর, নীচে চারখানা। অথচ বাস করবার লোকের মধ্যে তুমি একা ··ওপরের ঘর ক'খানা নিজের জন্যে রেখে নীচের ক'খানা তুমি অনায়াসে ভাড়া দিতে পার।"

শান্তিনাথ হেসে বল্‌ল, "কি হবে ভাড়া দিয়ে?···টাকা? টাকা আমার যা আছে, তাই আমি দু'হাত দিয়ে খরচ করেও সারা জীবনে শেষ করতে পারব না। তা'ছাড়া কতই বা ভাড়া পাব। নীচেকার ঘর···বড়জোর কুড়ি বা পঁচিশ টাকা···তার বেশী কেউ দেবে না।" সত্যচরণ রাগত স্বরে বল্‌ল, "ওই তো আমাদের দোষ ··টাকা থাকলে আর টাকা রোজগারের চেষ্টা করি না। ওই দোষেই তো বাঙালী মরেচে। এইতো মাড়োয়ারীরা প্রত্যেকে লাখ লাখ টাকার মালিক, কিন্তু ব্যবসা তুলে দিয়ে বাড়ী বসে আছে বলে একটাকেও দেখাতে পার?"

শান্তিনাথ নিরুত্তর হয়ে মাথা চুলকোতে লাগল।

বন্ধুকে নিরুত্তর দেখে সত্যচরণ একটা সিগারেট্ ধরিয়ে সোৎসাহে বল্‌তে লাগল, "কুড়ি টাকা করে ভাড়া পাবে বল্‌চ, তার মানে, তিনশ' কুড়ি আনা, এক হাজার দু'শ আশী পয়সা—নট্ এ ম্যাটার অফ জোক্ একটা পয়সার অভাবে কত লোক না খেয়ে মারা যাচ্ছে। আচ্ছা ধর যদি কুড়ি টাকা করেই হয়, তা হলে ইন্ এ ইয়ার হলো গিয়ে দু'শ চল্লিশ··· দশ বছরে হল দু হাজার চারশ'···তা হলে ইন এ সেঞ্চুরি···উঃ!"···

শান্তিনাথ অত ভেবে দেখেনি। এখন সত্যচরণের কথা শুনে তার মাথা বোঁ বোঁ করে ঘুরে উঠল। তারপর বহু ভাবনা চিন্তা করে সপ্তাহ খানেক পরে একদিন সকাল বেলা সে যা করল তা আগেই বলেছি।

টু লেট্ টাঙ্গিয়ে দেবার ঘণ্টাখানেক পরে শান্তিনাথ চা পান করবার জন্যে ওপরের ঘরের টেবিলের কাছটিতে গিয়ে বসেছে। তার ঠাকুর খান কয়েক ফুল্‌কো ফুল্‌কো লুচি, পটলভাজা, ধূমায়িত 'চা' এই সব দিয়ে

গেছে। গরম চা এবং লুচির গন্ধে উৎফুল্ল হয়ে শান্তিনাথ পটল ভাজা সংযোগে যেমন একখানি লুচি মুখে তুলতে যাবে, অমনি নীচে কড়া নাড়ার শব্দ হল, "মশায়—অ মশায়, বাড়ী আছেন—"

বিরক্ত হয়ে শান্তিনাথ নীচে গেল। দরজার সামনে এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। মুখে এক মুখ খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোঁফ···শ্রীটাক শোভিত মস্তক, গায়ে একটা তেলচিটা জামা, পায়ে ক্যাম্বিসের জুতা, বগলে ছাতা। ভদ্রলোক হেসে বললেন, "নমস্কার—"

শান্তিনাথ প্রতি-নমস্কার করে বল্ল, "কি চাই আপনার ?"

—শান্তিনাথবাবু বাড়ী আছেন ?

—আমারি নাম শান্তিনাথ—কি চাই বলুন।

—আজ্ঞে বাড়ী ভাড়া নেব।

শান্তিনাথ খুসী হয়ে বল্ল, "তা বেশতো--আসুন ঘর দেখাই—

শান্তিনাথ ভদ্রলোককে ঘর দেখালে। ঘর ভদ্রলোকের পছন্দও হল। কিন্তু যেই শুনলেন ভাড়া কুড়ি টাকা, অমনি চোখ কপালে তুলে বল্লেন, "বলেন কি মশায়! নীচেকার ঘরের ভাড়া কুড়ি টাকা···না-না—কম করে বলুন—কম করে বলুন"—

তারপরেই শাক, মাছ, বেগুণের মত দর কষাকষি সুরু হল। শান্তিনাথ সবিনয়ে বলল—"আজ্ঞে না, কম হবে না—আমার এই এক কথা।"

ভদ্রলোক বল্লেন, "আপনি যে দেখচি একেবারে রাজর্ষি জনক, ধনুক ভঙ্গ না হলে আর কথা বল্বেন না!"

শান্তিনাথ বল্ল, "সে আপনার যা খুসী বলতে পারেন। ওর চেয়ে কম আর কিছুতেই হবে না।"

ভদ্রলোক বল্লেন, "কেন হবে না মশায়—যুদ্ধের বাজার বলে কি বাড়ী ভাড়াও বেড়ে গিয়েছে ?"

শান্তিনাথ রাগে অগ্নিশর্ম্মা হয়ে বল্ল "ওর চেয়ে এক পয়সাও কম হবে না। আপনার না পোষালে আপনি যেতে পারেন। আমি এখন একটু ব্যস্ত আছি। আচ্ছা—নমস্কার।"

ভদ্রলোক রাগে গজ গজ করতে করতে বেরিয়ে গেলেন।

শান্তিনাথের মন তখন পড়ে রয়েচে চায়ের কাপের দিকে। সে দরজাটা বন্ধ করে উপরে ওঠবার জন্যে সবে সিঁড়িটায় গিয়ে পা দিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে আবার কড়ানাড়ার শব্দ হ'ল। শান্তিনাথ ফিরে এসে দরজা খুলে দিল।

এই ভাবে সুরু হল লোকের আগমন। সারা কলকাতা সহরের লোক যেন শান্তিনাথের এই ঘর ক'খানির জন্যেই উন্মুখ হয়ে বসেছিল। কত লোকই এলো। ঢ্যাঙা লোক, বেঁটে লোক, মোটা লোক, চ্যাপটা লে.ক, শুঁটকো লোক, পিলেরুগী পটকা লোক, খাঁদা লোক, কানা লোক, ট্যারা লোক, কালা লোক, খোঁড়া লোক, ছড়িহাতে বাবু লোক, ঝাঁকড়াচুলো কবি লোক, গলালম্বা গাইয়ে লোক। তার ওপর তাঁদের আবার কথা কি সব। কেউ বললেন "নীচেকার ঘর, বড্ড ড্যাম্প, স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর।" কেউ বল্‌লেন, বাড়ীর মধ্যে একটু বাগান হলে ভাল হোতো—কেউ বল্‌লেন "ঘরের মেঝেয় কড়িখেলার ঘর আঁকা নেই কেন?"

শান্তিনাথের চা আর গরম লুচির দফা তো গয়া। সে দরজার কাছে একখানা চেয়ার পেতে বসে এই সমস্ত প্রশ্নের যথা সম্ভব উত্তর দিচ্ছিল আর ভাবছিল, "হায় ভগবান, সত্যচরণের মনে এই ছিল!"

বিরক্তিতে হতাশায় শান্তিনাথ যখন পরিত্রানের পথ খুঁজচে তখন এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক এসে বল্‌লেন, "এহানে শান্তিবাবু আছেন নি—"

শান্তিনাথ বল্‌লে, "আজ্ঞে আমারি নাম—"

ভদ্রলোক বললেন, "অ, তা আগে বইস্‌তে দ্যান, তারপর কথা কমু—"

শান্তিনাথ বৃদ্ধকে চেয়ার ছেড়ে দিয়ে নিজে দাঁড়িয়ে রইল। ভদ্রলোক চেয়ারের ওপর জাঁকিয়ে বসে বললেন, "বারি (বাড়ী) দান কইরতে চান কিসের লাইগা, বসত কইরবেন না?"

শান্তিনাথ বলল, "কই না, দান করব তো বলিনি।"

ভদ্রলোক মৃদু হেসে বললেন, "হুইযে, বারির গায়ে নুটিশ টাঙ্গাইয়া দিসেন টু লেট···তা 'টু লেট' কথাডার অর্থ কি মশায়,—না দিতি (দিতে)। হেই লেই-গাইতো বুইজলাম যে আপনি বারিডা দান করতি চান। তা দান কইরবেন ক্যান, সন্ন্যাসী হইবেন নি?"

শান্তিনাথ বলল আজ্ঞে না।

—"আইর না, ও আমি দেইখাই বুঝচি···কিন্তু হইল কি? বধূ মাতার লগে (সহিত) ঝগড়া হইছে? তা উ রকম অয় অয় (হয়), তার লাইগা কি রাগ কইরতে আছে।—'

উঃ! অসহ্য! শান্তিনাথ চীৎকার করে বলল, "আজ্ঞে না, কিচ্ছু হয় নি—"

ভদ্রলোক একটা বিড়ি ধরিয়ে বললেন, "তা না অইলেই ভাল; তা অখন দান কইঃবেন বলছেন, আমি সেই দান লইতে আইচি। সদ ব্রাহ্মণের সন্তান, দানের যুগ্য পাত্র।"

শান্তিনাথ ক্রুদ্ধ স্বরে বলল, "আজ্ঞে না, আমি দান করব বলিনি, ভাড়া দেব বলিচি।"

তবে যে ল্যাখা রইচে "টু লেট্—"

অসহিষ্ণুভাবে শান্তিনাথ বলল, "হ্যাঁ আছে—কিন্তু 'টু লেট' মানে দান করতে নয়, ভাড়া দিতে।"

ভদ্রলোকও এবার রেগে গেলেন, বললেন, "মস্করা কইরবার আর যায়গা পাও নাই। বেয়াদপ ছোকরা, দান কইবার নাম কইরা তুমি হক্কল লোকরে ঠকাইতেছ। দিমু তোমার নামে কেস্ ঠুইকা—হ।"—ভদ্রলোক বের হয়ে গেলেন। শান্তিনাথ মনে মনে বলল, তাই যাও কেস ঠোকগে—তারপর ভাবতে লাগল, কি করে এ বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়। দি আইডিয়া—সে তাড়াতাড়ি 'টু লেট' লেখা পেষ্ট বোর্ডটা খুলে নিয়ে এল।

একটু পরেই আর এক ভদ্রলোক এলেন।

শান্তিনাথ বলল, কি চান—

—আজ্ঞে সকাল বেলা এ বাড়ীর গায়ে 'টু লেট্' টাঙ্গান দেখেছিলাম তাই—

শান্তিনাথ বলল, কিন্তু এখন সত্যিই টু লেট্ (Too late)

—তার মানে?

তার মানে দেরী করে এসেছেন—এ বাড়ী ভাড়া হয়ে গেছে।

—হয়ে গেছে? কে নিলে?

চেয়ারখানায় আরাম করে বসে গম্ভীর স্বরে শান্তিনাথ বলল, আমি।

মদন ভায়ার বিপদ

শ্রীগৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

বদনপুরের মদন সুরের মহা বরাত জোরে,
মদনা কলা কাঁদি কাঁদি হ'ল বাগান ভ'রে।
পেটুক মহা মদন ভায়া, জালার মত ভুঁড়ি,
রাখলো নজর, যা'তে তাহার কলা না যায় চুরি।
পাকলে কলা ফলার হবে অনেক দিনের আশ,
এতদিনে হ'ল সফল মদনা কলার চাষ।
রাত্রি এলো, গভীর রাতি, ঝিমায় মদন সুর,
হঠাৎ কোনো শব্দ পেয়ে নিদ্রা হ'ল দূর।
বাগানে তা'র চোর ঢুকেছে মদন ভায়া ভাবে,
কিন্তু তারে আঁধার রাতে কিসে ধরা যাবে?
বুদ্ধি হঠাৎ যোগায় শিরে, খুসী তাহার দিল্
অন্ধকারে মদন ভায়া ছুঁড়তে থাকে ঢিল।
আর্ত্তনাদে উঠল কাঁপি' মস্ত কলা বন,
মদন বলে, "কলা খেতে আসবে বাছাধন।"
চোরের কাছে এলো মদন, হৃদয় খুসি ভরা,
তা'রি ছেলে দেখে তাহার চক্ষু ছানাবড়া!

—:০:—

মেঘ ও চাঁদ

কুমারী ঝরণা দেবী

চাঁদ কহে, "মেঘ তুমি কেন ঢাক মোরে?
অসীম আকাশ মাঝে দূরে যাও ভাসি',
আমি যেথা থাকি সেথা অন্ধকার ক'রে
জ্বালাতন কেন কর বারে বারে আসি'?"
মেঘ বলে, "ওগো চাঁদ, অনন্ত আকাশ,
তা'র মাঝে কত ঠাঁই আছে, তাহা জানি।
তোমার সৌন্দর্য্য আরো করিতে প্রকাশ
লুকোচুরি খেলে আমি দেখি মুখ খানি।"

কে এলো গো ?

কুমারী ঝরণা দেবী

নবীন বেশে কে এল গো রঙীন-সাগর সন্তরি' ?
আনন্দ-গান হিয়ার মাঝে বেড়ায় যে গো সঞ্চরি' !
সুখের ছবি নীল আকাশে,
ফুল বাগিচায় ফুল যে হাসে,—
রঙীন-স্বপন দেখ্‌ছে অলি, হাসছে সুখে মঞ্জরী
আমের মুকুল দুল্‌ছে বায়ে,
ঢুল্‌ছে ঘুমে শর্ব্বরী ;
চৈতী রাতি বিদায় মাগে
করুণ সুরে মর্ম্মরি'।

কণা

শ্রীমতী রেণুকণা রায়

কহিল দেওয়ালগুলি ছাদেরে ডাকিয়া,—
"মোদের তরেই আছ মাথাটী তুলিয়া।
আশ্রয় যদি না মোরা দিতাম তোমায়
উচ্চ যে তোমার শির লুটা'ত ধূলায়।"
কহিল ঘরের ছাদ ঈষৎ হাসিয়া—
"দিয়েছ আশ্রয় জানি চারেতে মিলিয়া।
বড় কাজ একা একা সাধিত না হয়,
লইতেই হয় তা'রে অপর আশ্রয়।"

আমার 'কবিতা'!

শ্রীগুরুপ্রসাদ মিত্র

বৈশাখেতে, আজকে হ'বে লেনা-দেনার জেরা
সরস্বতী মায়ের কাছে; লেখা যে সব সেরা
লিখ ছে সবে রঙীন্ পাতায়,—কেউ ছোট, কেউ বড়;—
"হালখাতার" এই হল্‌ঘরেতে হবে সে সব জড়।
পাওনা দেনার হিসাব-নিকাশ আজকে যা'বে চুকে,
হাল দিনের এই "হালখাতা" তা রাখবে এঁকে বুকে।

কিন্তু এ সব হিসাব-নিকাশ আমার তরে নহে,—
দিন-মজুরী ও ভিক্ষুজনের হিসাব কিসে রহে?
ভিক্ষা করে বেড়াই আমি, দেবার মত নেইক হাত;
বৈশাখে, এই শুভদিনে, চাইছি বরং 'আশীর্ব্বাদ'।

"হালখাতা"

শ্রীব্রজেশচন্দ্র দত্ত

আনন্দেতে দোকানির মুখে আজি হাসি নাহি ধরে,
'হালখাতা'র এই শুভ দিনে হরষে ফিরিছে ঘরে।
সারাটি বছর ধরিয়া তাহারা করিয়াছে বেচা-কেনা,
হিসাব তাহার করেছে আজিকে, মিটায়েছে লেনা-দেনা।
এ হেন লেনা-দেনার পালা চলুক সারা বরষ ধরি,'
হালকা করিয়া সকলের দেনা হরষে উঠুক ভরি'।

* * * *

নূতন বরষে নব উৎসাহে লেখা হোক 'হালখাতা'
বিশ্বের দেওয়া ও নেওয়ার কথা ভরে থাক প্রতি পাতা।